বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

গোপাল হালদার



॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥
॥ কলিকাতা—১২ ॥

প্রথম সংস্করণ

॥ ১৩৬৩ ॥

মূল্য : চারি টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বাঁধাই
মডার্ণ বুক বাইণ্ডার্স

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আলোচনা সাহিত্য :

সংস্কৃতির রূপান্তর

বাঙলা সংস্কৃতির রূপ
(ছাপা নাই)

বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা

বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি

স্বপ্ন ও সত্য

লঘু রচনা :

আড্ডা

কথা সাহিত্য :

একদা, অন্যদিন, আর একদিন।

পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তের শ' পঞ্চাশ।

ভূমিকা, নবগঙ্গা, জোয়ারের জল।

ভাঙন, স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা।

ধূলিকণা (গল্প-সংগ্রহ)।

বাঙালী সংস্কৃতির সাধক

শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের

করকমলে

নিবেদন

'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' বর্তমান বাঙালীর প্রধান সমস্যাসমূহ আলোচিত হল। এ বাঙালী অবশ্য শুধু পশ্চিম বাঙলার বাঙালী নয়, পূর্ব বাঙলার বাঙালীও। বাঙলা সংস্কৃতি দুয়েরই সমান সম্পদ ও সমান দায়িত্ব। তবে দু' বাঙলার সমস্যা সম্পূর্ণ এক নয়। দেশ-বিভাগের পরে পশ্চিম বাঙলার বাঙালী যেসব সমস্যায় আলোড়িত সে সব সমস্যাই আমার বিশেষ আলোচ্য। সমস্যাগুলি ছোট নয়, এবং এসব ভিন্ন আরও সমস্যা বাঙালীর আছে। তথাপি বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজের প্রশ্ন সমূহ দেশ ও বিদেশের প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে আমি দ্বিধা করিনি। ভাষা ও সমাজ বিষয়ে আমি মৌলিক সমাধানেরও যথাসাধ্য আভাস দিয়েছি। স্বভাবতই ভাষাপ্রসঙ্গে ও সমাজ-প্রসঙ্গে এরূপ বিচার যতটা তথ্যগত হওয়া সম্ভব শিল্প ও সাহিত্য বিচারে ততটা হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি সে আলোচনা থেকেও পাঠক বাঙলাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ও সাময়িক লক্ষণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আভাস লাভ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থের অনেক অলোচনার সূত্রপাত হয় সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। দু' একটি আলোচনা আংশিক ভাবে স্বতন্ত্র নামে ('বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ', 'বাঙলা লোক-সাহিত্যের ভূমিকা' নামে) প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রয়োজনে কতকাংশে সে সব প্রবন্ধ সংশোধন করতে হয়েছে। তাই এ গ্রন্থ শুধু প্রবন্ধ সমাবেশ নয়, ধারাবাহিক আলোচনা—যদিও তা চূড়ান্ত নয়, সর্বাঙ্গীণ নয়,—দু' একখানা গ্রন্থে তা হতেও পারে না। বাঙলা সংস্কৃতির প্রধান কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। অজস্র ক্রটীর জন্য লজ্জিত হলেও কামনা করব—উদ্দেশ্য সফল হোক্! ইতি

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬ ইং লেখক

বিষয়-সূচী

॥ প্রস্তাবনা ॥

সংস্কৃতির সন্দর্ভ

সংস্কৃতি শব্দটা হয়ত নতুন নয়; কিন্তু একালে আমরা সংস্কৃতি বলতে বুঝি 'কালচার'। কালচারের অন্য কোনো প্রতিশব্দ গ্রাহ্য হল না—'অনুশীলন', 'পরিশীলন' বা 'চিত্তপ্রকর্ষ' এখন পর্যন্ত বাঙালীর মনের মধ্যে শিকড় চালনা করতে পারে নি। 'কৃষ্টি' টিকে আছে এখনো তার মূলের জোরে,—আমাদের কৃষ্টি ও লাতিন গোষ্ঠীর কুলতুস্‌ একই ক্রিয়া। কিন্তু কৃষ্টি কথাটিতে আমাদের মনের আকাশে না ফোটে ফুল, না ফলে ফসল। সংস্কৃতি কথাটি সে হিসাবে সজীব, সতেজ; ঔজ্জ্বল্য থেকেও তার ঐশ্বর্য বেশি।

এই কথাটার সঙ্গে বড় বড় কথার আত্মীয়তা রয়ে গিয়েছে ছন্দে গন্ধে। এক অর্থে ওকে টান্‌ছে 'সংস্কার' ও 'সংস্কৃত' শব্দ দু'টি, আর অর্থে ওকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে 'কৃতি' আর তার সঙ্গে সংযুক্ত 'সংস্কৃত' শব্দ দুটি। প্রথম অর্থে ওর টানটা ঐতিহ্যের সঙ্গে। 'সংস্কার' সেখানে বোঝায় জন্মসূত্রে পাওয়া ধ্যান-ধারণা, আর 'সংস্কৃত' গুরু গম্ভীর এক ভাষা ও সাহিত্য এবং তারই সঙ্গে জড়িত একটা গুরু ও গম্ভীর মানসিকতা। কিন্তু সংস্কার ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টি বরাবর ত ওরকম রাশভারি ছিল না। সংস্কার এখনো তাই বোঝায় মাজা-ঘষা, কাটা ছাঁটা; যা আছে তা শুধু কমানো নয়, বাড়ানোও প্রয়োজন মত। শিক্ষা-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, এসব শব্দে ত সংস্কারের সে-অর্থই সচল হয়ে আছে। সংস্কৃতিও সঙ্গে সঙ্গেই তাই বোঝায় মার্জিত ভাব, সাজানো-গোছানো নানা প্রকাশ। যা আছে তা পরিবর্তিত হয় এবং হয়ত পরিবর্ধিতও হয় কতকাংশে। কিন্তু এসব অর্থেও ওই কথাটির মধ্যে 'গতির' দিকটাই প্রকট। 'সংস্কৃতি'

কথাটা তাই এখনো 'কালচার' কথাটার থেকে ভারি, তার চালও ভারিক্কি চাল।

কালচার কথাটা অনেক স্বচ্ছন্দ। তা 'প্রিমিটিব্ কালচার' বা মানুষের প্রাথমিক প্রয়াসও বোঝায়; 'ফোক্ কালচার' বা 'জনকৃতি'—লোক-মানসের সাধারণ সম্পদও বোঝায়। মার্কিন 'ওয়ে অব্ লাইফ্' বা জীবন-যাত্রাও বোঝাবে, অরবিন্দ বা রামকৃষ্ণের যোগ-সাধনাও বোঝাবে। 'সংস্কৃতি' এখনো অত সর্বত্রগামী নয়—অমার্জিত জীবনের ও মনের ছোঁয়াচে সে স্বচ্ছন্দ নয়। এখনো তাই পাহাড়ীয়া জাতিদের অমার্জিত জীবন-ধারাকে অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বলতে হয় 'কিরাত জনকৃতি'। তা 'সংস্কৃতি' নয়, 'কৃতি'। 'ফোক্ কালচারকে' আমরাও লোক-কৃতি বা লোককৃষ্টি বলেই চালাই। কারণ, 'সংস্কৃতি' কথাটার মধ্যে পরিমার্জনার একটা আভাস আছে, তা শিষ্ট মানুষেরই আয়ত্ত করা সম্ভব। 'কালচার' কথাটার মধ্যেও সে-আভাস তলিয়ে যায় নি। শিক্ষিত মানুষ অভদ্র হলে তার সম্বন্ধে বলি 'কালচার নেই'।

পূর্ণতার সাধনা

এই পরিমার্জনা হচ্ছে মনের পরিমার্জনা—ভাববাদী অর্থে perfecting of mind—এই হল তাই অনেকের মত। সংস্কৃতি বলতে বিশেষ করে বুঝায় 'মার্জিত মানসিকতা'—শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই কথাটির উপর বিশেষ করে জোর দিয়েছেন 'ভারত সোবিয়েত সংস্কৃতি সমিতির' উদ্বোধন ভাষণে (৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৩)। মানুষের এই পরিমার্জিত মানস তার আধ্যাত্মিকতারই প্রকাশ। স্বভাবতই ভাববাদী দৃষ্টিতে একথাও তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর মতে বিশেষ করে মানুষের এই পরিমার্জিত মন বা আধ্যাত্মিক বোধই রূপলাভ করে শিল্পে সাহিত্যে,—মোটের উপর যাকে বলা যায় আর্টস তাতে। তাই সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বুঝি

শিল্প সাহিত্য নৃত্য নাট্য প্রভৃতি চারুকলা; ওসবের বিচার ও ধ্যান-ধারণা। নানা দেশে নানা কালে মানুষের আত্মার এই সাধনা নানা বিশিষ্ট ও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী আমরাও কখনো সংস্কৃতির নামকরণ করি দেশ বা জাতির নামে, কখনো তার পরিচয় অন্বেষণ করি কালের হিসাবে। কিন্তু মূল কথাটা হল এই মানসিক পরিমার্জনা বা আধ্যাত্মিক প্রকাশ, 'পূর্ণতার সাধনা' perfecting of mind, 'আর যেখানেই তার যে বিশেষ প্রকাশ ঘটুক—নিগ্রো আর্টে বা গ্রীক মানবিকতায়, সেখানেই আমরা মাথা নত করব শ্রদ্ধায়।'

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন—তিনটি জিনিসকে এই মানসিক পরিমার্জনার বা সংস্কৃতির প্রধান সত্য বলে মানতে হয়। প্রথম হল মনের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব মাইণ্ড), দ্বিতীয় হল বিশ্বমানবতা (ইউনিভার্সালিজম্), তৃতীয় হল শালীনতা (আর্বানিটি,—ওই বিশেষ শব্দটিকে বৈদগ্ধ্য বা নাগরিকতা বলে অনুবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু সর্বশুদ্ধ যে গুণাবলী 'আর্বানিটি' শব্দটিতে বোঝায় তাতে হয়ত ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও শালীনতা, পরিশীলন প্রভৃতি শব্দেই তা সুপ্রকাশিত হয়)।

সাধারণ ভাবে এই হল সংস্কৃতির সদর্থ। এই বিচার গ্রহণ করতে বিশেষ বাধা কারো হয় না। অবশ্য এই তিন মূল সত্যের সঙ্গে কেউ আরও যোগ করতে পারেন ঐ অর্থের বা ঐ জাতের আরও দু' একটি গুণ—মনের স্বাধীনতাকে কেউ বলবেন (কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের মত) 'বুদ্ধির মুক্তি', 'ইউনিভার্সালিজম্' না বলে বিশ্বমানবতাকে বলবেন 'হিউম্যানিজম্', আর 'আর্-বানিটিকে' কেউ হয়ত বুঝবেন 'ডিসেন্‌সিস্ অব লাইফের' (decencies of life) স্বীকৃতি বলে। তা ছাড়াও চুল-চেরা বিচার চলতে পারে—'মনের স্বাধীনতা' বলতে আমরা কি বুঝব, 'বিশ্বমানবতা' বলতে আমরা কি-কি বুঝব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সম্ভবতঃ আমরা এসব কথায় যে সব 'ভ্যালুজ', জীবন-মূল্য বা স্বীকার্য গুণ বুঝোই তা সকলেই বুঝি ; এবং স্বীকার করি সে সব গুণ কাম্য, তা না থাক্‌লে 'সংস্কৃতি' ফাঁকা হয়ে যায়।

বিজ্ঞান ও পূর্ণতার সাধনা

সংস্কৃতির এই ভাববাদী বিচারকে তবু বলতে হবে পর্যাপ্ত নয়। এসব জীবন-মূল্য (ভ্যালুজ) নিশ্চয়ই যথার্থ, তা তবুও যথেষ্ট নয়। সহজ ভাবেই আমরা জানি, এখনো আমরা সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি আর্টসকেই প্রাধান্য দিই। কিন্তু এ কালে আমরা কি কালচারের এলেকা থেকে বিজ্ঞানকে আর বাইরে রাখতে পারি? কোনো কালেই অবশ্য সম্পূর্ণরূপে তা পারতাম না। কিন্তু একালে বিজ্ঞানকে আমরা গৌণও মনে করতে পারি না। মানুষের 'পূর্ণতার সাধনা', perfecting of mind, শুধু রসবোধেই ত সীমাবদ্ধ নয়। অবশ্য রসবোধের উৎকর্ষ না ঘটলে মানুষের মনের কোনো যথার্থ উৎকর্ষই ঘটে না। আর্টসের এলেকা প্রধানত এই রসবোধ ও অনুভূতির রাজ্য। তাতেও বুদ্ধি-বিচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আর্টসের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিচার হচ্ছে গৌণ, অনুভূতিই মুখ্য। অথচ বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ না ঘটলে মানুষের 'মনের স্বাধীনতা' সত্যই কতটা আয়ত্ত হয়? আর বুদ্ধির, যুক্তির, জ্ঞানের প্রধান প্রকাশই হল বিজ্ঞানে। তাবৎ চরাচরের নীতি-নিয়ম যতই মানুষ কার্য-কারণ সূত্রে বুঝে ওঠে, ততই তার চেতনার রাজ্য প্রসারিত হয়, তা গভীর হয়। সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বোধও ব্যাপক হয়, সেখানে গভীরতা আসে। অনুভূতির রাজ্যেও তার ঘাত-প্রতিঘাত নূতন আলোড়ন তোলে। মানুষের রসসৃষ্টি বিজ্ঞানের দানে বিনষ্ট হয় না। বরং অনুভূতিতে আসে নূতন তীক্ষ্ণতা, নূতন গভীরতা, সমৃদ্ধি।

সাধারণ দৃষ্টিতেও আজ তাই কালচার বল্‌তে আমরা যেমন শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে বুঝি বিজ্ঞানকে, তেমনি জানি কালচার শুধু

মানসিক সৃষ্টি-সম্পদ নয়; বাস্তব সৃষ্টি-সম্পদও কালচারের অঙ্গ। কারুবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, ও পুর-পরিকল্পনা, এসব শুদ্ধ সর্বদিকে জীবন-যাত্রা স্ফুর্তির অবকাশ না ঘটলে মনের মুক্তি ব্যাহত হতে বাধ্য। ভাববাদী বিচারক হয়ত বলবেন, এহ বাহ্য। কিংবা, মনের মুক্তি আগে তারপর এসব বাহ্য মুক্তি। কিন্তু একালে আমরা জানি, বাস্তবের বনিয়াদের উপরে ছাড়া জীবন দাঁড়াতে পারে না, ফুটতে বা ফসল দিতে পারে না। আর জীবনের সেই বনিয়াদ প্রশস্ত করে তুলছে আজ বিজ্ঞান। তাই বাস্তব-জীবন-যাত্রায় বৈজ্ঞানিক শক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রসার আজ কালচার বা সংস্কৃতির একটি মূল প্রতিজ্ঞা। পরিহাসের কথা নয়—যাদের সাবান ব্যবহারের রেওয়াজ নেই তাদের কালচার তুচ্ছ। যে-দেশে ইলেকট্রিসিটির যত ব্যবহার সে-দেশে কালচারের তত প্রসারের সুযোগ। 'প্লেন্ লিভিং' মানে 'সায়েন্টিফিক্ লিভিং'।

অবশ্য 'মনের মুক্তি' বলতে নিশ্চয়ই এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বা 'সায়েন্টিফিক এ্যাটিচ্যুডের' কথাও স্বীকৃত হয়। মুক্ত মনের ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই 'পরমপুরুষের' মিরাকল্-বিন্যাসে হাসি পাবে, হিন্দী সিনেমায় জুগুপ্সা জাগবে। ভদ্রতায় বিশ্বাসী মুক্ত মনের কাছে ধর্মের ম্যাজিক-বাদ একালের সিনেমার সেক্স-এপীলের মতই স্থূল।

মনের মুক্তির অর্থ

কিন্তু তর্ক উঠবে এ কালের পৃথিবীতে চিন্তা-নিয়ন্ত্রণ মনের মুক্তিকে অসম্ভব করছে। তা'হলেও মনের মুক্তি কথাটার অর্থ কী? কিসের মুক্তি বা স্বাধীনতা? নিশ্চয়ই মানুষের সৃষ্টিশক্তির স্বাধীনতা, সমাজবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি-শক্তির উদ্বোধন। নইলে মনের স্বাধীনতার অর্থ কি কল্পনা-বিলাস?

সত্য কথা, যন্ত্রবিজ্ঞানের শক্তি সমাজের যে-শ্রেণীর হাতে গিয়ে আজ পড়েছে সে-ই চাইছে মানুষের মনকে তার প্রয়োজন মত

ঢেলে সাজতে। এ যুক্তি আমরা জানি; এবং কে তা অস্বীকার করবে? এর মধ্যে মানুষের মনের স্বাধীনতা তাহলে সম্ভব একমাত্র সেখানে যেখানে এরূপ শাসক-শ্রেণী মানুষের মনকে চায় বিশ্ব-মানবতার সঙ্গে যুক্ত করতে, বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত করতে, এবং প্রত্যেকটি মানুষকে দান করে 'মানুষের অধিকার—মানুষের সৃষ্টিশক্তি সেখানে অব্যাহত। তাই এ 'নিয়ন্ত্রণ' হচ্ছে আসলে 'সংযম'। এরূপ 'থট্ কনট্রোল'ও অবশ্য কারো কারো কাছে মনে হবে মনের দাসত্ব—যেমন, অলডাস হাক্সলি 'স্যাভেজ' হতে চাইবেন—শেক্সপীয়র-পড়া স্যাভেজ, অর্থাৎ, সভ্যতার সমস্ত সুযোগ নিয়ে চাইবেন আদিম দায়িত্বহীনতা, অসংযম। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

একালে তাই কালচার বা সংস্কৃতির মূল সত্য শুধু মনের মুক্তি, বিশ্বমানবতা ও শালীনতা বললেই শেষ হয়ে যায় না। নিশ্চয়ই ও সব চাই। কিন্তু ও সবেরও মূল যেই সত্যটি তা নির্দেশ না করলেও আর চলে না। এ সত্য হচ্ছে সৃষ্টির স্বাধীনতা।

সৃষ্টি-শক্তির সার্থকতা

সৃষ্টিশক্তি হচ্ছে মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য। অন্য জীবের জীবন শুধু পূর্ব-পূর্ব জীবনের অনুবৃত্তি। তারা প্রকৃতির রাজ্যে অসহায়। কিন্তু মানুষের স্তরে পৌঁছে তাদের এই জীবলীলা অনেকটা নূতনতর শক্তিতে স্ফূর্ত হয়েছে। মানুষও অবশ্য জৈব নিয়মের বশ। জন্ম-মরণের মধ্য দিয়ে সেও অনুবৃত্তি করছে জীবন-ধারার। কিন্তু সে আপনার প্রয়াসে আপনার জীবনকে গঠন করবার অধিকারীও হয়েছে। প্রাণলীলা তার মধ্যে সম্ভাবনায় সুমহৎ। অবশ্য সে অধিকার নিশ্চয়ই নির্বিশেষ নয়। প্রকৃতির নিয়ম-নীতিকে অনুধাবন ও অনুসরণ করেই মানুষ নিজ পদ্ধতিতে জীবন-গঠনের অধিকারী হয়। কিন্তু এই অধিকার অর্জনেই মানুষের স্বাধীনতার বিকাশ। তার

জীবন-যাত্রা যত সে সুসংগঠিত করে ততই তার মনের প্রকাশ ও বিকাশ সুনিশ্চিত (অর্ডারড্) ও স্বচ্ছন্দ (ফ্রী) হয়।

ইতিহাস জুড়ে মানুষের এই সৃষ্টিশক্তি নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে। অবশ্য সমাজের নানা শ্রেণীর দ্বন্দ্বে অধিকাংশ মানুষেরই শক্তি এতকাল রয়েছে অবজ্ঞাত বা অপব্যয়িত। জ্ঞানের চর্চায় ও রসবোধের বিকাশে অধিকারী হয়েছে শুধু মুষ্টিমেয় মানুষ। তাই সংস্কৃতিও এতদিন রয়েছে অসম্পূর্ণ—মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদ। নিষ্কর্মা ক্ষমতাবান্ মানুষেরা তাকে চেয়েছে সৃষ্টির সহায় না করে আপনাদের সম্পত্তি করে রাখতে, শোষণের সহায় করে চালাতে। "আমাদের শোষণ-সুযোগ চাই, কারণ আমরা কালচারের কাণ্ডারী, বিজ্ঞতার ভাণ্ডারী।" অধিকাংশ মানুষের জীবন তাই হয়েছে 'পিলসুজের জীবন'—আলোক জ্বলছে মাথায়, গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গরম তেল।

আজকের এই যুগে এসে মানুষ দেখছে কতখানি সৃষ্টিশক্তির অপচয়ে জ্বলে এই আলো; আর বোঝে সৃষ্টিশক্তির সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন প্রকাশেই সংস্কৃতির সম্পূর্ণতা—মনের মুক্তি। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন—রুশ বিপ্লবের পরে সকল মানুষই স্বীকার করবে—মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ অবাঞ্ছনীয়।

আমরা তাই এ যুগে সংস্কৃতির অঙ্গ বলব—শুধু 'মনের মুক্তি' নয়, সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন; 'ইউনিভার্সালাইজেশন্ অব্ কালচার', সার্বজনীনতা ও সর্বাঙ্গীনতা সাধন; এবং 'আর্বানাটি' নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু সহযাত্রীর হৃদ্যতা—'ফেলোশিপ'।

কৃতির সম্পূর্ণতা

আজকের দিনে তাই মনে হয়—'কৃতি' কথাটাই সংস্কৃতি কথাটার প্রাণবস্তু। আসল জিনিস হল কৃতি বা কর্ম, অ্যাকশান্। In the begining there was deed. সম্-উপসর্গ দিয়ে আমরা

বোঝাতে চাই সে কর্ম শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, তার সম্পূর্ণতা। ‘সংস্কৃতি’ কথাটার মধ্যেই তাই রয়েছে মানুষের এই ইতিহাস-জোড়া সাধনার ইঙ্গিত—সে কিছু-না-কিছু করে। যা সে জন্মসূত্রে পায় তার সঙ্গে যোগ করতে পারে তার আপনার দান, অর্থাৎ সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতেই (ক্রিয়েটিব্ নেস্-এ) মানুষের পরিচয়, সৃষ্টি ভিন্ন পূর্ণতার সাধনা পূর্ণ হয় না। বিলিতী কালচার কথাটি যা বোঝায় তার থেকেও বেশি স্পষ্ট করেই ‘সংস্কৃতি’ কথাটা বোঝাতে পারে এই মূল সত্যটা—মানুষ সৃষ্টিশীল। শুধু জানলে আর বুঝলেই মানুষের জীবন-ধর্ম শেষ হয়ে যায় না। তাকে কিছু করতে হয়, কিছু গড়তে হয়, কিছু সৃষ্টি করতে হয়। জগৎকে interpret করলেই যথেষ্ট হবে না, জগৎকে change করতে হয়। এই হল সংস্কৃতির দাবি—আর তাতেই মনেরও মুক্তি।

আর একেই বলতে পারি সংস্কৃতির সদর্থ।

ভাঙা বাঙলার সাংস্কৃতিক সংগঠন

কয়েকটি প্রস্তাব

।১। দুই বাঙলা : এক ভাষা, এক সাহিত্য

প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙলা ভাষা বাঙালী জাতির মাতৃভাষারূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বাঙালী জাতিকে একটি রাষ্ট্রজাতিতে ("নেশন") পরিণত হইবার পক্ষে সহায়তা দান করিয়াছে। আজ সেই বাঙালী জাতি দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছেদে তাহার জাতীয় সত্তা আজ সংকটাপন্ন। এমন কি, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালীর বিভাগে বাঙালীর ভাষাও নানা বিপদ ও জটিলতায় নিপতিত। দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বাঙালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ দুই রাষ্ট্রের নিজ নিজ জনসাধারণ স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থির করিবেন, এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নাই। সেই কথা মানিয়া লইয়াও দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায়—বাঙলা ভাষার ও বাঙলা সাহিত্যের সংযুক্ত ঐতিহ্য ও স্বচ্ছন্দ বিকাশধারা অব্যাহত রাখা দুই রাষ্ট্রের বাঙালী জনসাধারণের ও বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের আজ একটি পবিত্র কর্তব্য। উভয় বাঙালার মধ্যে তাই ভাষার, সাহিত্যের ও সংস্কৃতির, সর্বরকমের সুস্থ আদানপ্রদান, যোগ ও বিনিময় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উভয় বাঙলার জনগণ ও বুদ্ধিজীবীরা উদ্যোগী থাকিবেন।

কারণ, দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও বাঙালীর সংস্কৃতি এক, সাহিত্য এক এবং তাহার ভাষা এক বৈ দুই হইতেই পারে না। রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক পরিবর্তনেও ভাষার কোনো মূলগত পরিবর্তন সহজে সাধিত হয় না। প্রধানত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়াই আবার জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় মানসিকতা ও জাতীয় চরিত্র বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয় ও রূপায়িত হইয়া উঠে। যুগে যুগে

ব্যক্তিপ্রতিভার নিজস্ব বিকাশে ও বিশিষ্ট পরিবেশের যোগাযোগে সেই সংস্কৃতি ও সাহিত্য আরও বিচিত্র ঐশ্বর্য লাভ করে। বাঙলা ভাষা পৃথিবীর প্রায় ছয় কোটি বাঙালীর মাতৃভাষা, বাঙলা সাহিত্য সকল বাঙালীর নিজস্ব সাহিত্য, সকলের সমবেত উত্তরাধিকার। বাঙলাভাষীর সংখ্যা হিসাবে ও সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষের হিসাবে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষার মধ্যে বাঙলার স্থান—এই সত্যও অপরিবর্তনীয়।

।২। মূল প্রশ্ন

১৯৪৭-এর পরে দুই রাষ্ট্রস্থ বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যকে তথাপি কয়েকটি বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতাপ্রসূত বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। প্রধানত দুই প্রশ্নকে আশ্রয় করিয়া এই বিভ্রান্তি ও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। যথা, (১) ভারত-রাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষার সহিত বাঙলা ভাষার সম্পর্ক কী ? (২) পশ্চিম বাঙলা রাজ্য ও পূর্ব পাকিস্তান রাজ্যে সরকারী কার্যে ও শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙলা ভাষার স্থান কোথায় ?

ভারতের ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক বিকাশ, ও জনগণের ভাষাগত অধিকারের দাবিকে মনে রাখিয়াই এই সব প্রশ্নের গণতান্ত্রিক বিচার ও উত্তর স্থির করিতে হইবে।

।৩। ভারতবর্ষের ভাষাগত পরিস্থিতি

ভারতবর্ষ বহুজাতির দেশ। যাহাদের মাতৃভাষা বিভিন্ন এমন ছোটবড় বহু জাতি (নেশন), অধিজাতি (ন্যাশ্‌নালিটি), উপজাতি (ট্রাইব্‌) ও কোমের (ক্ল্যান্‌) মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। এই মহাভূমির দুই রাষ্ট্রের সম্বন্ধেই সাধারণভাবে বলা যায়—ভারত ও পাকিস্তান, দুই বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র।

এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতে বাঙালী, হিন্দুস্তানী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোনো কোনো ভারতীয় জাতির

ভাষা, এবং পাকিস্তানে বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী প্রভৃতি কোনো কোনো পাকিস্তানী জাতির ভাষা প্রায় 'জাতীয় ভাষায়' পরিণত হইয়াছে; এবং এই সব ভাষা অন্যতম প্রধান ভাষারূপে রাষ্ট্রের স্বীকৃতিলাভও করিয়াছে। কিন্তু সাঁওতালি (মুণ্ডারি), গোণ্ড, ওরাঁও হইতে আরম্ভ করিয়া গোর্খালি, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, মালবী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভারতের কয়েকটি অধিজাতি-উপজাতির ভাষা এখনো ততটা উন্নতিলাভ না করিলেও সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে, শিক্ষা প্রভৃতিতেও ইহাদের কতকটা ব্যবহার স্বীকৃত হইয়াছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও এইরূপ অপরিণত অধিজাতির বিকাশ ও ভাষার সংহতি না চলিতেছে তাহা নয়। যেমন, পশ্‌তু, বালোচী প্রভৃতি জাতির ভাষা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য এইসব পরিচিত ভাষা ছাড়াও দুই রাষ্ট্রেই অনেক ছোটছোট উপজাতির ভাষা আছে যাহা নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কিংবা যাহা বিকাশলাভের সুযোগ পায় নাই; এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে যাহাদের বিকাশলাভ করার সম্ভাবনা। যেমন, ভারতের শবর (অস্ট্রিক), কন্ধ (দ্রাবিড়), কোদণ্ড (দ্রাবিড়), নেওয়ারী, লেপ্‌চা, গারো, টিপরাই, (ভোট-চীনা) প্রভৃতি ভাষা। এবং পাকিস্তানের ব্রাহুই (দ্রাবিড়), শিণা, চিত্রলী, বাশগলী (ইরানী) ও আরাকানী, পার্বত্য চট্টগ্রামী (কুকি-চীনা) প্রভৃতি ভাষা। এইসব, এবং এইরূপ অনেক, ভাষা এখনো বিচ্ছিন্ন কৌম-জীবনযাত্রার ভাষামাত্র। সভ্যতার আদান-প্রদানে ভাঙিয়া চুরিয়া ইহাদের কোন্ কোন্ ভাষা টিকিবে, টিকিলে কি ভাবে টিকিবে, তাহা এখনো বলা অসাধ্য।

এইসব কারণে ভারত ও পাকিস্তানের ভাষাগত বৈজ্ঞানিক জরিপ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এবং তৎপর বিশেষভাবে স্মরণীয় এই কথা যে, বিশেষ বিশেষ ভাষা-বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে

শিক্ষিত মানুষেরা কি ভাষা বলেন বা শহরে কি ভাষা চলে, তাহার অপেক্ষাও বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে গ্রামাঞ্চলের ভাষাকে, বিশেষ করিয়া কৃষক-সাধারণের ভাষাকে। ভাষা-সংশয়ে উহাই বিচারের প্রধান মানদণ্ড।

বর্তমান সময়ে ভারতের ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু ইহাই বলা চলে যে: (ক) এখনো পর্যন্ত এইসব বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশে কোনো একটি সর্বজাতিস্বীকৃত আদানপ্রদানের ভাষা নাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার শাসন ও শোষণের দায়ে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাইলেও শতকরা ২ জন লোকেও ইংরেজি জানে না—ভারতীয় বা পাকিস্তানী কোনো জাতিরই জনগণ ইংরেজি বুঝে না। এই সাম্রাজ্যবাদী ভাষার চাপের অবসান না হইলে কোনো রাষ্ট্রেরই মানসিক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইবে না। কোনো জাতি, অধিজাতি বা উপজাতির ভাষাও আপনার বিকাশের পথ উন্মুক্ত দেখিবে না।

এই অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণে কোনো একটিমাত্র ভাষাকে ভারত বা পাকিস্তান রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াস ভ্রান্তিজনক ও অ-গণতান্ত্রিক প্রয়াস। ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দীকে 'রাষ্ট্রভাষা'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় ও পাকিস্তানে 'উর্দু'কে ঐরূপ প্রতিষ্ঠাদানের চেষ্টায় এই দুই বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র আপনাদের সত্তার মূলোৎপাটন করিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে বিপন্ন করিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে জাতিতে জাতিতে, ভাষায় ভাষায় বিরোধ বাধাইতেছে।

এই কথা সত্য যে, ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দীভাষাই অন্য ভাষার অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পরিচিত এবং হিন্দী-উর্দু, হিন্দী-হিন্দুস্তানী, ও বাজার-হিন্দী, হিন্দীর আভ্যন্তরীণ এই ত্রিরূপের সমস্যার কোনো সুসমাধান হইলে হিন্দী-ভাষারই পক্ষে

কেন্দ্রীয় 'রাষ্ট্রভাষা'র পদলাভ করা যথাকালে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে হিন্দী সেই পদ এখনকার মতো উদ্ধতভাবে রাজশক্তি ও ধনিকশক্তির সাহায্যে কবলিত করিতে গেলে ভারতীয় অন্যান্য জাতি ও ভাষা নিশ্চয়ই হিন্দী-বিরোধী হইয়া উঠিবে এবং হিন্দীরও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক প্রসারের পথে বাধাই জমিতে থাকিবে।

বাঙালী জনসাধারণ হিন্দী ভাষার ভবিষ্যৎ প্রসারে আশাহীন নয় বলিয়াই হিন্দীভাষী জনসাধারণ ও সাহিত্যিকদের নিকট এই দাবি করিতেছে যে, "আপনারা হিন্দীপ্রচার আন্দোলনকে সরকার ও ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করিয়া সুস্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং হিন্দীকে অকালে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইবার লোভ ত্যাগ করিয়া ভারতের সকল ভাষার সঙ্গে তাহাকে সমান মর্যাদায় ভারতের প্রধানতম ভাষারূপে গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হউন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ, জটিলতাবর্জিত হিন্দুস্তানী যাহাতে ভারতের সকল জাতির আদানপ্রদানের ভাষা হইয়া উঠে এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সর্বস্বীকৃত প্রধানতম ভাষা হইয়া উঠিতে পারে সেইজন্য অন্য ভাষীদের, বিশেষ করিয়া দ্রাবিড়ভাষীদের সমর্থন সংগ্রহ করুন।"

(খ) ভারত-রাষ্ট্র বা পাকিস্তান-রাষ্ট্রের মতো বহুজাতিক রাষ্ট্রের পক্ষে আভ্যন্তরীণ কর্ম পরিচালনায় একটি রাষ্ট্রভাষা অপেক্ষা বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন প্রত্যেকটি প্রধান ভাষাকেই সমমর্যাদা-শালী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করা।

জাতীর আত্মবিকাশের নীতিতে ভাষাশ্রয়ী জাতিরা স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদের সৌকর্যের জন্য, একটি নিখিলভারতীয় অনুবাদক সার্ভিস (ভারতীয় হিসাব পরীক্ষক সার্ভিস প্রভৃতির মতো) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের (ইউ. এন্.) অনুরূপে ভারতরাষ্ট্রের ও পাকিস্তান

রাষ্ট্রের কেন্দ্র ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভা, এবং সরকারী কমিটির অধিবেশনে, সভা-সমিতিতে তৎক্ষণাৎ অনুবাদের (সাইম্যাল্‌টেনাস্ ট্রান্‌স্লেশন্) ব্যবস্থা করা সম্ভব। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটি ছাত্রের পক্ষে মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষার সাধারণ জ্ঞান-লাভের অয়োজন করা চলে। এইরূপে নানাভাবে আদানপ্রদানের ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিচালনা করা সুসাধ্য।

। ৪ । ভাষা-মীমাংসার মূল নীতি

ভারতীয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও ভারতের ভাষাবিষয়ক পরিস্থিতি স্মরণ করিয়া তাই বাঙালী জনসাধারণ মনে করে যে—ভারতীয় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য অবিলম্বে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(১) ভাষাভিত্তিতে রাজ্যগঠন ও রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

(২) আক্ষুদ্র প্রত্যেকটি অধিজাতি, উপজাতি, কোমকে 'ভারত-সংঘের' (ইউনিয়ন) ও বিভিন্ন রাজ্যের (স্টেটস্-এর) অধীনে নিজ নিজ এলাকায় 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' ও ভাষাগত স্বাধীনতা-ভোগের অধিকার দান করা—সঙ্গে সঙ্গে অনগ্রসর ও সংখ্যাল্প কোম, উপজাতি বা অধিজাতিদের দ্রুত অগ্রগতির জন্য সর্ববিধ সহায়তা দান করা।

(৩) ঐতিহাসিক বা স্বাভাবিক পথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের ফলে ভাষার যে পরিণতি ঘটিতেছে তাহার নামে যেমন বৃহৎ ভাষার গ্রাসেচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না, তেমনি যেখানে উপভাষা (ডায়ালেক্‌ট) মিশিয়া 'জাতীয় ভাষার' রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—স্বাভাবিক মিশ্রণে, যোগাযোগে ভাষা-সংহতি দেখা দিতেছে,—তাহারও পথরোধ করা চলিবে না।

।৫। বাঙ্‌লা রাজ্যে বাঙ্‌লার দাবি

বাঙলা ভাষার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বিকাশ সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত বাঙালীর দাবি এই যে :

(১) বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্রে বাঙলাই সরকারের শাসনের, বিচারের ও উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন, সর্ববিধ শিক্ষার মূল ভাষা রূপে গ্রাহ্য হউক—এই সব বিভাগে ইংরেজির অবসান হউক।

(২) পশ্চিম বাঙলার অধিবাসী প্রত্যেকটি অধিজাতির (যথা, সাঁওতাল, গোর্খা, প্রভৃতির) ও উপজাতির (যথা, টিপ্‌রাই, মণিপুরী, ওরাঁও, লেপ্‌চা প্রভৃতির) নিজ নিজ বাসক্ষেত্রে নিজ মাতৃভাষায় অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষার, ও যেখানে সম্ভব তদূর্ধ্ব শিক্ষার, এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৩) কার্যসূত্রে পশ্চিম বাঙলার অধিবাসী প্রত্যেকটি জাতির সংখ্যাল্প গোষ্ঠীকে (যেমন, শ্রমিক-অঞ্চলের হিন্দুস্তানী, ওড়িয়া প্রভৃতি) নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা, ও যেখানে সম্ভব তদূর্ধ্ব শিক্ষার, এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ দেওয়া হউক।

বৈশাখ, ১৩৬০।

॥ ভাষা প্রসঙ্গ ॥

ভাষা-সমস্যার মূলসূত্র

ভাষা ও জাতি-সমস্যার বিচারে সোবিয়েত নায়ক স্তালিনের মতো গুরু আর নেই। সে-বিচার সার্থক প্রমাণিত হয়েছে সোবিয়েত ইউনিয়নে। ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যায় আজও (১৩৬০ বাং) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর বিচারই বহুলাংশে সুচিন্তিত। তাতে অসম্পূর্ণতা যা থাকে তার কারণ, তিনি ঐতিহাসিক শক্তিতে আস্থাশীল নন। কিন্তু ভাষা-সমস্যা ও জাতি-সমস্যা আসলে পরস্পর বিজড়িত। আর এই জটিল প্রশ্নকে আবার ইতিহাসের বিকাশমান পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে তার স্বরূপ বোঝা যায় না, তার সক্রিয় সমাধান সম্ভবপর হয় না। তাই স্তালিনের বিচার ও স্তালিনের নীতিই হল ভাষা ও জাতি সমস্যার শ্রেষ্ঠ বিচার ও সঠিক সমাধান।

ভাষা-ব্যাপারে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্যা অনেকাংশে ভারতবর্ষেরই অনুরূপ ছিল। প্রজাতন্ত্রী চীনের সমস্যা সে-তুলনায় আমাদের সমস্যার মতো নয়। অবশ্য মনে রাখা দরকার, সোবিয়েতের ও আমাদের সমস্যাতেও পার্থক্য অনেক। সোবিয়েতের (যুদ্ধের পরে) প্রায় ২১ কোটি লোকের মধ্যে ১১ কোটির অধিক লোক রুশ-ভাষী; সেখানকার অন্যান্য ভাষার তুলনায় রুশ ভাষা সাহিত্যে ও সামর্থ্যে অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষে হিন্দী বা অন্য কোনো ভাষা সংখ্যাবলে এ-প্রতিষ্ঠা দাবি করতে পারে না; কোনো ভারতীয় ভাষা প্রকাশ-শক্তিতেও অতটা বিকাশ লাভ করেনি। সোবিয়েত ইউনিয়নের রুশ-ভাষার সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের হিন্দী-ভাষার তুলনা তাই মোটেই খাটে না। তা ছাড়া লক্ষণীয় এই যে, সোবিয়েত বিধানে কোনো ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' বলে আইন করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। তার মূলে অবশ্য আরও একটা কথা আছে: সোবিয়েত ইউনিয়ন ভাষা-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে বিপ্লবের পরে, বিপ্লবী নীতিতে।

এই কারণেই রুশ-ভাষা অন্য ভাষাকে গ্রাস না করে তাদের বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। আমরা ভাষা-সমস্যার সমাধান (?) খুঁজছি বিপ্লব বাদ দিয়ে। তাই, আমাদের একটিমাত্র প্রধান ভাষা যখন নেই, প্রত্যেক স্ব-স্ব প্রধান ভাষা প্রতিবেশী ভাষার উপর বিরূপ। এদিকে হিন্দী ইংরেজির মতো রাজতক্তে সমাসীন হতে চায়। বিপ্লবের যুগে বিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে এরূপে যত রকমের সম্ভব জটিলতা আমরা সর্বত্রই সৃষ্টি করছি। ভাষা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রেও দেখছি তারই প্রতিফলন—চিন্তার অরাজকতা, উগ্র অহংকার, মারাত্মক সংকীর্ণতা।

ভাষা-ক্ষেত্রের অরাজকতা

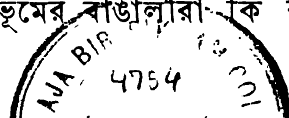
এ-সমস্যা যে ভারতবর্ষে আসবে তা অজানা ছিল না। স্তালিন বহুপূর্বেই বলেছিলেন—ভারতবর্ষে যেদিন বিপ্লব দেখা দেবে, সেদিন সেখানে নতুন নতুন কত জাতি যে মাথা তুলে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তথাপি আমাদের হিন্দুস্তানী বন্ধুরা ভাবছেন—পঞ্জাব থেকে বাঙলা পর্যন্ত সমস্ত দেশ জুড়ে নাকি এক "হিন্দুস্তানী জাতি" শের শাহ্-এর আমল থেকেই জন্মলাভ করেছে, শুধু তার নামকরণই রয়েছে বাধা! পশ্চিম বাঙলা ও বিহারের শিক্ষিত (?) বর্গরা ভাবছেন—ছোটনাগপুর হয় বাঙালীর রাজ্য, নয় বিহারীর ;—যেন সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি 'ঝাড়খণ্ড'-এর জাতিদের ভাষাও নেই, অস্তিত্বটাও গৌণ! ধলভূমের বাঙালীরা ভাষার ক্ষেত্রে বিহারী-শাসকবর্গের অত্যাচারে জর্জরিত; আসামেও বাঙালীর সেই অভিযোগ। অভিযোগ হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু বিচার হবে কি দিয়ে? পাটনায় সম্প্রতি কৌতুক ও বেদনার সঙ্গে দেখছিলাম দুই রাজ্যের বাঙালী-বিহারী শিক্ষিতদের (?) লড়াই। মনে হচ্ছিল যেন দুই দলই মনে করেন, ভারতরাষ্ট্র বলে কোনো রাষ্ট্র নেই, এ যেন রাইন্-এর দু'পারের ফরাসী ও জার্মান দুই জাতির লড়াই!

গত পূজায় আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, বৈচিত্র্যে ও তার মানুষের সৌহার্দ্যে যখন উৎফুল্ল বোধ করেছি, তখনি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছি আসামের ভাষা-সংকট ও জাতি-সংকট। আসাম রাজ্যের লোক-সংখ্যা মোট ৯০ লক্ষের মতো। তার মধ্যে অসমীয়া ভাষী হবেন ২৫ লক্ষের উপরে ৩০ লক্ষের নিচে, বাঙলা-ভাষী ২০ লক্ষের উপরে। (১৯৫১-এর আদম সুমারি মতে অবশ্য ১৯৫১-তে অসমীয়া ভাষীর মোট সংখ্যা আসাম রাজ্যে ৪৯.৭২ লক্ষ, ১৯৩১-এ তা ছিল মাত্র ১৯.৯৩ লক্ষ ; আসাম রাজ্যে বাঙালী ভাষীর সংখ্যা ১৯৫১-তে ১৪.৪৭ লক্ষ, অথচ ১৯৩১-এ তা ছিল ১৬.৯৯ লক্ষ। যখন আসাম রাজ্যের মোট জন সংখ্যা ১৯৫১-তে ৮৭.৭১ লক্ষ,—১৯৩১-এ যা ছিল ৬৩.৪৪ লক্ষ, তখন অসমীয়ারা এ সময়ে সংখ্যায় ২॥০ গুণ বেড়েছে, তা অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না।) তাছাড়া, আসামে খাসিয়া লুসাই প্রভৃতি জাতিরা আছে কয়েক লক্ষ করে, ক্ষুদ্র উপজাতিরও অভাব নেই। এক কথায়, মনে হল ভারতবর্ষ যেমন পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ, আসাম তেমনি ভারতবর্ষেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। আর ভারতীয় রাষ্ট্রে হিন্দীরই মত আসামে অসমীয়া-ভাষাও প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী। শুধু বাঙলা-ভাষার প্রাধান্যমুক্ত হয়েও অসমীয়া-ভাষা আজ সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সমগ্র আসাম রাজ্যের একমাত্র রাজ্যভাষা হতে অসমীয়া উদ্‌গ্রীব। ক্ষমতাচ্যুত বাঙালী অবশ্য আসামে নিরুপায় বোধ করছে ; কিন্তু অসমীয়ার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে আসাম রাজ্যের সদ্য-জাগ্রত খাসিয়া, লুসাই প্রভৃতি জাতিরা। (নাগাদের কথা উল্লেখ করছি না। কারণ, তারা ভারতীয় রাষ্ট্রেও যোগদান করতে অস্বীকৃত।) এলাহাবাদে গত পূজায় অনুভব করেছিলাম হিন্দীর খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতির প্রধান দাবি হচ্ছে—উত্তর প্রদেশে উর্দু ভাষাকে রাজ্যভাষা বলে পরিগণিত যেন না করা হয়। সরাসরি এ-দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রগতিবাদী হিন্দী

সাহিত্যিকরাও ভরসা পান না। উর্দু অবশ্য (বিহার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে বাঙলার মতো) আপনার কর্মফল ভোগ করছে। এবং অনেক সয়ে গেলেও ক্ষণে ক্ষণে সেই জ্বালার প্রতিবাদও করে। বাঙলা কিন্তু এখন আর তা করতেও সাহসী নয়। দিল্লীতে প্রগতি-লেখকদের সম্মেলনে খড়ি বোলির সম্মুখে পূর্বী হিন্দী ম্রিয়মান প্রতিপন্ন হচ্ছিল; মনে হচ্ছিল প্রায় আর এক ভাষা! কিন্তু পরিচালক সমিতির সদস্য নির্বাচনের প্রশ্ন যেই উঠল অমনি 'হিন্দী-সংসার' চারটি আসন নিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে উর্দু-প্রতিনিধি জানালেন হিন্দী যদি চারটি আসন পায় তাহলে উর্দুরও চারটি না হলে চলবে না। আমরা অ-হিন্দীরা ভাবছি—হিন্দী ও উর্দু যদি এতই স্বতন্ত্র ভাষা হয়, তাহলে সমগ্র ভারতে 'হিন্দী-সংসার' কাদের নিয়ে? আর সে-সংসারে হিন্দী উর্দু ছাড়াও হিন্দী-হিন্দুস্তানী প্রভৃতির দ্বন্দ্বই কি মিটেছে? বিহারের লেখক-বন্ধুরা অসহায় বোধ করলেন—'হিন্দী-সংসার'-এর গণনায় এ-সময়ে তাদের স্থান নেই। দক্ষিণের অন্ধ্রভাষী বন্ধুরা সবিনয়ে, কিন্তু স্পষ্ট করে, জানালেন—হিন্দীর ও হিন্দী-উর্দুর এই সংযুক্ত সংখ্যা-প্রাবল্যে দক্ষিণের আপত্তি আছে। দক্ষিণ ভারতকে ক্রমে ক্রমে হিন্দী-বিরোধী করে তোলা ১৯৪৭-এর পরেকার হিন্দী-প্রচারক ও ভারতীয় লোকসভার হিন্দী-ওয়ালাদের অন্যতম কীর্তি।

অবজ্ঞাত কৃষক-জনতা

কিন্তু আরও জটিল প্রশ্নও আছে। বিহারে (মে, ১৯৫৩) মানভূমস্থ পদস্থ বাঙালী বলছেন—"ভাষাগত রাজ্যসীমা-নির্দেশের প্রশ্ন তুলে আমাদের বিপন্ন করছেন কেন পশ্চিম বাঙলার বাঙালীরা? এমনিই তো আমাদের নানা বিপদ বিহারে—অন্য যে-কোনো জাত হলে চাকরি পাব, বাঙালী হলে নয়।" তারপর—"মানভূমের লোকমত নিলে আমরা মানভূমের বাঙালীরা কি বাঙলায় যাব?



না। বাঙলায় যে আরও চাকরি পাব না।” অর্থাৎ, চাকুরে বাঙালী মনে করে সে-ই একমাত্র বাঙালী, যেন মানভূমের বাঙালী বলতে তারাই সব।

সেই শতকরা একটি বাঙালী তার চাকরির গরজে বাঙলা-ভাষা ছেড়েও হিন্দী নিতে অস্বীকৃত হবে না—হিন্দী যখন বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রভাষা; এবং তাতে যখন সমগ্র ভারতে চাকরি-লাভের সুযোগ মিলবে। ঠিক এই কারণেই মণিপুরের বাঙলা-ভাষী শিক্ষিত মণিপুরী আজ আর বাঙলা না পড়ে হিন্দী পড়তে উৎসাহী। কারণ, মণিপুর কেন্দ্র-শাসিত, বাঙলার অন্তর্ভুক্ত তা আর হবে কিনা সন্দেহ; এবং ভারতবর্ষে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দীই আজ চাকরির চাবিকাঠি। অনেকটা এরূপ কারণেই মিথিলার (বিহারের) ভূমিহারেরা অনেকে মৈথিলীর পরিবর্তে হিন্দী গ্রহণে উদ্যোগী—চাকরির সুবিধা হবে। আর মৈথিল ব্রাহ্মণরা আবার মৈথিলী প্রচলনে উৎসাহী; তাহলে মিথিলায় তারাই হবে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার প্রভাবে অগ্রগণ্য। (বিহারে অবশ্য রাজনৈতিক সামাজিক সব প্রশ্নেরই সঙ্গে জড়িত থাকে ভূমিহার, কায়স্থ, ছত্রি প্রভৃতি জন্মগত জাতি বা ‘কাস্ট’-এর প্রশ্ন) দুই দলের কেউ ভাবে না—মিথিলার সাধারণ মানুষ কি ভাষায় কথা বলে, কি ভাষায় তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সহজ, কি তারা চায়।

দেখা যাচ্ছে, ভাষা-সমস্যায় একটা বড় রকমের জটিলতা সৃষ্টি করেছে এই চাকরিজীবীরা এবং এরাই শিক্ষিত বলে মুখর। ভাষা নিয়ে যে এত তর্কবিতর্ক চলছে তা চালাচ্ছেন এই শিক্ষিতরা। এ তর্কবিতর্কের পিছনে বেশ একটা প্রেরণা হচ্ছে চাকরির বখরা। শিক্ষিতদের বিবেচনায় তাঁরাই হবেন এই বিচারে মানদণ্ড। বিহার-রাজ্যে একমাত্র শহুরে মুসলমানরাই উর্দুভাষী বলে সেই ধরনের হিন্দী বা উর্দু জানেন, এবং মুসলমান-হিন্দু সবশুদ্ধ বিহারে বড়-জোর শতকরা ১৬টি লোক সাক্ষর, অর্থাৎ ইস্কুলে গিয়ে এঁরাই হিন্দী শেখেন।

শতকরা ৮৪ জন বিহার-বাসী তাই হিন্দী বলেনও না, শেখেনও না। হিন্দীকে সেখানকার 'কুলট্ স্প্রাখে' ভাষা হিসাবে তাই এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন বড় জোর মাত্র তার শহুরে ও শিক্ষিত শ্রেণীরাই। বাকি ৮৪ জন বিহার-বাসী কি করবেন না করবেন তার প্রশ্নও কেউ তোলে না। অর্থাৎ ভাষা-সমস্যার এই বিতর্কে আমরা মার্কসের কথাটা বিস্মৃত হচ্ছি—দেশটা কার? শিক্ষিতদেরই শুধু, না, সাধারণ মানুষের?

কোন্ অঞ্চলের ভাষা কি হবে তা স্থির করবার উপায় কী? শাসক-গোষ্ঠীর মর্জি? নিশ্চয়ই না। শিক্ষিত ও চাকরিজীবীদের কথা? নিশ্চয়ই না। শহুরে শিল্প-শ্রমিকদের সাক্ষ্য? তা-ও না। কারণ, তাহলে জামশেদপুরের ভাষা হিন্দী (?), কলকাতার শ্রমিক-এলাকার ভাষা 'বাজার-হিন্দী' এবং বোম্বাইর ভাষাও হয়তো আর এক ধরনের 'বাজার-হিন্দী'। তাই আবার স্তালিনের কথাই স্মরণ করতে হয়। স্তালিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—বাকুর শ্রমিকের ভাষা দিয়ে জর্জিয়ার ভাষা-সমস্যার মীমাংসা করা চলবে না। তিনিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জাতি-সমস্যার জটিল প্রশ্নে প্রধান সাক্ষী হল কৃষক, যে জমিতে বাঁধা, দেশে বাঁধা, দেশের অধিবাসী। শ্রমিক এই কৃষকের সাক্ষ্যকেই গ্রাহ্য করে সর্বাগ্রে কৃষক-সাধারণকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার সামাজিক অধিকারে ও সাংস্কৃতিক অধিকারে।

আলোচনার চতুঃসীমা

বাঙলা দেশের ভাষা-সমস্যার আলোচনা করতে আজ যখন আমরা বাধ্য হচ্ছি, তখন তাই গোড়াতেই কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। কি চৌহদ্দির মধ্যে আমরা এই আলোচনা নিবদ্ধ করা সমীচীন মনে করি? তা এই:

(ক) প্রথম নীতি হচ্ছে ভাষা ও জাতি-সমস্যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নীতি। এই কথা বোঝা দরকার, 'নেশন' কি করে

জন্মে। সমাজবিকাশের নিয়মেই এক-একটা স্থায়ী জন-সমষ্টি এক-একটি বিশেষ বাসভূমিতে নিজেদের আর্থিক জীবনযাত্রা, নিজেদের ভাষা এবং নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে বিশিষ্ট মানসিক-সাংস্কৃতিক ধারা অবলম্বন করে 'রাষ্ট্র-জাতি' (নেশন) হয়ে ওঠে। এরূপ বিকশিত জাতি ছাড়াও অনেক জন-সমষ্টি আছে বাইরের চাপে বা সুযোগের অভাবে যারা এসব গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারেনি। কিন্তু সে-পথেই অগ্রসর হয়ে তাদের মধ্যেও (খ) কেউ স্থায়ী জন-সমষ্টিরূপে জাতীয়তার (ন্যাশ্‌নালিটি) অধিকারী হয়েছে, তাদের ভাষা হয়তো এখনি সম্পূর্ণ 'ভাষা' (ল্যাঙ্গোয়েজ্‌) বা অধিভাষা (ডায়ালেক্‌ট)। (গ) অন্য কেউ কেউ সে স্তরে পৌঁছাবার পূর্বে স্থায়ী সমষ্টি হবার পথে এখনো মাত্র উপজাতি (ট্রাইব্‌) রয়েছে, তাদের ভাষাও হয়তো উপভাষা (বা ট্রাইব্যাল বুলি)। সমাজের যথেষ্ট বিকাশ হলে, বিশেষ করে আর্থিক লেনদেন ('মার্কেট') বিস্তারলাভ করলে এরূপ উপজাতি অন্য জাতি বা অধিজাতির সঙ্গে মিশে যায়। কিংবা কাছাকাছি কয়েকটি উপজাতি মিলে নিজেদেরই একটি উপভাষাকে অবলম্বন করে একটি অধিজাতিতে উন্নীত হতে পারে; তাদের উপভাষাও তা হলে এরূপ বিকাশের ফলে অধিভাষা (পূর্ণ ডায়ালেক্‌ট) বা ক্রমে ভাষায় (ল্যাঙ্গোয়েজ) পরিণত হতে পারে। কদাচিৎ এরূপ 'উপজাতি' একা থেকে একটি স্বতন্ত্র অনুজাতিও (ন্যাশ্‌নাল গ্রুপ) গঠন করে। (ঘ) এদের ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অস্থায়ী জন-সমষ্টি থাকে যারা সমাজ-বিকাশে এখনো কোমের (ক্ল্যান্‌) পর্যায়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোত্রে বিভক্ত, ভাষাও যাদের 'বুলি' (ক্ল্যান-স্পীচ্‌) মাত্র। সমাজবিকাশের নিয়ম হল এই—আর্থিক প্রগতি ঘটলে কয়েকটি কোম মিলে তৈরি হয়ে ওঠে উপজাতি, তখন তাদের বিভিন্ন কোমভাষা ভেঙেচুরে গড়ে ওঠে এক 'উপভাষা'।

সাধারণভাবে কথাটা এই—জাতি-বিকাশের একটা প্রক্রিয়া (প্রোসেস্) আছে। সমাজবিকাশের নিয়মে নিকটবর্তী কোম-সমূহ মিলে 'উপজাতি' হয়। আবার 'উপজাতি' ক্রমশ অগ্রসর হয়ে একা, কিংবা বেশি-সময়েই নিকটবর্তী অন্য জন-সমষ্টির সঙ্গে মিশে, হয় 'অধিজাতি'। আবার অধিজাতি আর্থিক-রাষ্ট্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ করে হয় রাষ্ট্র-জাতি (নেশন)। এদের ভাষাও এরূপে বুলি থেকে হয় উপভাষা (ডায়ালেক্‌ট), ক্রমে হয় 'পূর্ণ ভাষা'।

কিন্তু এইটাই সাধারণ নিয়ম হলেও বাস্তববাদীদের পক্ষে জানা প্রয়োজন—(ক) জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়ায় কোন্ জনসমষ্টি কখন বিশেষ কোন্ পর্যায়ে আছে, প্রত্যেকের যথার্থ (কংক্রিট) অবস্থা কী। যেমন, দার্জিলিঙ্-এর গোর্খাদের অবস্থা কী? তারা কি 'অধিজাতি'? এবং (খ) জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়া (প্রোসেস্ অব ন্যাশনাল ডেভ্‌লপমেণ্ট) সেই বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ জাতির পক্ষে কি বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে। যেমন, কোন্ 'উপজাতি' একাই তখনকার মতো 'অনুজাতি' (ন্যাশন্যাল গ্রুপ) হয়ে থাকতে পারে। দার্জিলিঙ-এর 'লেপচা', 'ভুটিয়া' কি গোর্খাদের (অধিজাতি) সঙ্গে মিশে যাবে, না, কিঁ? আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের নানা-জাতির (কোম ও উপজাতি) মানুষ মিলে কি এক হচ্ছে, না, কয়েকটা নতুন জন-সমষ্টির সৃষ্টি করছে? বলা বাহুল্য, এসব বহু অনুসন্ধান সাপেক্ষ। এবং এই অনুসন্ধান-কালে বাস্তববাদী যেমন জাতির উপর বাইরের চাপ, সুযোগের অভাব প্রভৃতি বিচার করবেন, তেমনি কিছুতেই এই সত্য বিস্মৃত হবেন না যে, বিশেষ জন-সমষ্টির মনোভাব, তার নিজস্ব স্বার্থ কী, কী তার নিজস্ব দাবি, অথবা তার কোন্ মনোভাব মূলত তার নয়—প্রভাবশীল অন্য জাতির প্রচারের দ্বারা সাময়িকভাবে উদ্ভূত।

ভাষা ও জাতির ক্ষেত্রে এই হল বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রথম প্রতিজ্ঞা, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয় কথা। এই সমাজবিকাশের ধারা অনুযায়ী ভাষা ও জাতি-সমস্যা সমাধান করতে হলেই আমরা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা মানতে বাধ্য হই। তা হচ্ছে, ভাষা ও জাতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ। তার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে স্তালিনের ব্যাখ্যাত 'জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি'। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অবশ্য নীতি হিসাবে লীগ্ অব্ নেশন্স্-এর দৌলতে এখন সর্বগ্রাহ্য (উইলসন এই শীলমোহর তার গায়ে এঁকে দিয়ে গেছেন)। প্রত্যেক জাতিব ভাষা ও সংস্কৃতির স্বরাজও তাই অবশ্যগ্রাহ্য। তাহলেও লীগ অব্ নেশন্স্-এর সময় থেকে এই ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছে—এই গণতান্ত্রিক জাতীয় নীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যথার্থই কোথাও প্রয়োগ করেনি। সমাজবিকাশের ধারা বুঝলে এটাও বুঝব যে, আসলে ধনিক শাসকশ্রেণী এই নীতি কার্যত গ্রহণ করতে পারে না। সংক্ষেপে হলেও কথাটা তাই এ-দেশে এ-মুহূর্তেও বুঝবার মতো—এদেশেও ধনিক শ্রেণী 'হিন্দী সাম্রাজ্য-বাদে'র প্রশ্রয় দিতে পারে কি না।

ধনিক-গোষ্ঠী চায় 'মার্কেট' বা পণ্য-উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুযোগ। সামন্ততন্ত্রের বাধা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যসীমা ভেঙে এক রাষ্ট্রের আয়ত্তে এক মার্কেট স্থাপন ধনিকদের সাধারণ লক্ষ্য। এই মার্কেটের দায়েই তারা চায় আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য এক ভাষার আধিপত্য; বিভিন্ন জাতি ও ভাষাকে যথাসম্ভব চেপে রাখাও তাদের তাই একটা স্বার্থ। ইংরেজ ভারতবর্ষে ভারতের বিকাশোন্মুখ সকল জাতিকে চেপে রেখে গড়েছিল তার এক-রাজ্য, সকল ভাষাকে চেপে চালিয়েছিল তার শাসনের এক-ভাষা। ইংরেজি ভাষার মারফত ইংরেজ এই লক্ষ্য সিদ্ধ করত, এখনো করছে। ইংরেজের পরেই ভারতের প্রধান ধনিক-গোষ্ঠী এখন মারোয়াড়ী ও গুজরাতী ধনিক-বণিকেরা। এরা কেউ মূলতঃ হিন্দী-ভাষী নয়। ভারতবর্ষের মার্কেট আয়ত্ত করবার জন্য এরা

তবু চায় একটি ভাষা; এবং অনেকাংশেই হিন্দী উত্তরাপথে কাজ-কারবারে বহুল প্রচলিত। তাছাড়া, উত্তর প্রদেশের হিন্দুস্তানী-ভাষী শাসক-শ্রেণীও আজ ভারতবর্ষে বেশি ক্ষমতাপন্ন। তাই ভারতীয় ধনিক ও ভারতীয় শাসক-যূথ আজ একযোগে ইংরেজির স্থলে হিন্দীকে আশ্রয় করে আপনাদের শোষণ-রাজ্য ও শাসন-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। ভারতের সকল জাতির মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন আছে, এ-কথা স্বীকার করেও এই প্রসঙ্গে যা লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা এই—ভারতীয় জাতি-সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশের সুযোগ—এই গণতান্ত্রিক নীতি এই নিখিল-ভারতীয় ধনিক-শাসক শ্রেণীর বিশেষ অভিপ্রেত নয়। অবশ্য বাঙালী, মারাঠী, অন্ধ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষী ক্ষুদ্রতর ধনিকশ্রেণী দাবি করবে নিজ নিজ ভাষায় ব্যবসা চালনা; তারা প্রত্যেকেই প্রবলতম ধনিক-শাসকগোষ্ঠীর গ্রাস-মুক্ত হতে চাইবে নিজেদের প্রাণের দায়ে। কিন্তু এই নানা জাতির নানা ভাষী এই সব ধনিক-স্বার্থে মিল সামান্য। সাম্রাজ্যবাদী নিয়মে তাই বর্তমান প্রবলতম (হিন্দীবাদী) শাসক-গোষ্ঠীও নানাভাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগাবে, এবং এই জাতীয় দাবিসমূহকে জাতির বিরোধ, ভাষার বিরোধ, প্রাদেশিকতার বিরোধে পরিণত করতে চাইবে—যেমন ইংরেজ করতে চাইত। বিহারে, বাঙলায়, আসামে আমরা ত স্পষ্টই দেখছি। কাজেই, এই 'জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের' নীতি সম্বন্ধে যা বুঝবার তা এই যে, সর্বভারতীয় শাসক-শক্তি তার বিরোধী হবে; অন্যদিকে প্রত্যেক জাতির ক্ষুদ্রতর ধনিক-গোষ্ঠীও নিজ দাবিকে বাড়িয়ে অন্য জাতির দাবিকে খর্ব করতে চাইতে পারে। (এই আলোচনা ১৯৫৩ সনে লিখিত; ১৯৫৬ সনে এর বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে।—লেখক) একমাত্র সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, হবে এই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পরিপোষক।

তৃতীয়ত, জাতি-সমস্যার বিচারে ও ভাষার বিতর্কে প্রধানতম এক মানদণ্ড হল কৃষক-সাধারণ ও পল্লীগ্রামের মানুষ; অন্যেরা গৌণ। এবং এদিকে তাদের প্রধান সহায়ক ও নেতা হয় শ্রমিক শ্রেণী।

চতুর্থত, ভারত-রাষ্ট্র (বা পাকিস্তান-রাষ্ট্র) বহুজাতিক ও বহু-ভাষিক রাষ্ট্র। 'ভারত 'নেশন' নয়; 'মহাজাতি'। জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও ভাষাগত স্বরাজের উদ্দেশ্য সে-রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করে বিচ্ছিন্ন করা নয়। বরং তার উদ্দেশ্য—প্রত্যেক জাতি, অধিজাতি, অনুজাতি, উপজাতিকে স্বেচ্ছায় ভারত-রাষ্ট্রের (বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের) সংগঠক করে তোলা, গণতান্ত্রিক ঐক্য ও সামাজিক বিকাশের পথে বহুভাষিক ও মহাজাতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করা—যে-সংস্কৃতি হবে গণতান্ত্রিক, মহাজাতীয় ও বিজ্ঞানসম্মত।

ভাষা-সমস্যার আলোচনা এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ না রাখলে এ আলোচনা বানচাল হবার সম্ভাবনা। তথাপি, ভাষার বিচারে আর দু'একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। যেমন ভাষা আর নৃ-গোষ্ঠী এক না হতেও পারে। নৃ-বিজ্ঞানমতে আমরা বাঙালীরা মোটেই আর্য নই। কিন্তু আমরা আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ নানা কারণে কোনো জন-সমাজ ক্রমে ক্রমে নিজের ভাষা ছেড়ে দিয়ে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কোনো জন-সমষ্টি নিতান্ত ক্ষুদ্র না হলে এবং নিজ ভাষা বিষয়ে অচেতন না হলে তাকে তার ভাষা ছাড়ানো ও ভোলানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমনকি, একবার নিজের ভাষা ভুলে গেলে কোনো জনসমাজের পক্ষে আবার সেই গৃহীত নব-ভাষাকে ছেড়ে নিজের পূর্বতন ভাষা পুনর্গ্রহণও সহজ হয় না। তার দৃষ্টান্ত আয়র্লণ্ড। শত তিনেক বৎসরে আইরিশ ভাষার পরিবর্তে প্রবলতর ইংরেজি ভাষা আইরিশদের ভাষা হয়ে গিয়েছে।

আয়র্লণ্ডের বর্তমান জাতীয়তাবাদী শাসকরা গত তিরিশ বৎসর ধরে প্রাণপণে তাদের সেই কেলটিক ভাষা পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করছে। কিন্তু ইংরেজি কিছুতেই বে-দখল হচ্ছে না। তার কারণ, প্রথমত, কালক্রমে আয়র্লণ্ডের তা নিজ ভাষা হয়ে গিয়েছে, এবং আয়র্লণ্ডের মানুষ আজ জীবিকার দায়ে ইংরেজি-ভাষীদের (ইংরেজ ও মার্কিন) মুখাপেক্ষী—ইংরেজি তাই কেউ ছাড়তে পারছে না।

দ্বিতীয় কথা, ভাষা আর লিপি এক কথা নয়। ভাষার প্রাণ ধ্বনি, উদ্দেশ্য সামাজিকভাবে ভাবের আদানপ্রদান। লিপির সাহায্যে এই উদ্দেশ্য আরও সুসাধ্য হয়। কিন্তু লিপি হচ্ছে ধ্বনির প্রতীক মাত্র। একই ধ্বনি আমরা বাঙলা অক্ষরেও লিখতে পারি —'বাঙালী', 'বাঙ্গালী'; আবার নাগরী অক্ষরেও লিখতে পারি **बांगाली**, কিংবা রোমক অক্ষরেও লিখতে পারি bangali এবং ' ও ˙ দু'টি চিহ্ন যোগ করলে তা বিশুদ্ধও হয়, যেমন ba'ṅga'li' অর্থাৎ বর্ণমালার প্রশ্ন ভাষার প্রশ্ন থেকে স্বতন্ত্র ; কিন্তু তাতে যে ভাষার ক্ষেত্রে গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে তা হিন্দী ও উর্দুর কথা মনে রাখলেই বুঝতে পারি।

ভারতবর্ষের ভাষাসমূহ যে-অক্ষরে লেখা হয় মূলত তা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি থেকে জন্মেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা এসব লিপিতে লিখিত হত। মগধে (ওড়িষ্যা ছাড়া) ও বাঙলায়-আসামে উদ্ভূত হয় আমাদের প্রাচ্য-ধরনের লিপি। বাঙলা দেশে সংস্কৃত ও বাঙলা লেখা হত এই বাঙলা লিপিতে, এখনো সংস্কৃত সে লিপিতেই লেখা হয়। মিথিলার নিজস্ব লিপিও বাঙলার অনুরূপ, আসামের নিজ লিপিও বাঙলার মতোই। বিহারে নাগরী লিপি গৃহীত হয়েছে মাত্র ১৮৮০-এর কাছাকাছি—ইস্কুলে হিন্দী গ্রাহ্য হবার পর থেকে। তার আগেও কায়েতী লিপিতে দলিলপত্র লেখা হত, এখনো কায়েতী অচল হয় নি। বিশেষ সূক্ষ্ম বিচারে না গিয়ে তবু বলতে পারি—কোনো কোনো লিপি

লেখার পক্ষে বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী। যেমন, রোমক বর্ণমালায় একটু চিহ্ন সংযোগ করে আমরা ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষাই লিখতে পারি। নাগরী বর্ণমালার ত্রুটি আছে। কিন্তু বাঙলা বর্ণমালার ত্রুটি নাগরীর থেকেও বেশি।

ভাষা ও জাতি-সমস্যার আলোচনায় সমাজবিকাশের ধারা, গণতান্ত্রিক নীতি, কৃষক ও গ্রাম্যজনতার গুরুত্ব যাঁরা না মানেন, এমনকি ভারত-রাষ্ট্রের (বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের) ভাবী সুস্থ বিকাশের মূল সূত্রগুলো যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁদের সঙ্গে মৌলিক বিচারই প্রয়োজন, তা এক-আধটুকু আলোচনায় সম্ভব নয়। এই চৌহদ্দির মধ্যে আলোচনা করতে গেলেও এই পরিমিত স্থানের মধ্যে আলোচনা শেষ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ, ভারতবর্ষ কি ছোট দেশ ? সে যে রুশিয়া-ছাড়া ইউরোপের মতো, প্রায় একটি মহাদেশ। এই ইউরোপ-খণ্ডে কত রাষ্ট্র, কত জাতি, কত ভাষা, তা কি আমরা ভেবে দেখি ? বরং ইউরোপীয় জাতিদের তুলনায় আমরা একদিকে অনেকটা বেশি পরস্পরের নিকটতর। আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবন সম্ভব হয়। আমরা 'মহাজাতি' গঠন করছি। ভারতভূমি অবশ্য দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের (ও পাকিস্তানের) জাতিদের পরস্পরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তাবোধ সুস্থির, এক ভাষার অভাবেও তা ব্যাহত হয়নি। তবে নিশ্চয়ই শাসনের ও সামাজিক আদানপ্রদানের জন্য কোন একটি ভাষা ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করতে পারলে এই রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু সেরূপ কোনো ভাষা এখন স্বীকৃত হবে কিনা তা নির্ভর করে ভারতীয় (বা পাকিস্তানী) জাতিদের বিকাশের উপর, দু'রাষ্ট্রের ভাষাগত বাস্তব অবস্থার যথাযথ উপলব্ধির উপর, ও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থাপনার উপর।

সাম্রাজ্যবাদী পথ বনাম গণতান্ত্রিক পথ

জাতি-বিকাশের এই স্তরটা যথার্থ বুঝলে আমরা বুঝতে পারি সৌভাগ্য হোক বা দুর্ভাগ্য হোক্, কোনো স্থায়ী সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষে সর্বজাতির গ্রাহ্য কোনো এক-ভাষা ও সর্বজাতি মিশিয়ে এক 'রাষ্ট্র-জাতি' (নেশন) গড়ে ওঠেনি। ভারতভূমির আধুনিক প্রধান-প্রধান জাতিদের বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল (৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শতকের মধ্যে) বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল (আরও অনেক প্রাচীন), তেলেগু প্রভৃতি আধুনিক ভাষার জন্মের সঙ্গেই। এসব জাতি পূর্ণাঙ্গ নেশন হতে পারেনি নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে। কিন্তু তাই বলে এসব জাতি ও ভাষা যতদূর পর্যন্ত বিকাশলাভ করেছে তাতে এখন তাদের চাপা দিয়ে সমস্ত ভারত জুড়ে (বা পাকিস্তান জুড়ে) এক রাষ্ট্র-জাতি গড়া, এক-ভাষা চালানো শুধু অসম্ভব নয়, অভাবনীয়। সম্ভবত পাঠান-রাজত্বেও (১৩শ—১৫শ শতকে) তা সম্ভব হত না, মুঘল-রাজত্বের পরে (১৮শ শতকে) আর তা অসম্ভব। বরং ইতি-মধ্যে (১৯শ-২০শ শতকে) ওসব প্রধান-প্রধান ভাষা ছাড়াও সামাজিক বিকাশের ফলে আরও ছোট ছোট ভাষাও জন্মলাভ করেছে। তাদের আশ্রয় করে সে-সব ভাষা-ভাষীরাও জাতিত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং (স্তালিন যেমন বলেছেন) জাতীয় বিপ্লবের নিয়মেই এসব ছোট ছোট জাতি, অধিজাতি, অনুজাতি, উপজাতিও ক্রমে ক্রমে দাবি করছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সভ্যতার এ-যুগে, ভারতীয় জাতিসমূহের বিকাশের এই স্তরে, **উপর থেকে চাপ দিয়ে** তেমন এক 'রাষ্ট্রভাষা' গঠন বা তেমন এক 'রাষ্ট্রজাতি' গঠন আর সম্ভব নয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি জাতিগঠনের ও রাষ্ট্রচালনার এই পথই চেনে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টান্ত দেখে আমরাও ভাবি তা'ই বুঝি জাতিগঠনের একমাত্র পথ। ভারতবর্ষের বিকাশের ধারা যে

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এবং ভারতবাসী যে তাই ইউরোপের ছাঁচে ঢালা 'নেশান' নয়, আপনার নিজস্ব ধারায় বিকাশমান 'মহাজাতি', এই সত্য আমাদের অনেকের মাথায় ঢোকে না। বুঝতে হবে সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে ভারতের (বা পাকিস্তানের) ভাষা ও জাতি-সমস্যার সমাধান কখনো হত কিনা সন্দেহ। এখন ত গণতান্ত্রিক পথে ছাড়া তার সমাধান নেই-ই। সেই গণতান্ত্রিক পথে নিচে থেকে ঐক্য গড়ে না তুললে আজ ভারতীয় রাষ্ট্র (বা পাকিস্তানী রাষ্ট্র) কারও ঐক্য, কারও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশও সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, এসব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শক্তি গড়ে উঠলেই এই ভাষা ও জাতি-সমস্যার আসল সমাধান সম্ভব। এবং ভারত-খণ্ডের দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক বন্ধনও তখন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে পরিণত হবে। অবশ্য, তার পূর্বে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবার কারণ নেই। গণতান্ত্রিক চেতনাও তো এরূপ প্রয়াসের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে, আকাশ থেকে পড়ে না। অতএব, যখন যতদূর সম্ভব আমরা এই ভাষা ও জাতি-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকব, কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে; মনে রেখে কৃষক ও গ্রাম্যজনতার দাবি এবং ভারতের (বা পাকিস্তানের) ঐক্যেরও দাবি। তা না হলে সুবিধাবাদিতা ও সাময়িক অপকৌশলের দ্বারা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলব।

বাঙলার ভাষা-সমস্যা

ভারতের ভাষাগত অবস্থা

ভারত-ভূখণ্ডের ভাষা-গত অবস্থা যে কি, এ বিষয়ে চিন্তার অরাজকতায় তা অনেকেই ভেবে দেখতে চান না। সেই অরাজকতার ফলেই কেউ কেউ মনে করেন গ্রিয়ার্সনের পরিচালিত 'ভারতীয় ভাষায় জরিপ' (লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া) হচ্ছে নিছক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। কথাটা অর্ধ-সত্যও নয়, সিকি সত্য। ভারত-ভূখণ্ডে ১৭৯টি ভাষা ৫৪৪টি উপভাষা আছে, 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে'র এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি। কিন্তু দুই রাষ্ট্রে (ভারত ও পাকিস্তান) মিলে অন্যূন ১৫।১৬টি প্রধান ভাষা আছে তা মানতে হবে ; তাছাড়া অ-প্রধান ভাষাও যে আরও অনেক আছে তা-ও স্বীকার্য। প্রধান ভাষা বলতে গণ্য : (১) হিন্দী বা হিন্দুস্তানী ভাষা (উর্দুকেও এ-গণনায় 'হিন্দীর' অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যাক্) ; (২) বাঙলা ; (৩) ওড়িয়া ; (৪) মরাঠী ; (৫) গুজরাতী ; (৬) সিন্ধী (পাক) ; (৭) হিন্দকী বা লহন্দী (পশ্চিম পঞ্জাবী, পাক) ; (৮) পশতু (পাক) ; (৯) পঞ্জাবী ; (১০) অসমীয়া ; (১১) নেপালী (হিন্দীর নিকট-আত্মীয়) ; (১২) কাশ্মীরী ; (১৩) তেলেগু ; (১৪) তামিল ; (১৫) কন্নড় ; (১৬) মালয়ালম্। ভারতীয় রাষ্ট্রের বিধানতন্ত্রে গৃহীত হয়েছে ১৫টি 'আঞ্চলিক' ভাষা : (১) হিন্দী, (২) উর্দু, (৩) বাঙলা, (৪) অসমীয়া, (৫) ওড়িয়া, (৬) মারাঠী গুজরাতী, (৮) পঞ্জাবী, (৯) তামিল, (১০) তেলেগু, (১১) মালয়ালম্, (১২) কন্নড়, (১৩) সংস্কৃত, (১৪) ইংরেজি ও (১৫) কাশ্মীরী। (বলা বাহুল্য ইংরেজি কারও কারও মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা নয় ; সংস্কৃতও 'আঞ্চলিক' ভাষা নয়। হিন্দী ও উর্দুকে স্বতন্ত্র বলা চলে কি ? আধুনিক ভারতে প্রধান ভাষা বলতে তা হলে মাত্র ১২টি।) এর মধ্যে নাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দীই ভারতের 'রাষ্ট্রভাষা'। কিন্তু অ-প্রধান ভাষাগুলি কী-কী ? কী হিসাবে তারা অ-প্রধান ?

লোকবলে ক্ষুদ্র বলে কি ? সাঁওতালী প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষা তো তা নয়। তাতে সাহিত্য রচিত হয়নি বলে ? মৈথিলীতে কাব্য আছে ; ভোজপুরিয়া, রাজস্থানীরও লোক-সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। তবু তারা অ-প্রধান কেন ? না, এসব ভাষা-ভাষীরা 'ভাষার স্বরাজ' চায় না বলে ? কে বললে সে-কথা ? শাসকেরা, বণিকেরা, চাক্‌রেরা, না গ্রাম্যজনতা ?

এই বিতর্ক ছেড়ে দিই। আমরা ভাষাতাত্ত্বিকদের (গ্রিয়ার্সন ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য মিলিয়ে) বিচার থেকে কয়েকটি অবিসংবাদিত সত্য বুঝতে পারি। জাতি ও ভাষার বিকাশ ভারতবর্ষেও অসমানভাবেই হয়েছে। কেউ এগিয়ে গিয়েছে, কেউ পিছিয়ে আছে। অবস্থাটা তাই এখন এরূপ : বাঙালী, হিন্দুস্তানী, মরাঠী, গুজরাতী তেলেগু, তামিল প্রভৃতি কোনো কোনো জাতি প্রায় রাষ্ট্র-জাতির (নেশন) পর্যায়ে উঠে গিয়েছে, তাদের ভাষাও 'জাতীয় ভাষা'র স্তরে গণ্য। কিন্তু কোনো কোনো ভাষী সে-সব গুণের অধিকারী হলেও এখনো রাষ্ট্র-জাতির (নেশন) পর্যায়ে পৌঁছয়নি—এদের বলতে পারি অধিজাতি (ন্যাশ্‌নালিটি) ; এদের ভাষা হয়তো উপভাষার (ডায়ালেক্‌ট) স্তর ছাড়িয়ে উঠছে। বলতে পারি, অধিভাষা (সাব-ল্যাঙ্গুয়েজ)। তৃতীয় স্তরে আছে আর কোনো কোনো জাতি ও তাদের ভাষা, বলতে পারি তারা উপজাতি (ট্রাইব) ও তাদের ভাষা 'উপভাষা'। এ-ছাড়াও শেষে থাকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও ভাষা। যেমন, কোম (ক্ল্যান) ও তাদের 'বুলি', অনুজাতি ও অনুভাষা, কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো জনসমষ্টি ও তাদের ভাষা।

১৯৩১-এর হিসাব

ভারতের ও পাকিস্তানের ভাষার ও জাতির এই অসমান বিকাশের কথা মনে রেখে আপাতত একটা ভাষা-বিকাশের হিসাব দাঁড় করানো যায়।

ভাষা-গোষ্ঠীর দিক থেকে ভাষা-বিচার ভাষা-তাত্ত্বিকদের পক্ষে যত প্রয়োজন আমাদের ততটা নয়, একথা এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে। সে-বিচার অধ্যাপক সুনীতিকুমার সুন্দর ভাবে করে রেখেছেন। প্রয়োজন মত এখানেও বন্ধনী মধ্যে তা উল্লেখ করা হল। ভারতের ভাষাগোষ্ঠী প্রধানত ৪টি। ১৯৩১ সালের হিসাব মতো সমগ্র ভারতে তাদের শতকরা অনুপাত ছিল এরূপ : অস্ট্রিকভাষী (কোল বা সাঁওতাল, গোণ্ড প্রভৃতি) ১৩% ; দ্রাবিড়ভাষী (তেলেগু, তামিল প্রভৃতি) ২৩% ; মঙ্গোলোয়াদ বা ভোট-চীনাভাষী (মণিপুরী, গারো, লুসাই প্রভৃতি) ১% জনেরও কম ; এবং হিন্দ-আর্যভাষী (পঞ্জাবী, সিন্ধী থেকে বাঙলা, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা। এ-সব ভাষা ৬টি প্রধান আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত) মোট প্রায় ৭১% জন এ-গোষ্ঠীর ভাষা বলত। ১৯৩১ সালে এ-গোষ্ঠীর পূর্বীয় শাখার বাঙলা বলত ৫৩৫ লক্ষ, ওড়িয়া ১১০ লক্ষ, অসমীয়া ২০ লক্ষ, মৈথিলী ১০০ লক্ষ, মগধী ৬৫ লক্ষ, ভোজপুরিয়া ২০৫ লক্ষ। ১৯৪১ সালের ভারতীয় আদমসুমারিতে ভাষার হিসাব নেই। আর ১৯৫১ সালের হিসাব নিয়ে গোলমাল অশেষ; পাদটীকায় তা উদ্ধৃত হল।* তাই ভাষাতাত্ত্বিকরা ১৯৩১ সালে হিসাবের অনুপাতেই এখনকার ভাষার হিসাবও করে থাকেন।

* ইং ১৯৫১ সালের লোক-গণনায় ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ভাষাসমূহ যাদের স্বভাষা তাদের সংখ্যা নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছে : ভারত-রাষ্ট্রের মোট ৩২·৩৯ কোটি লোক ১৫টি "আঞ্চলিক ভাষা" বল্‌ত। তার মধ্যে

১। হিন্দী ভাষী—মোট ১৪ কোটি ৯৯ লক্ষ (উর্দুভাষীর সংখ্যা ১ কোটির উপরে। উর্দু, হিন্দুস্তানী, পঞ্জাবী ও পাহাড়ীকেও 'হিন্দীর' মধ্যেই এই হিসাবে ধরা হয়েছে)।

২। তেলেগু ভাষী—মোট ৩ কোটি ২৯ লক্ষ

৩। মরাঠী „ „ ২ কোটি ৭০ লক্ষ

৪। তামিল - —মোট ২ কোটি ৬৫ লক্ষ

৫। বাঙলা „ „ ২ কোটি ৫১ লক্ষ

[পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলাভাষীর সংখ্যা—প্রায় ৪ কোটি। ১৯৫১-র পরবর্তী ভারতাগত উদ্বাস্তু বাঙলাভাষীদের উপরের গণনায় ধরা হয়নি।]

৬। গুজরাতী ভাষী—মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ

৭। কন্নড় " " ১ কোটি ৪৪ লক্ষ

৮। মালয়ালাম " ১ কোটি ৩৩ লক্ষ

৯। ওড়িয়া " " ১ কোটি ৩১ লক্ষ

১০। অসমীয়া " " ৪৯ লক্ষ

এ ছাড়া লক্ষণীয়—৪৭টি উপভাষা আছে, তার প্রত্যেকটি লক্ষাধিক লোকের যা নিজ ভাষা। যেমন,

১১। সাঁওতালী ভাষীর সংখ্যা মোট ২৮ লক্ষ

১২। গণ্ড " " " ১২ লক্ষ

১৩। ভিল " " " ১১.৬০ লক্ষ

৭২০টি উপভাষা বা অনুভাষা আছে যার ভাষীরা সংখ্যায় প্রত্যেকে এক লক্ষের কম।

৬৩টি অ-ভারতীয় ভাষার মধ্যে ইংরেজীভাষীর মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৬ হাজার।

১৯৫১-তে অবশ্য বিহারী ভাষাগুলি আর স্বতন্ত্র উল্লেখিত হয়নি, হিন্দী বলেই গণ্য হয়েছে ; কিন্তু ১৯৩১-এর লোক-গণনায় দেখা যায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ বিহারী ভাষা তিনটি তখন বল্‌ত। যথা :

(১) ভোজপুরী (ইউ, পী, বাদ দিয়ে বিহারে) ভাষীর সংখ্যা ছিল ৬৭ লক্ষ।

(৫) মৈথিলী ভাষীর সংখ্যা ছিল মোট ১ কোটি

(৬) মগধী ভাষীর সংখ্যা ছিল মোট ৬২ লক্ষ।

১৯৫১-এর লোক-গণনা মতে আগে যারা "বাঙলা"কে মাতৃভাষা বল্‌ত তারা এখন অনেকেই 'হিন্দীকে' মাতৃভাষা বল্‌ছে।

১৯৫১-তে বিহারে মোট বাঙলাভাষীর সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার—এর মধ্যে ৮ লক্ষ মানভূমের ও ২.১ লক্ষ সিংভূমের।

১৯৫১-এর লোক-গণনায় পশ্চিম বাঙলায় হিন্দীভাষীর (উর্দু ৪.৫ লক্ষ নিয়ে) সংখ্যা মোট ২০ লক্ষ (বিহারী লোকসংখ্যা ১১ লক্ষের উপর), সাঁওতালী ভাষীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ; নেপালীভাষীর সংখ্যা ২ লক্ষ ১২ হাজার।

(ক) বর্তমানে 'জাতীয় ভাষার' পর্যায়ে উঠেছে প্রধান প্রধান ভাষাসমূহ। ভারতরাষ্ট্রে 'আঞ্চলিক' ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে নেপালী ছাড়া প্রায় সব কয়টি ভারতীয় প্রধান ভাষা, 'আঞ্চলিক' কথাটার যাই অর্থ হোক্। (খ) 'অধিভাষা' ঃ অস্ট্রিক—২৫ লক্ষের উপর, গোর্খালি, নেওয়ারি, খাসিয়া, লুসাই গারো; বড়ো, মণিপুরী, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, মালবী ও রাজস্থানী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা। এ-পর্যায়ে উন্নত হচ্ছে—সাঁওতালী (অস্ট্রিক—২৫ লক্ষ), ওরাওঁ (দ্রাবিড়—১০ লক্ষ) প্রভৃতি কোন কোন উপজাতির ভাষা। এ-সবের কোনো কোনো ভাষা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু স্বীকৃত; অর্থাৎ তাতে 'সাহিত্য'ও লিখিত হয়। এ 'অধিভাষা'র পর্যায়েই হয়তো পড়বে পাকিস্তানের লহন্দী ভাষা। এ সব ভাষার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। (গ) উপজাতির উপভাষা ঃ যেমন গোণ্ড (দ্রাবিড়—১১ লক্ষ), মুণ্ডারি (অস্ট্রিক—৬॥০ লক্ষ), শবর (অস্ট্রিক), কন্ধ (দ্রাবিড়), কোড়গু (দ্রাবিড়), লেপ্চা (ভোট-চীনা), টিপরাই (ভোট-চীনা) প্রভৃতি (এবং পাকিস্তানের ব্রাহুই, শিণা, চিত্রলী, বাশ্গলী, চট্টগ্রামী প্রভৃতি) যেসব উপভাষা অনেকদিন চাপা পড়ে আছে, কিংবা এতদিন বিকাশের সুযোগ পায়নি। গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে এদেরও বিকাশলাভ করার সম্ভাবনা। সব কয়টি না হোক কোনো কোনাটি বিকশিত হবে। (ঘ) এর পরেও থাকবে অবশ্য নানা বিচ্ছিন্ন অনুজাতির অনুভাষা। এর মধ্যে আসামের চা-বাগানের নানা ভাষী জনসমষ্টিকে ধরতে পারি।

আজকের দিনে নতুন করে ভাষাগত বৈজ্ঞানিক জরিপ না হলে বলা অসম্ভব যে কোন্ অনুভাষা টিকবে, কিংবা কোন্ ভাষা অধি-ভাষা, কোন্ ভাষা উপভাষা।

জাতি-সমস্যার ছাত্র হিসাবে আমরা জানি—এক স্তর থেকে আর এক স্তরে এদের উন্নতি ঘটছে ঐতিহাসিক সূত্রে, সামাজিক বিকাশের নিয়মে।

বাঙলার বর্তমান ভাষা-সমস্যা

একদিক থেকে মনে হয় ভারতের ভাষা-সমস্যার চেয়েও জটিল বাঙলার ভাষা-সমস্যা। পাকিস্তান ও ভারতরাষ্ট্রে অন্যতম প্রধান ভাষা হিসাবে বাঙলা স্বীকৃত। জাতি হিসাবেও বাঙালীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার সমস্যা তাই বলে কম নয়। যথাঃ প্রথম দফা সমস্যা হল—পশ্চিম বাঙলার নিজস্ব সমস্যা (পূর্ব-বাঙলার সমস্যা আমরা এক্ষেত্রে আলোচনা করব না); দ্বিতীয়, পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার ভাষাগত সম্পর্কের সমস্যা; তৃতীয়, পশ্চিম বাঙলা ও ভারতের সমস্যা (বাঙলা ও রাষ্ট্রভাষার সমস্যা এবং পশ্চিম বাঙলা ও তার প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের সমস্যা); চতুর্থ সমস্যা, বাঙলা ও বিশ্ব-সাংস্কৃতিক সংযোগের সমস্যা।

পশ্চিম বাঙলার ভাষাগত অবস্থা

পশ্চিম বাঙলার অবস্থাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। কারণ, বাঙালী জাতি দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত; সেই দুই খণ্ডের সমস্যার কথা না আলোচনা করে উপায় নেই। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, সাধারণভাবে পাকিস্তানের সমস্যার কথা বলবার অধিকারী ভারতীয়রা নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীর নিজস্ব সমস্যার কথাও পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীই আলোচনা করবার অধিকারী।

পশ্চিম বাঙলার অবস্থা সাধারণভাবে বোঝা যায় ১৯৫১ সালের আদম-সুমারি থেকে। তা থেকে দেখিঃ প্রথমত, ভারতরাষ্ট্রের ৯টি 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে আয়তনে পশ্চিম বাঙলা ক্ষুদ্রতম। (প্রসঙ্গত বলা যায়, আয়তনে পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম বাঙলার অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৫ : ৩, অথবা দশ আনা—ছয় আনা)। পশ্চিম বাঙলার মোট আয়তন ৩০,৭৭৫৩ বর্গ মাইল। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও কিন্তু পশ্চিম বাঙলার বসতির ঘনতা সর্বাধিক—প্রতি বর্গ-মাইলে ৮০৬

জন। অতএব, এখানে চাষের জমি আর বিশেষ নেই, বাসযোগ্য জমিও প্রায় নেই। পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি ঘনবসতি আছে একমাত্র জাপানে। ইংলণ্ড-ওয়েল্স-এর প্রতি বর্গমাইলে বসতি যথেষ্ট, কিন্তু এর চেয়ে ১২৫ জন কম। জন-সমাজের গঠনের দিক থেকে পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যা আড়াই কোটির কম (২ কোটি ৪৮ লক্ষ)। এর মধ্যে পশ্চিম বাঙলার খাঁটি বাসিন্দা ২ কোটির উপর। বহিরাগত প্রায় ৪৬ লক্ষ (বাইরে গিয়েছে মাত্র ৩ লক্ষ)। ভারত-ভূখণ্ডে বাঙলাভাষীর মোট সংখ্যা ৬ কোটির বেশি—মাতৃভাষা হিসাবে ভারতবর্ষীয় ভাষার মধ্যে বাঙলার স্থান তাই সর্বাগ্রে, যদিও হিন্দীকে ঘরের বাইরেকার কাজকর্মের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে প্রায় ১৫।১৬ কোটি লোক। পশ্চিম বাঙলার আড়াই কোটি বাসিন্দার মধ্যে সকলেই অবশ্য বাঙলাভাষী নয়; হিন্দুস্থানী, নেপালী, ইংরেজি, সাঁওতালী প্রভৃতি নানা ভাষার অনেক মানুষও বাঙলার 'নাগরিক' বা বাসিন্দা। পশ্চিম বাঙলার জনসংখ্যার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তাই লক্ষণীয়ঃ

পশ্চিম বাঙলায় বহিরাগত ভারতীয়দের মোট সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। বহিরাগত 'উদ্বাস্তু' বাঙালী ২১ লক্ষ (১৯৫৬-তে তার চেয়ে অনেক বেশি)। বহিরাগত অ-ভারতীয় প্রায় ৩ লক্ষ। এই অ-ভারতীয়দের মধ্যে পাকিস্তানী (অধিকাংশই অবশ্য বাঙালী) ২ লক্ষ ৬৭ হাজার। অতএব বিভিন্ন ভাষী বহিরাগতদের অপেক্ষা বাঙালাভাষী বহিরাগতদের সংখ্যা দুই পর্যায়েই বেশি।

ভারতীয় বহিরাগতদের মধ্যে দেখি বিহার থেকে এসেছে মোট ১১ লক্ষের বেশি মানুষ, উত্তর প্রদেশ থেকে ৩ লক্ষের কম, রাজস্থান থেকে প্রায় ৫৬ হাজার, মধ্যপ্রদেশ থেকে ৩৮ হাজার। এ-ছাড়া অন্য ভারতীয়দের মধ্যে গণনীয় ২ লক্ষ ওড়িয়া, মাদ্রাজের দ্রাবিড়ভাষী ৫২ হাজার, পঞ্জাবী ৩৮ হাজারের উপরে। ভাষা হিসাবে দেখলে তাই দেখা যায়—বাঙলা ছাড়া পশ্চিম বাঙলায় অন্যভাষীদের মধ্যে

আছে প্রায় ১৬ লক্ষ (১৫'৭৫) হিন্দুস্তানী (অবশ্য 'বিহারীদের' নিয়ে। বলা বাহুল্য, এরা অধিকাংশেই শিল্পাঞ্চলের 'বাজার হিন্দী' বলে); ওড়িয়াভাষী ২ লক্ষের কম, পঞ্জাবী (গুরুমুখী)-ভাষী ৩২ হাজার ও পঞ্জাবী (পশ্চিম পাঞ্জাবী ?)-ভাষী ৫ হাজার, তেলেগুভাষী ৫০ হাজার, তামিলভাষী ১৫ হাজার, অসমীয়াভাষী প্রায় ১০ হাজার। ভাষার হিসাবে এই অ-বাঙালী ভারতীয়দের সংখ্যা দাঁড়ায় সবশুদ্ধ ২০ লক্ষ। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ১৯২১-এ যা ছিল ১৯৫১-তে তার দ্বিগুণ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ-সংখ্যার মধ্যে, বিশেষ করে বিহার থেকে আগতদের মধ্যে, মাত্র ৩ লক্ষ লোক পরিবার নিয়ে বাঙলায় থাকে, বাকি ৭ লক্ষেরও বেশি বিহারী তাই মুখ্যত এখানকার অধিবাসী নয়। তারা অধিকাংশই অবশ্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক। কিন্তু শ্রমিক-ধর্ম তারা সম্পূর্ণ লাভ করেনি—অর্থাৎ 'নির্বিত্ত' বা প্রোলিটেরিয়েট নয়,—দেশে বাড়ি আছে, ঘর আছে, গোরু আছে, জমি আছে এবং ফিরে গিয়ে সেখানেই আবার কৃষক ও মহাজন হয়ে বসে। শ্রমিক-শ্রেণীর এরূপ অংশ তাই বাঙালীর ভাষা-সমস্যায় বা জাতি-সমস্যায় যথার্থ নেতৃত্ব দান করতে পারে না, তা মনে রাখা উচিত।

তৃতীয় একটি কথা স্মরণীয়—পশ্চিম বাঙলার বাইরে ভারতরাষ্ট্রে বাঙলাভাষীর সংখ্যা কত? ১৯৫১ সালের বিহারের সরকারী হিসাবে বিহার রাজ্যে বাঙলা মাতৃভাষা ছিল ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার লোকের; ৪৫ হাজার 'দ্বিভাষিক';—কিন্তু ৬ লক্ষ ২৫ হাজার 'দ্বিভাষিক' অন্যভাষীরাও বাঙলা বলত। (সরকারী মতে মোট ৩ লক্ষ ২০ হাজারের বাঙলা 'গৌণভাষা'—'মাতৃভাষা' নয়, কিন্তু তা ঘরে-বাইরে **সচরাচর** ব্যবহার্য ভাষা)। আসামে বাঙলাভাষী মোট ১৮ লক্ষের মত; এ সংখ্যা কতটা গ্রাহ্য, এবং অসমীয়া ভাষার সংখ্যাই বা কত, তা বলা যায় না। তথাপি ত্রিপুরাকে মেলালে বাঙলাভাষীর সংখ্যা আরও ৩.৭৪ লক্ষ বাড়বে। ওড়িষ্যায়

বাঙলাভাষীর সংখ্যা ৮৬ হাজার। তারপর উত্তরপ্রদেশে ৭৩ হাজার বাঙলাভাষী বরাবর বাস করে। এইসব কথা মনে রাখলে বুঝব—ভারতরাষ্ট্রে মোট বাঙলাভাষী আড়াই কোটির উপরে।

পশ্চিম বাঙলায় বাঙলার স্থান

ভারতবর্ষের মধ্যে জাতি হিসাবেও বাঙালী বোধ হয় সর্বাধিক বিকশিত। ভাষা হিসাবেও বাঙলা ভাষা সর্বাধিক উন্নত। কাজেই ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি ভাষার চাপে না পড়লে ইতিপূর্বেই এ-ভাষা বাঙালীর জীবনযাত্রায় সকল কাজের ভাষায় পরিণত হতে পারত। ১৯৪৭-এর পরে আশা করা গিয়েছিল যে, অন্তত পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় বাঙলা ভাষা রাজ্যভাষায় পরিণত হবে, তার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা থাকবে না। কিন্তু ইংরেজির স্থান ভারত রাষ্ট্রে হিন্দীকে দেবার সিদ্ধান্ত হল, পাকিস্তানে তা উর্দু গ্রহণ করতে গেল। (১৯৫৫-তে বাঙলাও পাকিস্তানের অন্যতম ভাবী রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃত হয়েছে)।

ইংরেজির স্থান হিন্দী দিয়ে পূরণ কতটা সম্ভব তা বিচার এখন না করেও বলা যায়, প্রথমত, পশ্চিম বাঙলায় শাসন-কার্যে বাঙলাকে রাজ্যভাষা না করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। পূর্ব বাঙলায়ও বাঙলা রাজ্যভাষা হওয়া পূর্বেই উচিত ছিল। এমনকি, জনসংখ্যার দিক থেকে দেখলে বাঙলা সমগ্র পাকিস্তানেরই প্রধান ভাষা। তাই পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রভাষা' যদি কোনো ভাষাকে করা সম্ভব হয়, তাহলে তা করা যায় বাঙলাকে (অবশ্য প্রচলিত অর্থে বহুজাতিক রাষ্ট্রে কোনো 'রাষ্ট্রভাষা' হতে পারে না, তা পরে আমরা আলোচনা করছি)। পশ্চিম বাঙলার বর্তমান শাসকরা সরকারীভাবে বরং হিন্দী-প্রচারে উৎসাহ দেন, পূর্ব-পাকিস্তানের শাসকবর্গও উর্দু প্রচারে ও বাঙলা-লিপির পরিবর্তে আরবী-লিপির প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। উভয় রাজ্যেই বাঙলা কার্যত অবজ্ঞাত। কাজেই প্রথম সমস্যা

হল—বাঙলা ভাষাকে শাসন-বিভাগে ও বিচার-বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার কথা। একথা সর্বস্বীকৃত যে, অন্তত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চাই এবং সেই প্রাথমিক শিক্ষা সকল রাজ্যেই হবে সকল জন-সমষ্টির মাতৃভাষায়। একথা স্বীকার করে বলতে হবে বাঙলার সমস্যা হল—বাঙলা ভাষাকে রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগে মধ্যশিক্ষা থেকে উচ্চতম শিক্ষারও প্রধানতম মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত করা। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন বাঙালী নেই যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রয়োজন ঘোষণা করেননি। বাঙলা ভাষার এ-দিকে দাবি খর্ব করা আরম্ভ হয়েছে বর্তমান কংগ্রেস শাসকদের হাতে। বিশেষ করে ভারতের ও পশ্চিম বাঙলার শাসক-গোষ্ঠী হিন্দী-ধনিক গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা বাঙলার দাবিতে কর্ণপাত করেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান (১৯৫১) পরিচালকবর্গ শাসক-গোষ্ঠীর তাঁবেদার—বাঙলা তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা পায় না। ইংরেজিতে এঁদের কার বিদ্যা কতখানি তা নিয়ে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা নেই, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা বিমাতার সেবায় যতটা উৎসাহী, স্বমাতার সম্বন্ধে তেমনি নিরুৎসাহ,—সে-তুলনায় মাসীর (হিন্দী ভাষার) প্রতি অধিক মমতাশীল। ভারতবর্ষের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীকে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই বাঙলা ভাষা অপেক্ষা এদিকে হিন্দী বেশী উপযোগী ছিল না। তবে এখন প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দী নিশ্চয়ই এদিকে উন্নত হবে —উদ্যোগের অভাবে বাঙলাও এদিকে খর্ব হয়ে থাকবে। শিক্ষার ব্যাপারে গোঁড়ামি না করেও আমরা বলতে পারি—পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষায় বাঙলাকে সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিদেশীয় অধ্যাপকদের অবশ্য এখনকার মতো ইংরেজিতে শিক্ষাদানের

অধিকার থাকবে। মধ্যশিক্ষার শেষ দুই ক্লাসে বেসিক (বুনিয়াদী) হিন্দী ও বেসিক ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট। এই মূল হিন্দী ও মূল ইংরেজির একটি শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরি করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য হবে ইংরেজির ও হিন্দীর মূল শব্দ ও ব্যাকরণ শিক্ষা দান—শুধু ততটুকু শিক্ষা দেওয়া (অনেকটা যেমন এখন আমরা সংস্কৃত শিখি), যতটুকু ভাষার মূল ব্যাকরণ ও শব্দ-সম্পদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে পরে জীবনযাত্রায় কেউ নিজ প্রয়োজন অনুসারে হিন্দী ও ইংরেজি বোধকে গভীর ও ব্যাপক করে নিতে পারবে। ইংরেজি (ও হিন্দী) শুদ্ধ না লিখতে পারলে কোনো বাঙালী ছাত্র কলেজে উচ্চশিক্ষার অধিকার পাবে না—এমন বর্বর ও দাস-সুলভ শিক্ষার প্রথা পৃথিবীর আর কোনো সভ্যদেশে আছে কিনা জানি না।

শিক্ষায় ভাষার প্রশ্ন নিয়ে এখানে নিঃশেষে আলোচনা করছি না। কিন্তু সাধারণ কয়েকটি ভুল নিরসনের জন্য বলতে পারি—(ক) আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অ-বাঙালী জন-সমষ্টির জন্য প্রয়োজনানুরূপ মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষপাতী, (খ) সকলের জন্য অবিলম্বে মাতৃভাষায় সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ প্রাথমিক শিক্ষা চাই, (গ) মাতৃভাষা ছাড়াও প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় একটি ভাষার মূল কথা শিক্ষার আমরা পক্ষপাতী (প্রায়ই সে-ভাষা ভারতে হবে হিন্দী, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উত্তর ভারতের ছাত্রেরা একটি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাই বা শিখবেন না কেন? অন্তত সর্বভারতীয় চাকুরেদের পক্ষে তা অবশ্য-শিক্ষণীয় হওয়া উচিত)। (ঘ) সাহিত্য-শিক্ষায় যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কলেজ-ক্লাশে অন্তত একটি উন্নত অ-ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য নিশ্চয়ই বিশেষভাবে পাঠ্য হবে (আপাতত সে-ভাষা ও সাহিত্য নিশ্চয়ই হবে ইংরেজি। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কারো কারো পক্ষে তার স্থলে রুশ বা চীনা পাঠ্য হয়ে ওঠে, তাহলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই)।

তৃতীয় সমস্যা ঃ বাঙলার অধিবাসী ও বহিরাগত অ-বাঙলা-ভাষীদের শিক্ষাদীক্ষার সমস্যা। মোটের উপর, উপরের নীতি থেকেই তা বোধগম্য হয়। এ-সব জাতির মধ্যে নানা পর্যায়ের জনসমষ্টি আছে। যেমন, (১) দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের গোর্খারা জাতি হিসাবে এতটা অগ্রসর যে পশ্চিম বাঙলা রাজ্যে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন' নিশ্চয়ই তারা এখনই লাভ করবে; তাদের শাসক, বিচারক প্রভৃতি তারা নির্বাচিত করবে এবং কলেজী শিক্ষাদীক্ষাও নেপালী ভাষা উন্নত হলে তাতে তারা লাভ করবে—অবশ্য, রাজ্যভাষা বলে বাঙ্লাও তারা শিক্ষা করবে। (২) পশ্চিম বাঙলায় 'উপজাতিদের' জনসংখ্যা ১২ লক্ষের কম—সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, লেপচা, মেচ, ভুটিয়া ইত্যাদি। এদের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান, তাদের মোট জন-সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার। কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন যূথ হিসাবে নানা জেলায় বাস করে। তথাপি যেখানেই ছাত্র-সংখ্যা অন্যূন ৫০টি হবে সেখানেই তারা নিজ মাতৃভাষা সাঁওতালীতে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে। এভাবে এ-সব অনুন্নত জাতিকে বিশেষ সাহায্যদান করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সমস্ত পশ্চিম বাঙলা রাজ্যের দায়িত্ব। ওরাওঁ, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি অন্যান্য উপজাতিরাও যেখানেই (যেমন দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে), ওরকম যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করছে, সেখানেই তাদের একরম সুযোগ দান করা আবশ্যক। (৩) অনুন্নত ছাড়াও যে-সব অ-বাঙালী বাসিন্দা বাঙলায় আছে, যেমন হিন্দুস্তানীভাষী, ওড়িয়াভাষী, পঞ্জাবীভাষী, ইংরেজিভাষী—তারাও নিশ্চয়ই নিজেদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবে, এবং যেখানে ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষাও স্ব-স্ব ভাষায় তারা যাতে লাভ করতে পারে তার সুযোগও দিতে হবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সাংস্কৃতিক সাযুজ্য

এ-বিষয়ে প্রশ্নমাত্র নেই যে, পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থির করবেন তার জনসাধারণ (শাসকগোষ্ঠী মাত্র নয়) স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে; এবং পূর্ব-পাকিস্তানেরও রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবন নির্ণীত করবেন তার জনসাধারণ (শুধু শাসকগোষ্ঠী নয়) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তথাপি দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায়--দুই বাঙলার বাঙালীরই ভাষা এবং সাহিত্য এক, শিল্প এক, সংস্কৃতি এক। বিশেষ করে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই জাতীয় মানসিকতা ও জাতীয়-চরিত্র প্রতিফলিত ও রূপায়িত হয়ে ওঠে। কোনো বাঙালী জন-সমষ্টিই এই মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে সহজে পারবে না। সে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই অন্তত এক শ বছরের মতো তারা সে-সংগ্রামেই নিজেদের শক্তির অপব্যয় করবে, ততক্ষণে অন্য ভাষীরা আরও অগ্রসর হয়ে যাবে। পূর্ব বাঙলার বাঙালী এই সত্য বুঝেই বুকের রক্ত দিয়ে নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করছেন। পৃথিবীতে এমন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বেশি হয়নি।

বাঙলা পৃথিবীর ছ-কোটি বাঙালীর মাতৃভাষা—শুধু পশ্চিম বাঙলার দুই কোটির নয়, বা পূর্ব-পাকিস্তানের চার কোটির নয়। বাঙালী শাসকগোষ্ঠী যতটা আত্মবিস্মৃত হোক, দিল্লী বা করাচীর যতটাই মুখাপেক্ষী হোক রাজনীতির প্রসাদজীবীরা, বাঙালী বুদ্ধি-জীবী ও বাঙালী সাহিত্যিক যেন বাঙালী-সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান্ আমরা যে-ই যা লিখি, যা সৃষ্টি করি, মনে রাখব তা কোনো সম্প্রদায়ের জিনিস নয়, বাঙলীর ও মানুষের সম্পদ। আমাদের প্রত্যেকটি সৃষ্টির অধিকারী সমস্ত বাঙালী, দুই রাষ্ট্রেই বাঙালী—ভাবী দিনের সন্তানেরা। বাঙলা ভাষার ছাড়পত্র তারা জন্মসূত্রে লাভ করেছে, তাদের মাঝখানে দিল্লী-করাচীর আর্থিক-সাংস্কৃতিক দেয়াল কিছুতেই দুর্লঙ্ঘ্য হতে পারে না।

বাঙলা ও ভারত

বাঙলার নিজস্ব সমস্যা ও দুই বাঙলার যোগাযোগের সমস্যা ব্যতীত তৃতীয় প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে বাঙলা ও ভারতের সম্পর্কের প্রশ্ন। এই প্রশ্নেরও দুটি দিক আছে—একটি হল পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের সম্পর্ক (এবং পূর্ব-পাকিস্তান ও পাকিস্তান-রাষ্ট্রের সম্পর্ক); দ্বিতীয়টি হল পশ্চিম বাঙলার ও ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক (এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাজ্যের সম্পর্ক)—যাকে বলতে পারি আন্তঃপ্রাদেশিক বা আন্তঃরাজ্যিক প্রশ্ন। নানা কারণে এখানে আমরা শুধু ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাঙলার দিক থেকেই প্রশ্ন দুটির আলোচনা করছি। এ-আলোচনা হয়তো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীরাও সাধারণভাবে নিজেদের সমস্যা সমাধানে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তা সর্বাংশে পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রযোজ্য কিনা, সে-বিচারের অধিকারী পাকিস্তানের জনসাধারণ।

বাঙলা ও 'রাষ্ট্রভাষা'

প্রথম প্রশ্ন পশ্চিম বাঙলা ও ভারতরাষ্ট্রের প্রশ্ন। অথবা প্রশ্নটা যাকে সচরাচর বলা হয় 'রাষ্ট্রভাষা'—তার সঙ্গে বাঙলা ভাষার সম্পর্কের কথা।

'হিন্দী' ও 'রাষ্ট্রভাষা'

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, পশ্চিম বাঙলায় যথার্থ হিন্দীভাষী যে খুব বেশি তা নয়—পাঁচ লক্ষও নয়। এমনকি বিহার প্রদেশ থেকে পশ্চিম বাঙলায় আগত মানুষকে হিন্দীভাষী বলে গণ্য করলেও হিন্দীভাষীর মোট সংখ্যা মাত্র ২০ লক্ষে দাঁড়ায়। অবশ্য 'টুটি-ফুটি হিন্দী' বা 'বাজারীয়া হিন্দী'ই হল এই প্রবাসী ও বাঙলা-বাসী হিন্দুস্তানীদের অধিকাংশের ভাষা—সাহিত্যের হিন্দীও নয়, সাহিত্যের উর্দুও নয়, এমনকি 'খড়ী বোলি' বা 'হিন্দুস্তানীও' নয়।

এই 'বাজারীয়া হিন্দী'কে আশ্রয় করেই কিন্তু বাঙলাদেশে হিন্দী 'রাষ্ট্রভাষা' রূপে দাঁড়াতে চায়। কোন্ হিন্দী 'রাষ্ট্রভাষা'? হিন্দী-উর্দু, না, বাজারীয়া হিন্দী? এটা তাই একটা সমস্যা।

'হিন্দী', 'হিন্দী' বলে আমরা যে চিৎকার শুনি তার মধ্যে কতটা বিভ্রান্তি জড়িয়ে থাকে, তা একটু বিবেচনা করা যাক। উত্তর-প্রদেশই প্রধানত এই ভাষার প্রাণক্ষেত্র। কিন্তু উত্তর প্রদেশে উপভাষাগুলি ছাপিয়ে একটি সর্বগ্রাহ্য ভাষার রূপ এখনো স্থির হয়নি। তবে স্থির হয়ে যাচ্ছে, তা বলা যায়। 'ব্রজভাষা' (পশ্চিমী হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত) ও আওধি (পূর্বী হিন্দীর প্রধানরূপ)—এই দুইটি ছিল পূর্বতন সাহিত্য-গ্রাহ্য প্রধান উপভাষা। কিন্তু এখন হিন্দীর যে দুটি সাহিত্যিক রূপ দাঁড়িয়েছে তার সাহিত্যিক নাম হিন্দী ও উর্দু। এদের বনিয়াদ ভাষার যেই চলিত-মৌখিক-রূপ তাকে বলতে পারি 'হিন্দুস্থানী' বা 'হিন্দুস্তানী', পূর্বতন নাম 'খড়ী বোলি'—দণ্ডায়মান ভাষা। (এই মৌখিক রূপ উত্তর প্রদেশের 'পশ্চিমী হিন্দী'র উপর প্রতিষ্ঠিত, লিখিত হিন্দীর তুলনায় তাতে প্রচলিত আরবী-ফারসি শব্দ অধিক, সেরূপ ফারসি শব্দ 'খড়ী বোলি'তেও গ্রাহ্য।) এই হিন্দুস্থানী এলেকার বাইরে রাজস্থান থেকে শুরু করে বিহার পর্যন্ত যে এলাকা লিখিত হিন্দী ভাষা শিখে 'বৃহত্তর হিন্দীস্থান' হতে সচেষ্ট, তারা মুখে 'খড়ী বোলি' বা 'হিন্দুস্তানী' বলে না। তারা অনেকেই 'হিন্দুস্তানী', লিখিত 'হিন্দী' ও আঞ্চলিক ভাষা (রাজস্থানী, ভোজপুরী প্রভৃতি) মিশিয়ে একটা 'মিশাল হিন্দুস্তানী' বলে। এই হল হিন্দীর দ্বিতীয় (বৃহৎ) রূপ। আবার তারও বাইরে উত্তর ভারতের সর্বত্র শহরে-বাজারে-শ্রমিক-এলাকায় (কলকাতা, বোম্বাইতে) আরও একটা 'বাজারীয়া হিন্দীভাষা' চলে—তা'ই হিন্দীর তৃতীয় ও ব্যাপ্ত রূপ—হিন্দী বলতে গোলেমালে এই তিনটি কথিত রূপ বোঝায়—শুধু লিখিত হিন্দী নয়।

লিখিত হিন্দীর রূপও দ্বিবিধ। নাগরী অক্ষরে লিখিত সাহিত্যিক হিন্দী আরবী-ফারসি শব্দ যথাসাধ্য বাদ দিয়ে বেশি করে সংস্কৃত শব্দ ইদানীং গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে গান্ধীজী ও ওয়ার্ধাপন্থীরা অতটা সংস্কৃতগন্ধী হিন্দী চান না। তাঁরা চান চলিত-মৌখিক 'হিন্দুস্তানী'র কাছাকাছি একরূপ হিন্দী; নাগরী বা ফারসি লিপিতে লেখা 'হিন্দুস্তানী'ই ছিল তাঁদের কাম্য 'রাষ্ট্রভাষা'। অন্যদিকে ট্যাণ্ডনজী ও হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন চান বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত শব্দবহুল 'হিন্দী'। (কার্যত এখন এই হিন্দীই তথাকথিত 'রাষ্ট্রভাষা'। লেঃ, ১৯৫৬)। এই 'হিন্দী' অবশ্য বাঙালীর পক্ষে সহজবোধ্য, কিন্তু তা হিন্দুস্তানের হিন্দুস্তানী-ভাষী সাধারণ মানুষেরই নিকট দুর্বোধ্য—অন্য রাজ্যের কথা না বললেও চলে। অবশ্য দিল্লী-অঞ্চলের 'খড়ী বোলি'র বুনিয়াদের উপর আর একটি আরবী-ফারসি অক্ষরে লেখা সাহিত্যিক রূপও বহুপূর্বেই দেখা দেয়—১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত তারই নাম ছিল 'হিন্দী', 'হিন্দ্‌বী'। পরে তারই নাম হয় 'জবান-এ-উর্দু'। তাতে আরবী-ফারসি শব্দের বাহুল্য গত একশ বছরে এত বেড়েছে যে, তা ফারসি না-জানা হিন্দুস্তানীদের নিকটেও দুর্বোধ্য। এখন উর্দু ও হিন্দীতে তাই এত তফাং। উর্দুর রাজনৈতিক দাপট আজ উত্তর প্রদেশে নেই; কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা এখনো সুদৃঢ়। সাধারণত, দিল্লীবাসীরা, অধিকাংশ পাঞ্জাবী এবং বাঙলা-ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের শহুরে মুসলমানগণ এই উর্দু বলেন। উর্দু নিজাম রাজ্যের মাত্র শতকরা ১১·৬ জন (১৯৫১) লোকের ভাষা হলেও এই উর্দুই ছিল সে-রাজ্যের রাজ্যভাষা, এবং এখন সেই সুযোগ গ্রহণ করে হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দী (নাগরী অক্ষরে লেখা, সংস্কৃতগন্ধী) উর্দুর রাজাসন দখল করছে—যদিও এরূপ হিন্দী হায়দরাবাদে সেই ১০।১২ জন উর্দুভাষীও জানে না,—জানে মাত্র শতকরা ·৭ জন লোক, বাকি তেলেগু-মরাঠী-কন্নড়ভাষীরাও তা বোঝে না। এ-কথা

তথাপি সত্য যে, সাহিত্যের ভাষা হিন্দী (সংস্কৃতগন্ধী) ও উর্দু (আরবী-ফারসী-মণ্ডিত) ভাষাতত্ত্বের বিচারে মূলত এক ভাষা। তাই মূলের 'হিন্দুস্তানী' ভাষা মীরাট আগ্রা অঞ্চল (পশ্চিমঃ-উ-প্রঃ) থেকে ক্রমশ সমস্ত উত্তর প্রদেশের জনসাধারণের কথিত ভাষায় পরিণত হতে পারে। তা হলেও উত্তর ভারতের মানুষ এখনো তাদের ভাষার মৌখিক ও লিখিত বহু রূপের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। যথা—কথ্যভাষা হিন্দুস্তানী, মিশাল হিন্দুস্তানী ও 'বাজারীয়া হিন্দী' এবং লিখিত ভাষা হিন্দী ও উর্দু। 'বাজারীয়া হিন্দুস্তানী' ও 'মিশাল হিন্দুস্তানী'কে বাদ দিলেও হিন্দীর অন্তত তিনটি রূপ এখনো সুস্পষ্ট—হিন্দী—>হিন্দুস্তানী—<উর্দু (১৯১১ ও ১৯৩১এর সেন্সস রিপোর্টে এ বিষয়ে যে আলোচনা আছে, তা দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে আমরা তবে কোন্‌টি বুঝব? বলব কোন্‌টি? লিখব কোন্‌টি?

অথচ, এ-ভাষা এই তিন আকারের কোনো আকারেই উত্তর প্রদেশে, দিল্লী এলাকায়, মধ্যপ্রদেশের একটি অঞ্চলের বাইরে, যাকে আমরা 'বৃহৎ হিন্দী-স্থান' বলি, প্রচলিত নয়। যে 'হিন্দী' আসলে উঃ-প্রঃ ছাড়া উত্তর ভারতের বহু লোকে বোঝে, বলে, 'রাষ্ট্রভাষা' হবার দাবি করে তা 'হিন্দুস্তানী'ও নয়, হিন্দীও নয় (উর্দু তো নয়ই), সে হচ্ছে 'বাজারীয়া হিন্দী'—যার ব্যাকরণ হিন্দুস্তানীর ব্যাকরণ থেকে অনেক সরল, যার শব্দ-সম্পদ হিন্দুস্তানীর কাছাকাছি হলেও উর্দুর থেকে স্বতন্ত্র, হিন্দীর থেকেও স্বতন্ত্র। কোনো গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রভাষা হতে হলে বেশি লোকে বোঝে, এই গুণ একটি ভাষার পক্ষে হবে প্রধান গুণ। কিন্তু এই দাবিতে যদি কোনো ভাষাকে ভারতরাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রভাষা' করতে হয়, তাহলে সে-ভাষা 'হিন্দী'ও নয়, 'হিন্দুস্তানী'ও নয়, উর্দুও নয়—তা হবে 'বাজারীয়া হিন্দী'—এখনো যা হাটেবাজারে, স্টেশনে, তীর্থে উত্তর

ভারতে চলে (দক্ষিণ ভারতে সে-তুলনায় প্রায় চলে না বলা উচিত) ; যা সাহিত্যে লেখা হয় না, উচ্চ সভাসমিতিতে বলাও হয় না, যার ব্যাকরণ হুবহু হিন্দী বা উর্দুর ব্যাকরণ নয়। এ-ভাষা তাই এখনো তৈরি হয়নি, কিন্তু হয়তো বদলে বদলে তৈরি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য (মার্কেট) যত বাড়বে জনসাধারণ তা তত ব্যবহার করবে এবং জনসাধারণ তত সচেতন হবে। কারণ, এটিই জনসাধারণের ভাষা, বিশেষ করে তা ভাষা শ্রমিক এলাকার, শ্রমিক-শ্রেণীর। বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহ মনে রেখে 'হিন্দী'—'হিন্দুস্তানী'—উর্দু—'বাজারীয়া হিন্দী'র বিচার এখনো করা হয়নি। 'হিন্দী'—এই অতি-প্রচলিত কথাটার মধ্যে কতখানি বিভ্রান্তি লুক্কায়িত আছে, আমরা এখানে তাই নির্দেশ করেছি মাত্র।

'রাষ্ট্রভাষা'র অর্থ

এইরূপ বিভ্রান্তিকর 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটিও। 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে কী বুঝব ? সম্ভবত 'রাষ্ট্রকার্যের ভাষা' বা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। সরকারী কাজ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে বা সওদাগরী অফিসের হিসাবপত্র এ-ভাষায় রাখতে হবে, এমন কথা নেই। কিন্তু এই 'রাষ্ট্রকার্যের ভাষা'রই বা অর্থ কী ? (ক) যে-ভাষা ভারতরাষ্ট্রে সর্বত্র প্রচলিত না হোক, সকল রাজ্যে শাসন-বিভাগে গ্রাহ্য ? না, তা নয়। এ-বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীও সকলে একমত—প্রত্যেক রাজ্য তার রাজ্যের সুপ্রচলিত ভাষা শাসনকার্যে প্রয়োগ করতে পারবে। (খ) যে-ভাষা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কাজকর্মে গ্রাহ্য। ১৪টি প্রধান ভাষার মধ্যে একটিকে সরকার এই মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু অপর ১৩টিকে এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাংশে অগ্রাহ্য করা হয়নি, তা স্মরণীয়। (গ) দূত বা প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোচনায় যে-ভাষা প্রয়োগ করবেন। এ-ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রভাষা' অবশ্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে, শাসকবর্গের তা অভিমত। (ঘ) যে-ভাষা

ভারতের নানা রাজ্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় প্রয়োগ করবে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যার সাহায্যে সংযোগ রাখবে। পরিষ্কার করে না বললেও মনে হয়, এ-সব কাজে 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রচলন আবশ্যিক না হলেও অবশ্যম্ভাবী বলে শাসকবর্গ মনে করেন।

এই শেষ দুই (গ) ও (ঘ) ক্ষেত্র নিয়েই প্রশ্ন—ইংরেজির স্থলে কী চলবে, কোন্ রূপের হিন্দী চলবে, তা এখনো কোনো বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন শাসক বলেননি। তার কারণ, একটা অবাস্তব কল্পনাই এই সব প্রশ্নের মূল। তা এই : ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী পথে এক নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল। এই এক নিগড়ে বাঁধাটাই তাদের সৃষ্ট ঐক্য। কিন্তু আমরাও বলি—দ্বিখণ্ডিত ভারতরাষ্ট্রকে (বা পাকিস্তান-রাষ্ট্রকে) এক নিগড়ে বেঁধে রাখব। তাই আমরা ভাবি ইংরেজির জায়গায় একটা ভারতীয় (পাকিস্তানে পাকিস্তানী) ভাষা চাপিয়ে দিলেই ভাষার 'ঐক্য' সুস্থির হল। কায়দাটা সাম্রাজ্যবাদী কায়দা। গণতান্ত্রিক পথে সকল ভাষার বিকাশে 'ঐক্য' গড়ার কষ্ট স্বীকার কে করে ?

এই প্রলোভনের বশেই, একদিকে ভারতরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী ও অন্যদিকে তার মাড়োয়ারী-গুজরাতী ধনিক-বণিকগোষ্ঠীর সাহায্যে 'হিন্দী' নামক একটি নাগরী অক্ষরে লেখা ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' বলে সমস্ত দেশের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টার ফলে দক্ষিণে দেখা দিয়েছে হিন্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উত্তর ভারতেও দেখা দিয়েছে হিন্দীর প্রতি সন্দেহ।

'এক-ভাষা'র প্রশ্ন

এ-কথা বলা বাহুল্য, ভারতরাষ্ট্রে একটি ভাষা সকলের সহজ-বোধ্য রূপে গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। এ-কথাও সত্য 'হিন্দুস্তানী'র কোনো একটি রূপই সেইরূপে বিকাশলাভ করতে পারে। বাঙলা, তেলেগু প্রভৃতি অন্য প্রধান ভাষার তদনুরূপ সম্ভাবনা বেশি

নেই। বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় ভারত-রাষ্ট্রে বাঙলা ভাষার সে সুযোগ আদৌ নাই, পাকিস্তানেও তা দুর্লভ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে উপরের কথাগুলিও স্মরণীয়—জোর করে 'রাষ্ট্রভাষা' চাপাতে গেলে ভারতের ঐক্য বিনষ্ট হবে, যেমন তা হতে যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে। হিন্দীর কোনো রূপ এখনো সুস্থির হয়নি। হিন্দীর যে রূপ তার সাহিত্যে চলে তা নয়, বরং 'বাজারীয়া হিন্দী'ই উত্তর ভারতে বহুল গ্রাহ্য। 'রাষ্ট্র' যদি গণতন্ত্র হয়, 'রাষ্ট্র-ভাষা' যদি জনসাধারণের হয়, তাহলে 'রাষ্ট্রভাষা' কেতাবী-ভাষা হলে চলবে না, হতে হবে সাধারণের ভাষা। শাসক-ধনিকের চাপে কোনো ভাষাকে চালানো অত্যাচার। ভাষার ক্ষেত্রেও হয়তো শ্রমিক-শ্রেণীই কালক্রমে হবে সেই সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষার স্রষ্টা।

কার্যত, ভারতের শ্রমিক-শ্রেণী এখনি এই 'বাজারীয়া হিন্দী' ভাষা গ্রহণ করেছে। কলকাতা থেকে বোম্বাই-আহ্‌মদাবাদ পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক-এলাকায়, ট্রেড ইউনিয়নের সভায় আমরা এ-ভাষা বলছি। সাধারণ কংগ্রেসী সভায়ও এই ভাষাই বলা হত, যতক্ষণ কংগ্রেসে জনতার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়নি। এখন অবশ্য কংগ্রেস উচ্চবর্গের পার্টি, তাই তা সাহিত্যিক হিন্দী বা 'খড়ী বোলি'রই আসর। 'বাজারীয়া হিন্দী' শুধু জার্‌গন বা জগাখিচুড়ি থাকবে, না, ক্রমশ তা পরিপুষ্ট হবে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব নয়। এখনো তা একটা অনিশ্চিত জার্‌গন মাত্র। তবে দুটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখলে এর ভবিষ্যৎ বিস্তার অপ্রতিরোধ্য হবে। প্রথমত, এ-ভাষা তার বর্তমান পপুলার বা জনসম্মত প্রকৃতি যদি বজায় য়াখে। মোটের উপর, 'হিন্দুস্তানী'ভাষা থেকেই এই 'বাজারীয়া হিন্দী' উদ্ভূত। জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনে 'হিন্দুস্তানী'র জটিল ব্যাকরণকে সরল করেছে, তার নিত্য ব্যবহার্য শব্দ-সম্পদকে গ্রহণ করেছে এবং হিন্দ্‌-আর্য ভাষার বাক্যবিন্যাসকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রয়োজন

মতো তারপরে এই 'হিন্দুস্তানী'র সংগে যোগ করেছে ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষার (বাঙলার, মরাঠীর) শব্দ। এই জনসম্মত রূপ বজায় রাখলে এই ভাষা দক্ষিণেও গ্রাহ্য হতে পারে। লিখিত ভাষায় পরিণত হতে হলে যথানিয়মে এ-ভাষা নিশ্চয়ই সংযত ও পরিপুষ্ট হবে—অর্থাৎ ব্যাকরণের সরল রূপ সুনির্ধারিত করবে ও নতুন শব্দ গ্রহণ করবে। এই নতুন শব্দ গ্রহণকালে তার লক্ষ্য হবে যে-শব্দ সর্বভারতে গ্রাহ্য হবে বা হতে পারে এমন শব্দ বেশি গ্রহণ করা, যেমন—'ডাকঘর', 'প্রেষ্ঠগৃহ' নয়। বলা বাহুল্য, উচ্চভাব-প্রকাশক অনেক শব্দ ক্রমশ আসবে, কিন্তু তা আসবে স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃত শব্দের ভাণ্ডার থেকে বেশি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জন্যও তেমনি আন্তর্জাতিক শব্দসমূহ গ্রাহ্য হবে। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি হল কঠিনতর সমস্যা। তা এই—'হিন্দুস্তানী'র মূল ব্যাকরণ-গত বুনিয়াদ একেবারে ছাড়তে গেলেও 'বাজারীয়া হিন্দী'র চলবে না। অর্থাৎ, 'বাজারীয়া হিন্দী'র নামে একটা 'এস্‌পারেণ্টো'র মতো আজগুবি ভাষা তৈরি করলে তা ভাষা হবে না, হবে শূন্য-লতা।

এক-লিপির প্রশ্ন

স্বভাবতই এই এক-ভাষার প্রয়োজন যতই থাক তা জোর করে রাতারাতি সমাধান করা যাবে না। এবং নিশ্চয়ই হিন্দীভাষা (উর্দু ভাষাও) বরাবরই সাহিত্যে প্রচলিত থাকবে। বরং এক-ভাষা প্রচলনে আপাতত কতকটা সহায়তা হয় আমরা যদি ভারতীয় ভাষাগুলিতে এক-লিপি প্রচলন করতে পারি। তাহলে বাঙালী, মরাঠী, তেলেগু, তামিল, পাঞ্জাবী প্রভৃতি জাতিরা পরস্পরের ভাষা অধিকতর সংখ্যায় শিখতে পারবে। তাতে এসব বিভিন্ন ভাষার নৈকট্য ধীরে ধীরে সাধিত হবে। লিপির সমস্যা মূল সমস্যা নয়। তথাপি, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এদিকে (ক) বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

বলবে রোমক-লিপিকে প্রয়োজনানুরূপ চিহ্নিত করে ভারতের সর্বভাষার লিপি বলে প্রথম দিকে প্রচলিত করা উচিত ; (খ) ভারতীয় আত্মাভিমান তাতে ক্ষুণ্ণ হলে অবশ্য নাগরী লিপিকে (যথাসম্ভব সরল করে) সে-কাজে প্রয়োগ করা যায়—যদি দক্ষিণের দ্রাবিড়ভাষী বন্ধুরা তাতে স্বীকৃত হন। (গ) তা না হলে অবশ্য যে-ভাষার যে-লিপি তাতেই তা এখনকার মতো লিখিত হবে। তবে নতুন আঞ্চলিক ভাষার নতুন লিপি উদ্ভাবনা করতে হলে (যেমন, ভবিষ্যতে ঝাড়খণ্ডে হতে পারে, আসামের কোথাও কোথাও হতে পারে) রোমক-লিপিকেই গ্রহণ করা কর্তব্য। (বলা প্রয়োজন, ভারতরাষ্ট্রে নাগরী ও রোমক-লিপিতে উর্দু লেখাই সমীচীন)। কিন্তু প্রধান কথা—জোর করে কোনো লিপিকে কারো ঘাড়ে চাপানো চলবে না।

ভাদ্র, ১৩৬০ বাং

লেখা ও লিপি

ভাষা আর লিপি যে এক নয়, তা আমরা জানি—যদিও সাধারণতঃ আমরা তা সব সময়ে স্মরণ রাখি না। একই হিন্দুস্থানী ভাষা নাগরী লিপিতে লেখা চলে, ফারসি-আরবীয় লিপিতেও লেখা চলে। শুনে আশ্চর্য হবার কারণ নেই, বাঙলাও শিলেট অঞ্চলে এক সময়ে কিছু কিছু লিখিত হয়েছিল নাগরীতে, চটগ্রাম অঞ্চলে আরবী ফারসি লিপিতে (উর্দূর মত); অবশ্য তার পরিমাণ এত সামান্য যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মোটের উপর ভাষা মানুষের সমাজের এক আদিমতম অবলম্বন—অবশ্য সে সব আদিম ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। লিপি জন্মেছে সে তুলনায় এই সেদিন, হাজার তিন বছর পূর্বে—মুখের কথাকে যখন স্মৃতিতে গেঁথে রাখবার প্রয়োজন সমাজে বেড়ে গেল তখন। লিপির গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। এই লিখন পদ্ধতির জন্মের সঙ্গেই ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল শেষ হয়, ইতিহাস আরম্ভ হয়।

ছবি থেকে বর্ণমালা

লিপির জন্মকথাও কম কৌতূহলপ্রদ নয়। সে কৌতূহল পূর্ণ করতে হলে তা পূর্ণ করা যায় লিপিতত্ত্বের কোনো গ্রন্থ থেকে (সাধারণভাবে এ, সি, মুরহাউস রচিত ইংরেজি পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট গ্রন্থ-মালার 'রাইটিং এণ্ড এলফেবেট' নামক ৮৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সে কৌতূহল তৃপ্ত করতে পারে)। বিষয়বস্তু চিত্রে লেখা হত হয়ত প্রথম; যেমন মিশরের পেলেট অব নারমের চিত্রে রাজা শত্রুকে হত্যা করছেন। ভারতে এরূপ চিত্রের অভাব নেই। এই চিত্র-ভাষা সরলীকৃত হয়ে দাঁড়াল চিত্রলিপিতে (পিক্‌টোগ্রামে), যেমন দুটি নির্দিষ্ট আঁক জুড়ে স্থির হল বোঝাবে 'মাছ'। অবশ্য এতে শুধু বস্তুই প্রকাশ করা চলে, ঘটনার ইঙ্গিতও কিছু দেওয়া যায়। কিন্তু

মনের ধারণা লেখা যায় কি করে? এই বস্তু-নির্ধারক চিত্রলিপি থেকেই এল ভাব-ধারক লিপি বা ধারণা-লিপি (আইডিওগ্রাম)। যেমন, মেসোপোটামিয়ার সুমের-আক্কাদ জাতির (খ্রীঃ পূ ১৯০০ শতকের পূর্বে) ফলকাকৃতি (ক্যুনিফর্ম) রেখায় এরূপ ভাব-ধারক লিপিতে একটা চৌকো (বা বৃত্ত) আঁকলে তার দ্বারা বুঝাত 'সূর্য'। তারপর সেই চৌকোর (বা বৃত্তের) মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র ছোট রেখা-কোণ (এ্যাঙ্গেল) বসিয়ে বোঝাত তিন দশ বা ত্রিশ। এভাবে সূর্যের মধ্যে তিন-দশে প্রকাশ করত তারা মাসের ধারণা।

এধরনের অজস্র ফলকলিপি সুমের-আক্কাদরা রেখে গিয়েছে,—এটাও চিত্রলিপিরই যুগ, তবে তার দ্বিতীয় পর্ব। চীনা হরফ এই চিত্রলিপির পরিণতি। প্রাচীন চীনারা ফলকাকৃতি রেখা ব্যবহার করত না, কিন্তু ধারণা-লিপিতে তারাই ওস্তাদ। প্রাচীনকালে দ্বিভঙ্গ এক ধরণের বাংলা ত্ব'এর মত (২) এক রেখায় তারা বুঝাত 'মা', আর এক রেখার মোড় ফিরানো দ'তে—'পুত্র'। আর এই দুই দ্বিভঙ্গ রেখা সংযুক্ত করে (মায়ের কোলে ছেলে বসিয়ে) বোঝাত—কিন্তু মাতাপুত্র নয়, 'সুখ'—একটা ভাব। দুটি চারিটি নির্দিষ্ট ধরনের রেখায় চীনারা বুঝাত কুকুর। চৌকো একটা বাক্স ('মুখ') আর তার উপরে চারটি সমান্তরাল ছোট বড় টান ('হাওয়া') দিয়ে একত্রে বোঝাত ('মুখের হাওয়া') কথা। কিন্তু দুদিকে দুটি কুকুর-বাচক রেখা আর মাঝখানে ওরকম 'কথার' ছবি বসালে চীনে ভাষায় তখন বুঝোবে মামলা, কুকুরের মত যেখানে দু'পক্ষ বসে ঘেউ ঘেউ করছে! গল্প শুনেছি—একটা বৃত্তের নীচে দুটান জুড়ে নাকি চীনারা বোঝাত মেয়ে। আর ওরকম দুটি স্ত্রী-বাচক রেখা-চিত্র একত্র করলে—দুটি মেয়ে একত্র হলে—কার্যত যা হয় তাই নাকি বোঝাত চীনে ভাষায়—অর্থাৎ 'ঝগড়া'। সত্য মিথ্যা জানি না, জাতিটার তা হলে রসবোধ আছে।

এই ধারণা-লিপির পরে আসে ধ্বন্যাত্মক (ফোনেটিক) লিপি —অর্থাৎ সে সব চিহ্ন বস্তু বা ধারণার 'ছবি' নয়, বোঝাত সেই বস্তু-নির্দেশক শ্রুত ধ্বনিকে। পটল-চেরা চোখের মত করে দুটি বৃত্তাংশের রেখা একত্র জুড়ে মিশরে বুঝাত 'মুখ' (মুখবিবর)। 'মুখ' কথাটির মিশরে উচ্চারণ ছিল 'র্'। অতএব ও-রেখাদ্বয় বুঝাল ক্রমে 'র্' ধ্বনিকে। একজোড়া কানের মত ধারণা-লিপিতে বোঝাত 'শ্রবণ', তার উচ্চারণ ছিল 'শাম'। অতএব কানজোড়া হল 'শাম' ধ্বনির চিহ্ন। এইরূপ ধ্বন্যাত্মক লেখার প্রারম্ভ হল। চোখে দেখা বস্তু বা মনের চিত্র-কল্প আর নয়, এখন লিপি হল শ্রুত-ধ্বনির চিহ্ন বা সঙ্কেত। চলল এদিকে লিপির পরিণতি।

ধ্বনি ত একস্বরবাহিত (মনোসিলেবিক) শব্দ মাত্র নয়, (এক একটি সিলেবল বা স্বরবাহিত ধ্বনিকে আমাদের ভাষায় বলা চলে 'অক্ষর'। 'অক্ষর' অর্থ হরফ নয়। যা শব্দের ইউনিট্, বা অবিভাজ্য ধ্বনিরূপ, তা'ই অক্ষর)। এক বা একাধিক এই রকম সিলেবল্ বা অক্ষর দিয়ে প্রায় ভাষাতে হয় এক একটা শব্দ বা ওয়ার্ড। অতএব ধ্বন্যাত্মক লিপি ক্রমশ এই সিলেবল বা অক্ষর সূচক চিহ্ন হল (সিলেবেটিক)। কোনো শব্দে দুই সিলেবল্ থাকলে তার প্রথমটিকে নিয়ে একটা চিহ্ন দিয়েই কাজ সারত কোনো কোনো জাতি। যেমন 'জাতি' শব্দটীর চিহ্ন যেন 'জা'। আবার কোনো কোনো জাতি দুই সিলেবলের জন্য নির্দিষ্ট করলে দুই স্বতন্ত্র চিহ্ন—'জাতি' লিখতে 'জা'-এর জন্য এক চিহ্ন, 'তি'র জন্য দ্বিতীয় এক চিহ্ন। এর পরে সিলেবল থেকে ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনিকে পার্থক্য করা আরম্ভ হল। যেমন, জাতিতে দেখা গেল আছে ব্যঞ্জনবর্ণ জ্ + স্বর আ, এবং ব্যঞ্জন ত্ + স্বর ই। আরম্ভ হল অক্ষরের বর্ণ-বিশ্লেষণ। প্রত্যেক স্বর ও প্রত্যেক ব্যঞ্জনের জন্য তখন লাভ করা গেল এক একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন। যেমন জ্-এর জন্য, আ-এর জন্য, ত্-এর জন্য,

ই-এর জন্য। লিপি-বিদ্যা এল তার শেষ স্তরে—এল্‌ফেবেটের পর্যায়ে—বর্ণমালার আবিষ্কারে।

চীনা হরফ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক প্রধান লিপিই এখন 'এলফেবেটিক' জাতের। যেমন রোমকলিপি (যাতে ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা, বর্তমানে তুর্ক, এবং আমাদের দেশেরও খাশিয়া, লুসাই, কতকাংশে সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষা লেখা হয়), গথিক-লিপি (জার্মান ভাষা লেখা হয়), রুশীলিপি (গ্রীকো-বাইজেনটাইন্ লিপির পরিণতি। রুশ, উক্রেনীয় ও সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অনেক নতুন ভাষা এ লিপিতে লেখা হয়) ইত্যাদি। ভারতীয় লিপিসমূহ (বাঙলা, নাগরী প্রভৃতি) এবং আরবী লিপি (যা ফারসি, উর্দুতে গৃহীত হয়েছে), তাও এ জাতের। তবে তাতে অত শৃঙ্খলা রক্ষা হয়নি।

লিপির বিচার

ভারতীয় লিপিসমূহের বর্ণমালার ক্রম ('অ, আ, ক, খ') ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে পরম গৌরবের আবিষ্কার। কিন্তু লিপি হিসাবে লিখতে গিয়ে আমরা কোনো শৃঙ্খলা মানি নি। ভারতে একলিপি প্রবর্তন করতে আমরা যখন আজ যত্ন করছি তখন বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের বাঙলা, নাগরী প্রভৃতি সব লিপিই লেখা ও মুদ্রণের দিক থেকে রোমক লিপির মত অত সুশৃঙ্খল বা বৈজ্ঞানিক নয়। আমাদের লিপি এলফেবেটিক জাতের হলেও, জাতের নিয়ম ঠিক মত রক্ষা করে না।

কেন, তা বলতে পারি। প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির জন্য এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণলিপি পাওয়া গেলে—আর সে লিপি ধ্বনি অনুযায়ী ক্রম রক্ষা করলে—সেই লিপিই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মুখে যখন বলছি 'মা' তখন বলব ম্+আ, (m+a') কিন্তু লিখি 'ম+া'। আবার যখন বলি 'কে' তখন উচ্চারণ করি ক্+এ (k+e'); কিন্তু লিখি

'কে' (অর্থাৎ ে+ক্ = এ+ক্), বাঙলা লেখার এ এক সৃষ্টিছাড়া ধরন। তাছাড়া আছে আরও সৃষ্টিছাড়া সংযুক্ত ব্যঞ্জন।

বাঙলা, নাগরী প্রভৃতি ভারতীয় লিপিতে এই বিশৃঙ্খলা এত বেশি যে আমরা তা মনেও রাখি না। অবশ্য বাংলার থেকে নাগরীতে তা কম। বাঙলায় 'ক্ক' বা 'স্ক' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত তালগোল পাকিয়ে যে কি আমরা করি তার ঠিকানা নেই। বলা বাহুল্য, ইংরেজিতেও আমরা উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক ঠিক লিপি পাই না। রোমক লিপিতে স্বরবর্ণ অল্প বলে তাদের বিভ্রাট অনেক। 'পি ইউ টি' (put) হয় 'পুট্' এবং 'বি উ টি' (but) হয় 'বট্', এই নিয়মহীনতার জন্যে অন্তত একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের কথা শুনেছি তিনি আর ইংরেজি শিখলেন না। তিনি হয়তো আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষার উচ্চারণ ও লিখিত রূপের বৈষম্য দেখে মনে করতেন 'বাংলা ভাষা হচ্ছে দেবভাষার পতিত রূপ—তাই ওরূপ অনাচার।' কিন্তু ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা বলবেন, শব্দের লিখিত রূপ লিপি দ্বারা চিরকালের মত স্থির হয়ে থাকলেও শব্দের উচ্চারণ, মুখের ধ্বনি, চিরদিনই বদলায়; ভাষা বদলায় লিপিরও পূর্বে। তাই উচ্চারণ হয় একরূপ লেখায় থাকে অন্যরূপ।

আসল কথা, কোনো ভাষার সব ধ্বনি শুদ্ধরূপে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা তার লিপিতে প্রায় অসাধ্য। অন্তত ভাষা বদলে যাবে, লিপি তাকে এঁটে উঠতে পারবে না। ধ্বনি-বিজ্ঞান সে জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক ধ্বন্যাত্মক লিপিমালা উদ্ভাবন করেছে; দরকার মত তাতে নূতন আরও চিহ্ন যোগ করছে। কিন্তু সে লিপি হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের জন্য। সাধারণত কোনো ভাষার পক্ষে যা দ্রষ্টব্য তা হচ্ছে—তার ধ্বনিসমূহ যেন যথাসম্ভব যথার্থ ও সহজবোধ্য রূপে লিপিদ্বারা চিহ্নিত হয়। দ্বিতীয়ত, এক চিহ্নে বা হরফে একটি ধ্বনিই চিহ্নিত হবে। কিন্তু চিহ্নসংখ্যা অকারণে বাড়ালেও চিহ্নসমূহ শিক্ষা করা অসাধ্য হবে, আবার একেবারে

কমালেও ভাষার ধ্বনিগত রূপ যথার্থ ধরা পড়বে না। তাই দেখা দরকার, সেই চিহ্নমালা যেন লেখনের, একালে মুদ্রণের ও টাইপ-রাইটিং'-এর, পক্ষেও সহজ-গ্রাহ্য হয়। চতুর্থত, কাগজের অপচয় না করেও যেন এরূপ চিহ্ন চোখের তৃপ্তিসাধন করতে পারে।

এদিক থেকে রোমক লিপিই এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

চীনালিপির বৈশিষ্ট্য

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি চীনা ভাষার ও চীনা লিপির বৈশিষ্ট্য। আশ্চর্য এই যে, চীনা ভাষা একাক্ষর (মনোসিলেবিক) শব্দের ভাষা। চুং চাং প্রভৃতি এক-একটি অক্ষরের শব্দ নিয়ে বিচিত্র রূপে এই ভাষা বর্ধিত হয়েছে। এক শব্দেও তুই অক্ষর নেই! আরও আশ্চর্য্য এই যে, তার লিপিপদ্ধতি এখনো সেই ধারণা-লিপির (আইডিওগ্রাম) পদ্ধতি। অর্থাৎ চিত্র-লিপির সেই বিশিষ্ট স্তর ছাড়িয়ে ধ্বনিস্যূচক স্তরেও চীনালিপি উত্তীর্ণ হয় নি। হয়ত একাক্ষর ভাষা বলে সেই তাগিদও তেমন অনুভূত হয় নি। তাই, চীনাভাষার লিপিকে বর্ণমালা বা 'এলফেবেট' বলা হয় না, বলা হয় 'ক্যারেকটার' বা বর্ণ-চিত্র। আর প্রত্যেকটি বর্ণের নয়, প্রত্যেকটি শব্দের (সব শব্দই একাক্ষর) জন্য চীনাদের এক একটি চাই বিশিষ্ট ক্যারেকটার। যত শব্দ তত ক্যারেকটার। এ জন্যই চীনা ভাষায় টাইপরাইটার নেই। শর্টহ্যাণ্ডও হয় কিনা সন্দেহ। চীনা মুদ্রণ একটা অদ্ভুত কাণ্ড। তু-চার শ টাইপ নয়, হাজার কয় টাইপ; ছুটে ছুটে তা এনে 'কম্পোজ' করতে হয়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নাকি চলে শত তিনেক এরূপ শব্দ নিয়ে। শিক্ষিত মানুষ হাজারখানেক শব্দ জানে ও বর্ণচিত্র চেনে। সে তত পণ্ডিত যার যত বেশি বর্ণচিত্র পরিচিত ও শব্দ জানা। এই অদ্ভুত বর্ণচিত্র চীনারা এখনো পরিত্যাগ করেন নি। কারণ, চীনের অঞ্চলে অঞ্চলে উপভাষা স্বতন্ত্র। কিন্তু

একই চীনা অক্ষর পড়ে চীনজাতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ রীতিতে। একই বর্ণচিত্র পিকিং-এউচ্চারণ করবে 'চা-এ,' আর ক্যান্টনেব লোকে Tea'; কিন্তু সেই বর্ণচিত্র বা হরফটি চীনের সর্ব্বত্রই বোঝাবে সেই পানীয়--The cup that cheers but not inebriates. চীনের এই বর্ণচিত্রের মধ্য দিয়ে এভাবে তাদের জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হয়েছে বলেই জাতি এখনো এ পদ্ধতির পরিবর্তন ততটা চিন্তা করে না। এই অদ্ভুত লিপিপদ্ধতির জন্যই তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হোক বা অন্য যে নামই হোক্ তাকে নিজেদের ভাষায় লিপ্যন্তরিত করে না, অর্থানুযায়ী ভাষান্তরিত করে।

চীনা ভাষা ও চীনা লিপির পক্ষে যে কারণে পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়, আমাদের ভাষা ও লিপিতে সেই কারণে পরিবর্তন কাম্য। অর্থাৎ আমরা চাই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংহিত। চীনে উপভাষা সত্ত্বেও মোটের উপর এক ভাষা ও এক লিপি; আর আমাদের উপভাষা ছেড়ে দিলেও বহু ভাষা বহু লিপি। যদি আমাদের লিপি চীনের মত এক হত, তাহলেও এই বহুজাতির বহুভাষিক দেশের মানুষের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হত। আজকের দিনে আমরা বাঙালীরা তেলেগু ভাষা শিখবার কথা প্রায় ভাবতেই পারি না (তেলেগুরা কিন্তু অনেকে বাঙলা শিখে আমাদের বহু গ্রন্থ তেলেগুতে অনুবাদ করেছেন)। কারণ, তেলেগু কেন, ওড়িয়া হরফও আমাদের কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। অথচ তেলেগু দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা হলেও সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা—বাঙালীর পক্ষে তার শব্দসম্পদ দুর্বোধ্য নয়। একবার লিপির আড়াল ভাঙলে দেখতাম তা দুঃসাধ্যও নয়। এরূপ কারণেই উর্দু বা পঞ্জাবী (গুরুমুখী বা আরবী-ফারসি যে হরফেই পাঞ্জাবী লেখা হোক) ভাষা ও সাহিত্যও বাঙালীর নিকট দুর্গম। ভাষার বাধা দীর্ঘতর হয়েছে এই লিপির পার্থক্যে। ভাষার সঙ্গে লিপির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নয়, তা ঠিক। দেখেছি কিছু বাঙালাও এক সময়ে

শ্রীহট্টে লিখিত হয়েছে শিলেট নাগরীতে, চট্টগ্রামেও সামান্যাংশে বাঙালা লিখিত হয়েছে আরবী-ফরাসি লিপিতে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পরিচয়ের পক্ষে, ভারতের (ও পাকিস্তানের) এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের আদান-প্রদানের জন্য, লিপির এই প্রাচীর সেই ভাষার বাধাকে আরও দুস্তর করে তুলেছে। একই লিপিতে সমস্ত উত্তর ভারতের ভাষাসমূহ লেখা হলে বাঙলা, হিন্দী, গুজরাতী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষীরা যে পরস্পরের আরও কতকটা নিকটতর হতে পারেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কার্তিক, ১৩৬০ বাং

ভারতবর্ষে একলিপির প্রশ্ন

ভারতবর্ষ বহুজাতির ও বহুভাষার দেশ। এই বিরাট দেশের নবগঠিত রাষ্ট্রসংঘ দুটির সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য। ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঐক্য তাই স্থায়িভাবে গঠন করা সম্ভব একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—প্রত্যেক জাতির ও ভাষার আত্মবিকাশের পূর্ণতম অধিকার হবে তার ভিত্তি। এ-কথা স্বীকার করেও আমরা মানি—এই সব জাতিদের ও ভাষীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদানপ্রদাদের জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কোনো একটি ভাষা বহুল-পরিচিত ও বহুল-গ্রাহ্য ভাষা হিসাবে গড়ে ওঠা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য পাকিস্তানের জন্যও তাই কাম্য। সেদিকে মূল প্রয়োজন অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক-রীতিতে-খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সমাজ-জীবনের অবসান; কলকারখানা, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির ('মার্কেটের') পূর্ণতর প্রসার, এক কথায়, ভারত-রাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে দ্রুত শিল্প-বিপ্লব। ভাষা-সমস্যার সমাধানেও তাই শিল্প-বিপ্লবের উপযোগিতা বিস্মৃত হবার উপায় নেই। এই কথা বলে ভাষা-ক্ষেত্রের বাস্তব সমস্যা ও বাস্তব কর্তব্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেদিক থেকে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বা স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধেয় হচ্ছে—কোনো একটি ভাষা এইসব জাতিরা বা ভাষীরা নিজেদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় প্রচলিত করে নিতে পারেন কিনা। কি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কি পাকিস্তানে, কোনো বহুল-পরিচিত বহুল-গ্রাহ্য একভাষার ও একলিপির প্রসার তাই বাঞ্ছনীয়।

ভাষার দিক থেকে মনে হয়, হিন্দী নামের আড়ালে সে-ভাষার (হিন্দুস্তানী ভাষার) যে-সব রূপ প্রচলিত (যেমন লিখিত রূপ হিন্দী ও উর্দু; মৌখিক রূপ হিন্দুস্তানী ও বাজারীয়া হিন্দী), তারই কোনো-একটি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এ প্রয়োজন মেটাতে পারে।

কিন্তু লিপির দিক থেকে কি ভারতে তেমন একলিপির প্রচলন বাঞ্ছনীয়? কিংবা সম্ভব?

ভারতে প্রচলিত লিপিগোষ্ঠী

বর্তমানে ভারতের ভাষাসমূহ প্রধানত চার গোষ্ঠীর—আস্টি ক বা পূর্বী গোষ্ঠীর, ভোট-চীনা গোষ্ঠীর, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর, হিন্দ-আর্য গোষ্ঠীর। ভারতের লিপিসমূহ কিন্তু এ-সব কোন গোষ্ঠীর নয়। তা মূলত তিন গোষ্ঠীর, ব্রাহ্মী গোষ্ঠীর, আরবী-ফারসী গোষ্ঠীর এবং রোমক গোষ্ঠীর (রোমক লিপিতে ইংরেজী ভাষা লিখিত হয় বলে আমরা এই রোমক বা 'রোমান্' লিপিকে ভুল করে বলি 'ইংরেজি অক্ষর')।

আরবী-ফারসী লিপিতে প্রধানত লেখা হয় উর্দু ও সিন্ধী (পাক)। ভারতীয় ভাষা-সমুহে আরবী-ফরাসী লিপির প্রয়োগ বেশ কষ্টসাধ্য—আরবীতে স্বরবর্ণের শোচনীয় অভাব, ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ অনিশ্চিত, বিন্দুই ভরসা। আমরা জানি এই লিপিতে পাঠকালে কত দুর্দৈব ঘটে: পিতা 'আজমীঢ় গিয়েছেন', কি, 'আজ মরে গিয়েছেন'—কেউ পিতার অবস্থা না জানলে বুঝতে পারবেন না। আরবী-গোষ্ঠীর জন্যই এ-বর্ণমালা প্রশস্ত এবং আরবী শব্দেই তার প্রয়োগ সুসম্ভব। এই হরফের স্বপক্ষে বলবার একমাত্র এই যে, এই হরফে অল্প স্থানে যথেষ্ট শব্দ লেখা যায়। কিন্তু বহু প্রাচীন-লিপির সন্তান হলেও এ-লিপি তেমন সুশ্রী নয়। তা ছাড়া, এ-লিপিতে লেখা ভাষা যখন সহজ-পাঠ্য নয়, তাতে যখন পাঠকের বিভ্রান্তি বাড়ে বৈ কমে না, তখন এ-লিপি আরবী বা আরবী-জাতীয় কোনো ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রয়োগ বাধা স্বরূপ। শুনে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, উর্দুতেও এ-লিপির প্রয়োগ খুব সমীচীন নয়। কারণ আরবী-ফারসী-শব্দ বহু থাক্‌লেও উর্দুভাষা মূলত হিন্দুস্তানী,—ধ্বনিতে, রূপে উর্দু ভারতীয় ভাষা।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা রোমক লিপির সঙ্গে সুপরিচিত; তাই তাঁরা প্রথম থেকেই ভারতীয় ভাষাসমূহ রোমক লিপিতে লিখতে চেষ্টা

করেছেন। বিশেষ করে যে-সব ভাষায় মিশনারিদের উদ্যোগে বই লিখিত, মুদ্রিত ও প্রণীত হয়েছে সে-সব পশ্চাৎপদ জাতিদের ভাষা রোমক লিপিকেই আপন লিপিরূপে গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সাঁওতালী (বাংলা অক্ষরেও তা লেখা হত), ওরাওঁ প্রভৃতি ভাষা, এবং আসামের খাসী, লুসাই, গারো প্রভৃতি ভাষা আমাদের সুপরিচিত। তা ছাড়া আমরা মনে রাখতে পারি, মানোয়েল দ্য আস্‌সুম্পসাওঁ-র "কৃপায় শাস্ত্রের অর্থভেদ" (১৭৪৩-এ লিসবন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত) রোমান অক্ষরে লেখা বাঙলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। বাঙলা অক্ষরের অবশ্য তৎপূর্ববর্তী মুদ্রিত প্রতিলিপি আছে—খ্রীঃ ১৬৯২এর। কিন্তু বাঙলা হরফে প্রথম মুদ্রিত বই হালহেডকৃত বাঙলা ব্যাকরণ খ্রীঃ ১৭৭৮এ প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রণ করেন১৮০৪এ। এখনো গোয়ার কোঙ্কণী পর্তুগীজদের প্রভাবে রোমান অক্ষরে লেখা হয়। এ ছাড়া রোমান অক্ষরে নানা ভাষার বাইবেল আছে। ইংরেজ আমলে ভারত সরকার সাহেবদের এবং ফৌজের সিপাহীদের জন্য "ফৌজী হিন্দুস্তানী"-তে যে-বই ছাপাতেন তাও রোমক লিপিতেই লেখা হত। এই রোমক লিপিই সামান্য টান ও ফুটকি যোগ করে এখন পালি মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃত ভাষার মুদ্রণেও তার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংস্কৃতও এ-লিপিতে কিছু কিছু মুদ্রিত না হয় এমন নয়। যা'ই হোক, বিরাট ভারতবর্ষে রোমক লিপির আসল প্রভাব ইংরেজি ভাষার জন্য—নইলে ভারতীয় ভাষায় তার প্রচলন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভারতীয় ভাষাসমূহ সাধারণত লেখা হয় নিজ নিজ ভারতীয় লিপিতেই।

ভারতীয় লিপি ঃ ব্রাহ্মীর বংশধারা

ভারতীয় ভাষাসমূহ যে-কোনো ভারতীয় লিপিতে লেখাই স্বাভাবিক ও সমুচিত, এ-কথা নিশ্চয়ই মনে হবে। কারণ,

ভারতীয় ভাষার প্রকাশের প্রয়োজনেই ভারতীয় লিপির প্রবর্তন ও বিবর্তন। ভারতের প্রধান প্রধান আধুনিক ভাষাসমূহ প্রায় হাজার বছর ধরে বাঙলা, নাগরী, তেলেগু প্রভৃতি এক-একটা বিশিষ্ট রূপও লেখার জন্য বিশিষ্ট লিপি আয়ত্ত করেছে। এ-সব বিভিন্ন লিপি এতই বিভিন্ন যে, তা দেখে আমরা মনে করতে পারি কি যে মূলত তারা একই ভারতীয় প্রাচীন লিপির বংশধর ? এমন কি, যে-সব ভাষা এক গোষ্ঠীর নয় সে-সবও লিখিত হচ্ছে এক গোষ্ঠীর লিপিতে। যেমন, তামিল দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা, বাঙলা ও হিন্দী হিন্দ-আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা, মণিপুরী বা মেইতেই ভোটচীনাগোষ্ঠীর ভাষা। অথচ, এদের লিপি এক ভারতীয় গোষ্ঠীর। অর্থাৎ, তামিল লিপি, বাঙলা লিপি, নাগরী লিপি এবং মেইতেই-র জন্য ব্যবহৃত বাঙলা লিপি—একই ভারতীয় আদি লিপির বংশধর। সে-লিপি কী, কী করে এই বিভেদ ও বিবর্তন ঘটল ?

এ অবশ্য ভারতীয় লিপির জন্ম ও বিকাশের কথা, ঠিক বর্তমান লিপি-সমস্যার কথা নয় ? কিন্তু সংক্ষেপে হলেও এ-ইতিহাস জানা থাকলে আমরা অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারি। যেমন, বর্তমানে চলিত কোনো ভারতীয় লিপিকে প্রাচীনতম মনে করব না; 'নাগরী' লিপিকে বলব না সংস্কৃত ভাষাব লিপি; তামিল-তেলেগু প্রভৃতি লিপিকে মনে করব না পর; এমন কি, সিংহলী-বর্মী লিপিকেও চিনব আমাদের জ্ঞাতি বলে।

ভারতীয় লিপির উদ্ভব কোথায় ? এ কথার উত্তর আমরা জানি না। মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পায় যে-লিপি পাওয়া গিয়েছে বিশেষজ্ঞরা কেউ তা এখনো পড়ে উঠতে পারেন নি (তা বলে বাঙলাদেশেও এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা তা জলের মতো পড়ে যাচ্ছেন! অন্যেরা যাই বলুন, তাঁদের মনে সন্দেহের অবকাশ নেই!)। ভারতের যে প্রাচীন লিপি এ-পর্যন্ত পঠিত হয়েছে (জেমস্ প্রিনসেপ প্রথম তা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পাঠ করেন) তা অনেক

পরেকার; তা হচ্ছে অশোক-অনুশাসনের লিপি—অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ থেকে ২৩২-এর মধ্যে তা লিখিত। অশোকের অনুশাসন-সমূহ প্রধানত উৎকীর্ণ হচ্ছিল যে-লিপিতে তাকে বলে "প্রাচীন ব্রাহ্মী" লিপি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শাহ্‌বাজগড়ী ও মনসেরা অনুশাসন লিখিত অন্য লিপিতে,—"খরোষ্ঠী" হয়তো তা সেই প্রান্তের লিপি। ব্রাহ্মী লেখা চলে বাম থেকে দক্ষিণে, খরোষ্ঠী (অনেক সেমিটিক লিপির মতো) দক্ষিণ থেকে বামে। আর দক্ষিণ ভারতের মৈশুরের অন্তর্গত ম্নেব্‌রাগুডি (মাত্র ১৯২৯এ এটি আবিষ্কৃত) অনুশাসনের লেখার এক পংক্তি বাম থেকে দক্ষিণে শেষ হয়েছে, পরের পংক্তি দক্ষিণ থেকে বামে এসে শেষ হয়েছে, তৃতীয় পংক্তি আবার বাম থেকে চলেছে দক্ষিণে; এইরূপ বরাবর। (পণ্ডিতেরা কেউ কেউ অনুমান করেন—মোহেন-জো-দড়ো বা সিন্ধু-উপত্যকার লিপিও এইভাবেই চলত—গ্রীকরা যাকে বলেছে "বৌস্ত্রোফেদন" অর্থাৎ 'লাঙলটানা' রীতি, এ তা'ই। দ্রষ্টব্য: "অশোক-লিপি", অমূল্যচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৭)। খরোষ্ঠী লিপির উদ্ভব প্রাচীন সেমিটিক লিপির আরামাইক ধারা থেকে,—অনুমান হলেও এ-কথা প্রায় সকলেই মানেন। ব্রাহ্মী লিপি বাম থেকে দক্ষিণে গেলেও আসলে তা ফিনিসিয়ার (সেমিটিক) কোনো লিপিরই বংশধর,—এই অনুমানে কিন্তু মতভেদ আছে। জন্ম যে-ঘরেই হোক, অশোকের সময়ে ব্রাহ্মীলিপি যে ভারতীয় জনসমাজের নিকট পূর্বে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে পরিচিত লিপি হয়ে গিয়েছে, অশোকের উৎকীর্ণ অনুশাসনই তার প্রমাণ।

অশোকের ব্রাহ্মী হল "প্রাচীন ব্রাহ্মী"—ভারতীয় লিপির তা প্রথম রূপ। এরই বিবর্তনে জন্মেছে বর্তমান ভারতীয় ভাষাসমূহের অধিকাংশের লিপি। এই "প্রাচীন ব্রাহ্মী" মোটের উপর দু-শাখায় বিভক্ত হয়—উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভারতে "কুশান" ও "গুপ্ত ব্রাহ্মী"তে তা রূপ লাভ করল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের

সেই "গুপ্ত ব্রাহ্মী"র শাখায় তারপর জন্মে (১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'শারদা' লিপি,—কাশ্মিরী, গুরুমুখী তারই বংশধর ; (২) মধ্যদেশে, রাজস্থানে নাগরী,—যার বংশধর (দেব) নাগরী, গুজরাতী, কৈথী ; (৩) পূর্ব ভারতে 'কুটিলা',—যার বংশধর বাঙলা, মৈথিলী, আসামী, নেওয়ারী, ওড়িয়া প্রভৃতি লিপি।

নাগরী লিপির স্থান

এ-সব বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় লিপির মধ্যে নাগরীই সমধিক বিস্তারলাভ করেছে। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের তা বরাবরই ছিল নিজস্ব লিপি ; গুজরাতেও তা'ই, তবে গুজরাতী নাগরী লেখায় 'মাত্রা' দেওয়া হয় না। কিন্তু এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের বাইরে দক্ষিণ বিহারে (মৈথিল অঞ্চলেও মৈথিলী লিপির একচ্ছত্র প্রভাব নেই), পাঞ্জাবে (ভারত), এবং মহারাষ্ট্রে ও হিমালয় প্রদেশে, এবং নেপালে তা বিস্তারলাভ করেছে। এই লিপিই সংস্কৃত গ্রন্থাদি মুদ্রণে বেশি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন ভাষীরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা নিজ নিজ অঞ্চলের লিপিতেই লিখতেন, যেমন, বাঙলায় আমরা সংস্কৃত লিখতাম বঙ্গলিপিতে, ওড়িষ্যাতে ওড়িয়ায়, তেমনি উত্তর প্রদেশে (কাশী তার অন্তর্ভুক্ত) লেখা হত নাগরীতে। নাগরীর জন্মক্ষণ থেকেই একটা প্রতিষ্ঠা ছিল ; কারণ তখন (৮ম—১১শ শতক) উত্তর ভারত জুড়ে রাজপুত রাজাদের প্রতিষ্ঠা। সাধারণত শৌরসেনী অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ) ছিল তাঁদের রাজভাষা আর নাগরী তাঁদের নিজ লিপি। এই প্রভাব সত্ত্বেও সংস্কৃত লেখা হত আঞ্চলিক লিপিতে। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ভারতবিদ্যাবিশারদ ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা রোমক অক্ষরের সঙ্গে বিন্দু ও দাগ যোগ করে নিজেদের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তা প্রয়োগ করতেন। এখনো সেরূপ রোমক অক্ষরে সংস্কৃত লেখা সচল আছে, কিন্তু

ভারতে অন্তত নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থই সুপ্রচলিত। তার একটা প্রধান কারণ—আচার্য ম্যাক্সমূলর যখন ঋগবেদসংহিতা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন অনেক বিচার করে তিনি কাশীর লিপি হিসাবে নাগরীলিপিতেই তা প্রকাশ করলেন (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)। অল্প পরে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় তিনটিও (১৮৫৭-৫৮) নাগরীকেই সংস্কৃতের প্রধানতম লিপি বলে স্বীকৃতি দিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত শিক্ষায় এই লিপি প্রচলনে যথেষ্ট সাহায্যদান করলেন। ফলে, নাগরী ক্রমেই সংস্কৃতের প্রধানতম লিপি বলে সর্ব-ভারতের গ্রাহ্য হয়ে উঠল, দেব-ভাষার লিপি হিসাবে তার নাম তাই হয়ে দাঁড়াল 'দেবনাগরী'। 'সংস্কৃতের অক্ষর' বা 'দেবনাগরী' বলে অবশ্য অলীক ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হবার কারণ নেই। কিন্তু আধুনিক ভারতের সর্বপ্রধান লিপি হিসাবে এবং ভারতীয় বিদ্যাচর্চায় অপরিহার্য মুদ্রিত লিপি হিসাবে এখন নাগরীকেই ব্রাহ্মী লিপির প্রধান উত্তরাধিকারী বলতে হবে। একলিপি প্রসারের চেষ্টা করতে হলে তাই নাগরী লিপিকেই ভারতের সকল ভাষার লিপি করা যায় কিনা তা দেখতে হয়।

নাগরী ও বাঙলা লিপির তুলনা করলে আমরা দেখি, প্রথমত, নাগরী লিপি অনেক বেশি লোকের পরিচিত। দ্বিতীয়ত, দুই লিপিরই ত্রুটিসমূহ প্রায় সমান (এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করব); কিন্তু তারও মধ্যে মুদ্রিত নাগরী লিপি মুদ্রিত বাংলা লিপির চেয়ে কম জটিল। তৃতীয়ত, মুদ্রিত নাগরী অক্ষরের বলিষ্ঠ শ্রী বাঙলা অক্ষরের চেয়ে বেশি। ভারতের অন্যান্য লিপির সঙ্গে তুলনায়ও নাগরী লিপির এরূপ উৎকর্ষ দেখা যাবে। অন্য সকল লিপিও ব্রাহ্মীর বংশধর, কিন্তু নাগরী তার যোগ্য বংশধর। এই কারণেই একলিপি প্রচারের প্রয়োজন বুঝে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি মনস্বী বাঙালীরা নাগরী প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, সেরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন।

কিন্তু রোমক লিপির মতো অ-ভারতীয় একটি লিপির সঙ্গে তুলনায় নাগরীর ত্রুটি অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় লিপির মতোই সুস্পষ্ট। (দ্রষ্টব্য : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "এ রোমান এ্যালফাবেট ফর ইণ্ডিয়া", জর্নাল অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব লেটার্স, ২৮৯ খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫)।

নাগরীর দোষত্রুটি

প্রথমত, রোমক লিপির অপেক্ষা নাগরী লিপি জটিল, তাতে বিজ্ঞান-সম্মত সরলতা নেই। প্রাচীন ব্রাহ্মীও সরল ছিল, হয়তো উৎকীর্ণ লিপি বলেই তার ঋজুতাও দেখবার মতো, তার একটা ভাস্কর্যসুলভ দৃঢ়তা আছে। অশোক-অনুশাসনের আলোকচিত্র বা প্রতিলিপি থেকে পাঠক তা মিলিয়ে দেখবেন। বর্তমান প্রেসের অসুবিধা না ঘটিয়ে বলতে পারি, প্রাচীন ব্রাহ্মী + তার বংশধর 'ক' বা क থেকে নিশ্চয়ই সরল ও সুন্দর। O তেমনি তার পরিণতি ঠ বা ठ থেকে অনেক বেশি সহজ ও শোভন। অবশ্য রোমক লিপিও এ-সব দিকে অনেক বেশি কার্যকরী।

দ্বিতীয়ত, লিপি-বিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি বর্ণলিপি বা অ্যাল্-ফাবেটিক লিপি। কিন্তু ভারতীয় লিপি সম্পূর্ণরূপে সে-স্তরে এসে পৌঁছয়নি ; তা এখনো স্বরবাহিত (সিলেবিক) লিপি বা অক্ষরমূলক লিপি হয়ে আছে। যেমন, ধর্ম আমরা উচ্চারণ করি—ধ্ + অ + র্ + ম্ + অ, কিন্তু লিখি—'ধর্ম'। অথচ রোমক লিপিতে বর্ণসমূহ যথা-ক্রমে ঠিকভাবে লিখতে হয়—d + h + a + r + m + a = dharma। রোমক লিপিতে স্বর ও ব্যঞ্জন প্রত্যেকটি বর্ণ নির্দিষ্ট হচ্ছে, যথাক্রমে লিখিত হচ্ছে, কিন্তু ভারতীয় লিপিতে 'অক্ষরই' মূল। যেমন, 'ধ' অক্ষর = 'ধ' বর্ণ + 'অ' বর্ণ, তা আমরা মনেও রাখি না। অন্যদিকে, যা 'ধর্মের' মূল ধারণা ('ধর' ক্রিয়া) তাও দ্বিভক্ত লিপিতে আচ্ছন্ন হয়—আমরা ভুলে যাই যে কথাটা √ ধর + ম ; অক্ষর-লিপির নিয়মে ধারণা করি ধ + রম। লিপির এই বিভ্রাটে আসলে কথাটার রূপও

আমাদের মনে বিকৃত হয়ে যায়। ভারতীয় অক্ষরের মধ্যে স্বরবর্ণের স্থানটা অত্যন্ত গৌণ; অ শব্দের আগে ছাড়া লিখিত হয় না, ব্যঞ্জনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। অন্যান্য স্বরও ব্যঞ্জনের পিছনে পড়লে আপনার গুরুত্ব রক্ষা করতে পারে না, যেমন ই হয় ি; ঈ হয় ী; উ ু হয়ে কখনো নিচে (কু) কখনো মাঝে (রু) কখনো শুয়ে (শু) কখনো হুমকি দিয়ে মাথায় চড়ে (হু)—কী অবস্থা কখন করে তার ঠিকানা নেই।

তৃতীয়ত, প্রধানত অক্ষরমূলক (সিলেবিক) লিপি বলেই ব্রাহ্মীরও একটি ত্রুটি ছিল—তার ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত হলে মিলেমিশে আরও একটি নূতন চিহ্নের সৃষ্টি করত। যেমন, বাঙলার ক্ত ঞ্জ, ক্ষ, জ্ঞ, ঙ্ক, ঙ্গ, ষ্ণ, ঞ্চ প্রভৃতি। এরূপে স্বরবর্ণ (অ ছাড়া) ব্যঞ্জনের পরে থাকলে নূতন আর-এক চিহ্ন দিয়ে সূচিত করতে হবে। সে-চিহ্ন কখনো বাঙলার সামনে ি, ে; কখনো পিছনে া, ী; কখনো দু-ধারে ে া; আর মাথায়, পায়ে, মধ্যখানে যেখানে যেমন পারে আশ্রয় করছে। লিপি-পণ্ডিতেরা বলেন, এ-ত্রুটি ব্রাহ্মী থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙলার লব্ধ। টেনে লেখার দায়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অশেষ দুর্গতি ঘটেছে প্রত্যেক ভাষার লেখায়। অথচ সেই টেনে লেখা কি ব্যাহত হয়নি যখন 'এক' লিখেছি উচ্চারণ অনুযায়ী, আর 'কে' লিখতে গিয়ে উচ্চারণ তুচ্ছ করে আগে লিখেছি পরের এ-কার, তারপরে লিখেছি ক-কার। এখানে তাই অরাজকতা কায়েম হয়েছে। আশৈশব অনেক বেত খেয়ে, অনেক সময় ও শক্তির অপব্যয় করে, তবেই এই অনিয়মের রীতি আমরা মানতে পেরেছি। আমাদের ভাবী বংশধরদের এই অরাজকতা থেকে নিষ্কৃতি দান করাও আমাদের দায়িত্ব। তা ছাড়া এরূপ সংযুক্ত বর্ণমালা ও স্বরকণ্টকিত ব্যঞ্জন সমূহ দেখতেও কিম্ভূতকিমাকার; কোনো মুদ্রাকর তাদের কেটে-কুটে আর শোভন করতেও বিশেষ পারেন না। এবং উপযোগিতার দিক থেকে তারা পংক্তিতে একটু আয়

বাড়ালেও উপরে-নিচে নেমে অনেক বেশি স্থানের অপব্যয় করে। ছোটো অথচ সুপাঠ্য হরফ সৃষ্টি এ-সব লিপিতে প্রায় অসম্ভব। আসল কথা, লেখায় যেমন হোক, সংযুক্ত বর্ণের এই প্রাবল্যে মুদ্রণ একটা কঠিন ব্যাপার হয়, আর টাইপ-করা একটা আজব কাণ্ড থেকে যায়। সাধারণত, রোমক ছাপায় দাঁড়িকমাও সংখ্যা-চিহ্ন 1 থেকে 9—এই সমস্ত মিলিয়ে প্রেসের মুদ্রণের জন্য প্রয়োজন হয় ১৫২টি চিহ্নের (লাইনোটাইপে মাত্র ৯২টির)। ২৬টি আবার ক্যাপিটাল বা বড়ো হাতের হরফ। সেই ক্ষেত্রে বাঙলা হরফে দরকার হত: হ্যাণ্ড-কম্পোজ ৫৬৩টি চিহ্নের (৪৫৫টি খোপের)। এখনো লাইনোতে দরকার হয় ১২৯টি। নাগরী মুদ্রণেও প্রায় ৭০০ থেকে ৪৫০টি চিহ্নের প্রয়োজন। রোমক ও নাগরীর তুলনাটা সুনীতিবাবুর ভাষায় তাই "১৫২ মুদ্রাচিহ্ন বনাম ৪৫০ মুদ্রাচিহ্নের মামলা"। এ-মামলায় প্রেস ও পাঠক, বিশেষত শিক্ষার্থী পাঠক, কোন পক্ষে যোগ দেবেন তা কারো বুঝতে দেরি হয় না। কাজ-কারবারে টাইপরাইটার, টেলি-প্রিণ্টার, শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি যাঁরা চান তাঁদের বক্তব্যও সুবিদিত। যাঁর শ্রী ও শৃঙ্খলবোধ আছে তিনিও আবার সে-পক্ষেই সায় দেখেন, তাও স্মরণীয়।

ভারতীয় বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক বিভাগ

ভারতীয় লিপির স্বপক্ষে একটা বড়ো কথা বলবার আছে। তা এই যে, ভারতীয় বৈয়াকরণরা এই বর্ণমালাকে যেভাবে সাজিয়েছেন এবং আমরা যেভাবে এখনো তা মুখস্থ করি, শিখি—তা ধ্বনি-বিজ্ঞান-সম্মত এক আশ্চর্য ব্যবস্থা। প্রথম স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ভাগ করে, ধ্বনির নিয়ম অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ বিভেদ তাঁরা করেছেন (আমরাও বলি হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ প্রভৃতি)। ব্যঞ্জনকে তাঁরা প্রথম কণ্ঠ্য (ক-বর্গ), তালব্য (চ-বর্গ), মুর্ধন্য (ট-বর্গ), দন্ত্য (ত-বর্গ), ঔষ্ঠ্য (প-বর্গ), এই পাঁচ 'স্পর্শ'-বর্গে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক

বর্গের মধ্যে আবার অঘোষ (আনভয়েস্‌ড, অল্পপ্রাণ ১ম বর্ণ, মহাপ্রাণ ২য় বর্ণ), ঘোষ (ভয়েস্‌ড, অল্পপ্রাণ ৩য় ও মহাপ্রাণ ৪র্থ বর্ণ) এবং অনুনাসিক (৫ম বর্ণ) ক্রমবিভাগ করেছেন। এরূপ ২৫টি স্পর্শ-বর্ণের পরে এল ৪টি অন্তঃস্থ বর্ণ (লিকুইড্‌স অ্যাণ্ড সেমিভাওয়েল্‌স) য, র, ল, ব, তারপর ৪টি উষ্মবর্ণ শ, ষ, স, হ—স্পাইর‍্যাণ্ট। এরূপ বিজ্ঞানসম্মত বিভাগ পৃথিবীর অন্য কোনো বর্ণমালায় দেখা যায় না। রোমক বর্ণমালায় এ. বি. সি. ডি. প্রভৃতিতে এই বোধের চিহ্নও মিলে না।

অবশ্য অন্য কোনো লিপি গ্রহণ করলেও ভারতীয় লিপির এই শৃঙ্খলা (অ, আ, ক, খ প্রভৃতি) বা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিভাগ, এবং তা উচ্চারণ করে শিক্ষার পদ্ধতি ('ক'এ হ্রস্ব ই 'কি') ভারতবাসীর পক্ষে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য নয়, আর তা করা আবশ্যক। এ-কথা সুনীতিবাবু বেশ জোর দিয়েই বারবার উল্লেখ করেছেন। তাই ভারতীয় ভাষা লেখার জন্য যদি আমরা রোমক লিপি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজির মতো এ. বি. সি. —এইক্রমে তা পড়বে না। লিখবে—a a', k (a) kh (a) এবং পড়বে অ আ, ক খ। যখন ki লিখবে. তখন আমাদের নিয়মে বানান করবে ক-এ হ্রস্ব ই=কি ('কে-আই=কি' নয়); ব-এ 'আ'কার বা, তাতে অনুস্বার বাং, ল-এ 'আ'কার লা=বাঙলা (বলবে না বি-এ-এন-জি-এল-এ)। অর্থাৎ, রোমক বর্ণমালাকে ভারতীয় ধ্বনি-জ্ঞান ও ধ্বনিবিন্যাসের রীতিতে গ্রহণ করতে হবে।

রোমক লিপির বিরুদ্ধে আপত্তি

কিন্তু প্রশ্ন হবে তাতেই কি আমাদের কার্য সাধিত হবে? এই 'বাঙলা' লিখতে যে a ব্যবহার করলেন সেই রোমক a=বাংলা অ এবং আ, যখন যা খুশি। এবং n=ন, ঙ, যেমন খুশি। অর্থাৎ bangla=বংল, বাংল, বাংলা; এবং বন্‌ল, বন্‌লা, বান্‌ল, বান্‌লা—

এই আটটি উচ্চারণের যে-কোনোটি। বলা বাহুল্য, এ-আপত্তি, সুপরিচিত। রোমক বর্ণের উচ্চারণও ইওরোপের একই ভাষায় এক-এক স্থলে এক-এক রূপ (তুলনীয়ঃ put but ছাড়াও c, g, th প্রভৃতির এক ইংরেজিতেও বিভিন্ন উচ্চারণ) এবং ইওরোপের বিভিন্ন ভাষায় কোনো কোনো বর্ণের উচ্চারণ একেবারে স্বতন্ত্র (বিশেষ করে 'j' বহু ভাষাতেই 'জ' নয়, 'য়'-জাতীয়)। তাই, ভারতে রোমক লিপি গ্রহণ করলে আমরা যথাসম্ভব সেই বিভ্রান্তি পরিহার করব। যেমন g আমাদের গ-ই বোঝাবে, জ নয়। বড়ো হাতের রোমক বর্ণগুলি (A B প্রভৃতি) একেবারে বর্জন করতেও আমাদের কিছুমাত্র বাধা নেই। আর 'a'-র সঙ্গে প্রয়োজনমতো বিন্দু বা দণ্ড বা মাত্রা বা ঊর্ধ্ব কমা প্রভৃতি যোগ করে এবং রোমক লিপির লিখন-পদ্ধতি জটিল না করে তার উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট করতে পারব (যেমন, a = অ, a' = আ—যেভাবে পালি লেখা হয়, অথবা 'দীর্ঘ-স্বরের জন্য মাত্রা রেখা, কিম্বা পার্শ্বেঃ ডবল ফুট্‌কি। বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হবে, রোমক লিপিকেও যদি এত পরিবর্তিত করতে হয় তা হলে নাগরী বা বাঙলা লিপিকে পরিবর্তিত করে কি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না? এ-প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট। রোমক লিপির প্রকৃতি এক-ধ্বনিগত, আমাদের ভারতীয় লিপির প্রকৃতি স্বরবাহিত (সিলেবিক)। তারপরে, আ া, ি ই বাঙলায় এবং সংযুক্ত বর্ণের বিলোপ সুসম্ভব নয় (ধ্ অ র্ ম্ অ লেখা কি সম্ভব—ধর্ম পর্যন্ত যদি-বা এগোই?); আর তার বিলোপ করলেও সে-লিপি সুদৃশ্য বা সুপাঠ্য হবে না। ভারতীয় লিপি-নীতির ঘাড়ের উপর রোমক নীতি চাপানোর থেকে ধ্বনিসম্মত ভারতীয় চিহ্নযোগে রোমক লিপির 'শুদ্ধি' অনেক সুবিধাজনক।

অবশ্য রোমক লিপি গ্রহণের পক্ষে আরও আপত্তি আছে। যথা, তা বিদেশী। আমরা বিদেশী দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন-ড্যাশ

গ্রহণের পক্ষে এখন আর আপত্তি করি না। তবে সমূল লিপি-পরিবর্তনে গুরুতর আপত্তি থাকবে তা অনুমান করতে পারি, বিশেষত আমরা যখন মনে করি ওটা ইংরেজি লিপি। সে-ভুল ভাঙলেও ভাবি—ওটা ইওরোপীয় আধিপত্যের লক্ষণ। এটা ভুল না হোক, মিথ্যা ভয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ হুকমতের সমস্ত কাজের জন্য এই রোমক লিপিই গ্রহণ করেছিলেন তা স্মরণীয়। তিনি ইওরোপীয় প্রীতিতে তা করেননি।

দু-এক জন অবশ্য ওঁ হ্রীং ক্লীং প্রভৃতিতে বীজমন্ত্র দেখেন, এখনো তাঁরা তা দেখবেন। তাঁদের কাছে ওগুলি লিপি নয়—প্রতীক। রোমক লিপি গ্রহণ করলে তাঁরা না হয় এখনকার মতো সেই প্রতীকই আঁকবেন, যেমন আঁকেন পটের মূর্তি।

কেউ হয়তো বলবেন, রোমক লিপি প্রবর্তন করলে আমরা পরে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থমালা আর রোমকে মুদ্রিত নাহলে পড়তে পারব না, আমাদের ঐতিহ্য ব্যাহত হবে। বলা বাহুল্য, বর্তমান বাঙলা মুদ্রিত লিপি জানলেও পাণ্ডুলিপির বাঙলা পড়া সহজসাধ্য নয়, প্রাচীন লিপি পড়া দুঃসাধ্য। প্রিন্‌সেপ সাহেব ব্রাহ্মীর চাবি কাঠি আবিষ্কার করার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসী কি ঐতিহ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিল? প্রাচীন লিপি গবেষক বা কৌতূহলী লোকরা বরাবর শিখবেন।

এক দল বলবেন, সোবিয়েত ইউনিয়ন তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নতুন ভাষায় যখন লিপি সৃষ্টি করলেন তখন তাঁরা রোমক -লিপিই গ্রহণ করেছিলেন, পরে তা ত্যাগ করে রুশ লিপিতে ফিরে গিয়েছেন। এঁদের মনে করতে বলি—চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে বিশেষ কারণে রোমক লিপি গ্রহণে বাধা ছিল; সে-বাধা আমাদের নেই। সোবিরেত দেশে রুশ, উক্রাইন, বায়লোরুশ প্রভৃতি জাতিরা ১৮ কোটির মধ্যে ১২ কোটির মতো, তারা রুশ লিপির সঙ্গে সুপরিচিত। রুশভাষীর সংখ্যাধিক্য, তাদের উদ্যোগ ও ব্যাপ্তি এবং

রুশ ভাষার ঐশ্বর্য প্রভৃতির জন্য সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অন্য শ-দেড়েক ভিন্নভাষীর পক্ষে রুশ ভাষা সহজেই আদান-প্রদানের ভাষা হয়ে উঠেছিল, রুশ-লিপিও সহজেই চেনা হয়ে যায়। তাই, কোনো ছোটো জাতি রোমক লিপিতে তাদের ভাষা নতুন করে লিখতে শুরু করলেও নিজের গরজেই তাদের আবার রুশ-লিপি ও শিখতে হয়। একমাত্র পণ্ডিত বা গবেষক ছাড়া আর কারো রোমক লিপি শিখে কোনো লাভ হয় না। সেখানে তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে রুশ-লিপিতে নিজের ভাষা শেখা বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে রুশ-লিপি যখন রোমক লিপির মতোই ধ্বনিসম্মত লিপি।

রোমক গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি

আসল কথাটা তাহলে এই ঃ—একলিপি গ্রহণ যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তাহলে ভারতীয় লিপির মধ্যে নাগরী লিপিই গ্রহণযোগ্য। বলা বাহুল্য, বর্তমান অবস্থায় অন্তত বাঙালা ভাষায় বাঙলা লিপির পরিবর্তে নাগরী লিপি প্রবর্তিত করা বিষম দুর্বুদ্ধি হবে। কারণ, তা করলে পূর্ববঙ্গের বাঙালীরাও উর্দু (আরবী-ফারসী) লিপির নিকট আত্মসমর্পণ কবতে বাধ্য হবেন। দুই বাঙলায় বাঙলা দুই লিপিতে লিখিত হলে বাঙালীর দুর্ভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হবে। কাজেই বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতির প্রতি যাঁদের মমতা আছে, তাঁরা বাঙালায় নাগরী লিপি গ্রহণে নিশ্চয়ই সম্মত হবেন না। বাঙলা লিপির পরিবর্তে রোমক লিপি গ্রহণ করলে পূর্ব বাঙলার বাঙালীরাও ক্রমশঃ তা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হবেন, আশা করা যায়। অন্তত রোমক লিপির স্বীকৃতিতে আরবী-ফারসী লিপির বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার বাঙালীর বিরোধিতা দুর্বলীকৃত হবে না। কিন্তু একলিপি গ্রহণের অর্থ যদি হয় লিপি-সারল্য, বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক ব্যাপারের উপযোগী লিপি গ্রহণ,—তাহলে

রোমক লিপিই গ্রাহ্য। এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত হলেও আপাতত বহুলস্বীকৃত নয়। দেশের শিক্ষিত সমাজেও এখনো এই বোধ বিস্তারলাভ করেনি বলেই আমাদেরও এখনো এত বাগ্‌বিস্তার করতে হয়। (বাঙলা দেশে "ভারত-রোমক সমিতি" এ-প্রস্তাব দেশের সম্মুখে উত্থাপন করেছেন; সে-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ শেঠ মহাশয়।)

রোমক লিপির দাবি যদি স্বীকৃত হয় তাহলেও তা প্রচলিত করা অবশ্য একটা সমস্যা হবে—তা হবে শাসক ও শিক্ষিত সাধারণের বুদ্ধি ও উদ্যোগের বিষয়। আর, তারও পূর্বে তার সর্বসম্মত ভারতীয়-রূপায়নও হবে পণ্ডিত ও মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞদের আলোচনা ও নির্ধারণের বিষয়। সে-বিষয়েও তাঁরা দু পক্ষই সাহায্য পাবেন ভারত-রোমক সমিতির থেকে, এবং এখনো বিচার-বিবেচনার উপযোগী প্রস্তাব পেতে পারেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত এ-বিষয়ের প্রবন্ধাদি থেকে। সে বিশদ আলোচনার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়, তবু প্রধান কথাটি না জানলে পাঠকের সংশয় যাবে না, ধারণা সম্পূর্ণ হবে না।

রোমক লিপি অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে চলছে। এখন তা পালি লিপিতে, প্রাকৃতে, কতকাংশ সংস্কৃত লিপ্যন্তরে এবং 'রোমান উর্দু' নামের হিন্দুস্তানী লেখায় সচল। পূর্বেই বলেছি, আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রোমক লিপি নিয়ম বেঁধে প্রবর্তন করতে হলে আমরা গ্রহণ করব: (ক) সহজ ও সরল রোমক বর্ণসমূহকে (খ) ভারতীয় ভাবার প্রয়োজনে যথা-সম্ভব স্পষ্ট চিহ্নযোগে তা পরিবর্তিত করে, এবং (গ) ভারতীয় ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক বর্ণক্রম অনুযায়ী এই নূতন রোমক বর্ণাবলীর ক্রম ও বিন্যাস সাধন করে।

এই মূলনীতি স্বীকার করে বুঝতে হবে তা প্রবর্তনের সর্বাধিক সুষ্ঠু পথ কী? তা সংক্ষেপে—লোকমত গঠন করা, লোকসম্মতি গ্রহণ

করা এবং তারপর যথাসম্ভব কম বিরক্তি উৎপাদন করে তা ধীরে ধীরে প্রবর্তন করা। সুনীতিবাবু (১৯৩৪-এ) মনে করতেন তা সম্পূর্ণ হবে ৫০ বৎসরে। কিন্তু পৃথিবীতে পরিবর্তন আজ আসে বৈপ্লবিক ত্বরায়; কাজেই অবস্থান্তর ঘটলে এই লিপ্যন্তরও অনেক ত্বরিত গতিতে জনসাধারণও মেনে নিতে পারে। জনতার বৈপ্লবিক চেতনার উপরই তা নির্ভর করবে। আপাততঃ 'নাগরীর জন্য নাগরী' লেখকদের তাড়া আছে, রোমকের বিরুদ্ধে এ আপত্তিই প্রবল। এ কথা মনে রেখে বলা যায়, এখনকার কাজ প্রচার; এবং প্রথমে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপর রোমক লিপি গ্রহণের চাপ না দিয়ে বরং প্রথমে যারা এই লিপি জানে সেই উচ্চশিক্ষিতদেরই তা কোনো বিশেষ ব্যাপারে ভারতীয় ভাষার প্রয়োগ করতে রাজী করানো। বিশ্ববিদ্যালয়ে, সার্ভিস পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষার প্রশ্নোত্তর রোমক লিপিতে দাবি করা চলতে পারে; সাময়িক পত্রে অন্য ভাষার উদ্ধৃতি এই লিপিতে দেওয়া চলে; ক্রমে উচ্চ শিক্ষার দেশীয় ভাষায় রচিত সমস্ত পুস্তকই এভাবে মুদ্রিত করা সম্ভব। এ-সব প্রচলিত হলে তারপরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বিকল্পে রোমক শিখবে—তার পূর্বে নয়।

ভারতীয় রোমকের রূপ

পরিবর্তিত রোমকলিপি কিরূপ হবে এখন সেই প্রশ্ন। সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব-শেষ ("ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা", পরিশিষ্ট গ) প্রস্তাব এই দিকে বিচার্য। আমরা তার নমুনা এখানে দিচ্ছি।

স্বরবর্ণ

a	a′	i	i′	u	u′	e	a-i	o	o-u
স্বরে অ	স্বরে আ	হ্রস্ব ই	দীর্ঘ ঈ	হ্রস্ব উ	দীর্ঘ ঊ	এ	ঐ	ও	ঔ

ব্যঞ্জন বর্ণ

k	kh	g	gh	n
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
c	ch	j	jh	n′
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
t'	t'h	d'	d'h	n'
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
t	th	d	dh	n
ত	থ	দ	ধ	ন
p	ph	b	bh	m
প	ফ	ব	ভ	ম
y	r	l	w	s′
য	র	ল	অন্তঃস্থ ব	শ
s'	s	r'	r'h	h
য	স	ড়	ঢ়	হ

আর বেশী বিরক্ত না করে এই আলোচনার গোড়ার কয়েক লাইন নতুন হরফে দেওয়া হল, পড়তে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হবে,

bha′ratbars'a bahuja′tir o bahubha′s'a′r des′. ei bira′t' des′er naba-gat'hita ra′s't'ra o pa′kista′ner a′bhyantari′n' a-ikya ta′i stha′y-bha′bə gat'han kara′ sambhab ekma′tra gan′ata′ntrik paddhatite—pratyek ja′tir o bha′s'a′r a′tmabika′s′er pu′rn'atama adhika′r-i habə ta′r bhitti.

কার্তিক, ১৩৬০ বাং

রাষ্ট্রভাষা-বিভ্রাট

আধুনিক ভারতে বাঙালীর মত অদৃষ্টের পরিহাস বোধ হয় আর কাউকে সইতে হয় না। উনবিংশ শতকে আমরা বাঙালীরা একটা মহান্ আদর্শকে ভারতবর্ষের সামনে স্থাপিত করেছিলাম, সে আদর্শ—স্বাধীনতা। সেই আদর্শেরই দায়ে আমরা আরও তুটি জিনিসকেও প্রয়োজন হিসাবে অনেকাংশে মেনে নিয়েছিলাম। একটি ভারতের জাতীয় সংহতি (নেশন-গঠন), অন্যটি সেই জাতীয় ঐক্যের সহায়করূপে হিন্দী ভাষার প্রসার। ভূদেব, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্য হিন্দীকে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ভারতীয় ভাষা মনে করেছেন। এ এক অদ্ভুত নিয়তি যে, স্বাধীনতা এল বাঙালী জাতিকে প্রথম দ্বিখণ্ডিত করে, তারপর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। আর আজ ভারতের জাতীয় সংহতি ও হিন্দীর প্রতিষ্ঠাও ঘটছে সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাঙালী জাতিকে আরও ব্যাহত, হয়ত বা বিলুপ্ত করে। বাঙালীর জাতীয় সত্তাকে বিলুপ্ত করে যে ভারতীয় জাতীয় সংহতি গঠিত হবে, এ কথা অবশ্য আমরা পূর্বেও কোনদিন মনে করিনি। অস্পষ্টভাবে হলেও তখনো আমরা জানতাম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হল ভারত-জীবনের বৈশিষ্ট্য ; এবং ভারতবাসী অর্থে ঠিক এক 'নেশন' নয়, বহু জাতি নিয়ে এক 'মহাজাতি'। ভারতবর্ষ 'নেশন-ষ্টেট'-রূপে গঠিত হবে না, 'মহাজাতীয় রাষ্ট্র' বা মাল্‌টি-ন্যাশানাল ষ্টেট্‌রূপে বিকশিত হবে। আমাদের ভারত-রাষ্ট্রের কর্তারা কিন্তু ভারতকে এক-নেশন রূপে রূপায়িত না করতে পারলে অস্বস্তি বোধ করছেন—ভারতীয় মহাজাতি ও মহাজাতীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ তাঁরা বুঝতে অক্ষম বা অস্বীকৃত। ক্ষোভের বশে আমরাও তাই এখন ভারতীয় ঐক্য ও মহাজাতীয় সংহতির কথা ভুলতে বসি, তার প্রমাণ এ মুহূর্তে অনেক পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, হিন্দীর ও হিন্দীবাদীদের উগ্রতা ও আস্ফালন দেখে মনে করি—রাষ্ট্রভাষা

হিসাবে হিন্দীর পরিবর্তে ইংরেজিকেই অব্যাহত রাখা শ্রেয়ঃ। সম্প্রতি (১৯৫৫) 'সরকারী-ভাষা কমিশন' কলিকাতায় এসে দেখে বিস্মিত হলেন যে, বাঙালী মনস্বীরা একবাক্যে (?) চাইছেন শিক্ষায়-দীক্ষায়, সরকারী কাজকর্মে ইংরেজির চিরস্থায়িত্ব।

নতুন ইংরেজি-মোহ

হিন্দী সম্পর্কে ভূদেব, কেশব প্রভৃতির যে আস্থা ছিল আমাদের আজ আর তা নেই। হিন্দীর প্রতি আমাদের এই বিরূপতার প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত, হিন্দী ভাষা এখনো একটা সুস্থির ভাষা-রূপ গ্রহণ করেনি। হিন্দী-হিন্দুস্তানী-উর্দু এই ত্রিরূপের মধ্য থেকে কোন্ বিশেষ রূপকে আশ্রয় করে 'হিন্দী' বিকশিত হবে, কি করে ভারতের অন্যান্য ভাষার থেকে শব্দ আহরণ করে তা আবার (সংবিধান অনুযায়ী) 'রাষ্ট্রভাষা' হবে, তা অনিশ্চিত। অন্যদিকে, বর্তমান হিন্দী ভাষার শক্তি ও সামর্থ্য এখনো বহু পরিমাণে অপরিণত। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দীবাদীরা নিজেরাই বাধাস্বরূপ। কারণ, তাঁরা সকলে হিন্দীভাষী নন, যথা,—বিহার, রাজস্থান, পঞ্জাব ও পাহাড়ীয়া অঞ্চলে হিন্দী শুধু শিক্ষিতরাই শিখেন, হিন্দী তাঁদের মুখের ভাষা নয়, 'কুলট্-স্প্রাখে' বা পড়ে-শেখা ভাষা। অথচ বৃহত্তম গোষ্ঠী হিসাবে এই নানা ভাষী হিন্দীবাদীরা সব সময়ে ভাষার প্রশ্নে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেননি। এমন কি, নিজেদের 'হিন্দী' গোঁড়ামির সঙ্গে তাঁরা 'স্বাজাত্যের' নামে এক মধ্যযুগ-সুলভ সাংস্কৃতিক গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাই আমরা বাঙালীরা অনেকেই মনে করি—ইংরেজি ভাষার সহায়তায় আমরা আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে যে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি, হিন্দী ভাষা ইংরেজির স্থান নিলে এই হিন্দীবাদীদের সংকীর্ণতা আমাদের মধ্যযুগের দিকে আবার টেনে নিয়ে যাবে, কূপমণ্ডুক করে তুলবে।

এ বিষয়ে আমরা যা ভুলে যাই তা হচ্ছে এই—আধুনিক চিন্তা-জগতের চাবিকাঠি ইংরেজের একচেটিয়া নয়। ফরাসী ও জার্মান ভাষা কেন, রুশ ও জাপানী ভাষারও হাতে তা আছে। আর কাল চীনা ভাষা যে তা আয়ত্ত করবে, তাও নিশ্চয়। বাঙলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মরাঠী প্রভৃতি আধুনিক ভারতের প্রধান ভাষাগুলিই বা তা ক্রমশঃ আয়ত্ত করতে পারবে না কেন? তবে যতক্ষণ আমাদের ভাষায় এরূপ চাবি আয়ত্ত না হয় ততক্ষণ একদিকে তা আয়ত্ত করবার জন্য আমাদের ভাষার উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যদিকে ইংরেজি দিয়েই তার প্রয়োজন সিদ্ধি করতে হবে,—এইটিই হল স্বাজাত্যের খাঁটি পথ। এই দু'দিকের কাজ এক সঙ্গেই হতে পারে, এবং এক সঙ্গে না হলে মূলপ্রয়াস সার্থক হবে না, তাও আমাদের বোঝা উছিত। কারণ, ইংরেজির কৃপায় আধুনিক চিন্তার জগতে প্রবেশ করতে পেরেছে ও পারবে মাত্র দেশের শতকরা দু' দশ জন,—এখনো শতকরা ২জনও তা করে নি। কিন্তু আধুনিক মনোভাব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে পারে একমাত্র জনাসাধারণের নিজেদের ভাষার মারফতে। অর্থাৎ বাঙালীর মধ্যে বাঙালায়, হিন্দীভাষীদের মধ্যে হিন্দীতে, মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে মরাঠীতে, এরূপে। আধুনিক মনোভাব সমাজে ব্যাপ্ত না হলে একালে কোনো সমাজ উন্নত হয় না। আমরা ভুলে যাই জনসমাজে আধুনিক মনোভাব ভাষা ততটা দ্রুত প্রচলিত করে না যত দ্রুত ও যত ব্যাপকভাবে তা প্রবর্তিত করে আধুনিক জীবন-যাত্রা,—কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যান-বাহন, এক কথায় শিল্পায়ন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজেশন ও ডিমোক্রাটিক রাষ্ট্র-পদ্ধতিতে। যে মধ্যযুগীয় মনোভাব ইংরেজি দূর করতে পারেনি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সত্যই প্রচলিত হলে তা নিঃসন্দেহে বিলুপ্ত হতে থাকবে। হিন্দী ভাষাও তখন মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছেড়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াসে

নিশ্চয়ই এ পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা যায়। কিন্তু ভাষা সেপক্ষেও একমাত্র বাহন নয়; অন্তত বিদেশী ভাষা দিয়ে জনগণের চেতনা প্রভাবিত করা যায় না।

আসলে আমাদের ইংরেজির প্রতি যে নতুন করে মোহ দেখা দিচ্ছে তার একমাত্র কারণ ইংরেজির অতুলনীয় প্রভাব ও শক্তি নয়; বরং সাম্রাজ্যবাদী আমলের অভ্যস্ত ইংরেজি-ভক্তি ও বর্তমান হিন্দীবাদীদের সেই সাম্রাজ্যবাদী-পদ্ধতিতে হিন্দীকে ইংরেজির স্থালাভিষিক্ত করার উগ্র চেষ্টা। কিন্তু হিন্দী প্রতিক্রিয়াবাদীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা যদি ইংরেজির অতিভক্ত হয়ে উঠি, তা হলে আমরা পরোক্ষে হিন্দী-প্রতিক্রিয়াবাদীদেরই শক্তিবৃদ্ধি করব।

হিন্দীর চলতি হিসাব

হিন্দী-প্রতিক্রিয়াবাদীরা যা বুঝতে চান না তা এই যে, হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হবার মত কতকগুলো দাবী থাকলেও হিন্দী ইংরেজির মত উন্নত ভাষা নয়। ইংরেজির মত সাংস্কৃতিক ও বিশ্বজনীন প্রতিপত্তি সঞ্চয় করতে হিন্দী (বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা) যতক্ষণ না পারে, ততক্ষণ বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ইংরেজিকে ভারতীয় জীবনে স্থানদান করতে হবে। এবং শেষ পর্যন্তও হিন্দী বহুদিকেই ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় কথা যা হিন্দী-প্রতিক্রিয়াবাদীরা বিস্মৃত হন তা এই যে, যে-যে ক্ষেত্রে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয় সেই সব ক্ষেত্রেও হিন্দীর প্রবর্তন ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদীদের পদ্ধতিতে করা যায় না। ভারতবর্ষ ইংরেজের বিজিত সাম্রাজ্য ছিল, হিন্দীবাদীদের তা 'সাম্রাজ্য' নয়। এই সত্য না বুঝলে ভারতের অন্যভাষীদের তাঁরা হিন্দী-প্রসারের বিরোধী করে তুলবেন

এবং হিন্দীর যতখানি প্রসারের স্বাভাবিক সম্ভাবনা আছে তাও বিপন্ন করবেন। স্বাভাবিকভাবে হিন্দীর প্রসারের কি কি কারণ আছে তা আমরা পরে উল্লেখ করছি। হিন্দীবাসীদের পক্ষে বর্তমানে প্রধানতম উদ্যোগ হওয়া উচিত—ভারতের অন্যভাষীদের মন থেকে 'হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদ' বা উপর থেকে চাপানো ভাষা বলে হিন্দীর সম্বন্ধে যে বিরূপতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার নিরাকরণ করা। এই জন্য সংবিধানে ১৯৫৬ থেকে হিন্দী প্রচলনের যে সব ধারা প্রণীত হয়েছে তার পুনর্বিবেচনা ও যথারীতি সংশোধন প্রয়োজন।

তাই তৃতীয় কথা যা হিন্দীবাদীদের এবং ভারতীয় শাসক শ্রেণীর বোঝা দরকার তা এই যে, (১) 'রাষ্ট্রভাষা' ও 'জাতীয় ভাষা' এক কথা নয়; (২) হিন্দীই শুধু 'জাতীয় ভাষা' নয়, ভারতরাষ্ট্রে আরও ১১।১২টি 'জাতীয় ভাষা' আছে; (৩) হিন্দীকে যে 'রাষ্ট্রভাষা' বলা হয় সেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবেও ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দীর প্রয়োজন সীমিত। প্রথমত, ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট বা কেন্দ্রীয় সরকারেরই (১৯৬৫ থেকে) তা রাষ্ট্রভাষা; কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য-সরকারের তা রাজ্যভাষা নয়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারেরও হিন্দী সর্ববিষয়ে এক-মাত্র ভাষা নয়, প্রধানতম গ্রাহ্য ভাষামাত্র। বাঙলা, মরাঠী, তামিল প্রভৃতি 'রিজিওনাল' ভাষাও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অগ্রাহ্য নয়, তবে দপ্তরের কাজেকর্মে সে সব অব্যবহার্য মাত্র। সরকারী কোনো কোনো বিভাগে অবশ্য ইংরেজি এখনো বর্জিত হতে পারে, কিন্তু আইন-কানুন প্রভৃতি কোনো কোনো বিষয়ে ইংরেজির পরিবর্তে কোনো ভারতীয় ভাষার ব্যবহার বেশ বিলম্বিত হবে। তার কারণ দুর্বোধ্য নয়। যেমন, শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ভারতীয় ভাষার ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানেও হিন্দীর নেতৃত্ব সকলে স্বীকার করছে না। যেভাবে বর্তমানে হিন্দী-ধুরন্ধররা পরিভাষা প্রণয়নে বা কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় হিন্দী-গ্রন্থ প্রণয়ণে ও প্রকাশে অগ্রসর হচ্ছেন, তা অন্যভাষীদের নিকট প্রায়ই হাস্যকর ও

আপত্তিজনক। অর্থাৎ যে-সব ক্ষেত্রে ইংরেজি পরিত্যাগ করা সম্ভব সে-সব ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রধান ভাষাসমূহেরই প্রতিষ্ঠা ঘটছে এবং ঘটবে, হিন্দীর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হচ্ছে না এবং হওয়া বর্তমান অবস্থায় বাঞ্ছনীয়ও নয়। কার্যত (এবং আইনত ?) হিন্দী ভারতের প্রধানতম রাষ্ট্রভাষা, কিন্তু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা নয়, একথা তাই পরিষ্কার করে বোঝা উচিত।

প্রাথমিক সমাধান

এ অবস্থায় ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রেও এখন যা প্রধান প্রয়োজন তা হচ্ছে ভাষা-বিরোধের স্বাভাবিক সমাধান। যেমন, প্রথমত ভারতের সকল ভাষাভাষীকে তাঁদের 'আঞ্চলিক ভাষায়' আত্মপ্রকাশের সুবিধা দান। আসলে এই ভাষাগুলিই ভারতের জাতীয় ভাষা—তেলেগু, মরাঠী, বাঙলা, প্রভৃতি,—যা মহাজাতির অন্তর্গত প্রধান জাতিদের ভাষা। ভারতীয় লোকসভায় বা রাষ্ট্রসভায়ও সেই প্রত্যেকটি প্রধান ভাষার স্বীকৃতি দান প্রয়োজন। মন্ত্রীদের কারও বক্তৃতা হিন্দীতে (বা ইংরেজিতে) প্রদত্ত হলে (সভ্যরা দাবী করলে) 'আঞ্চলিক ভাষায়' তার অনুবাদ অবিলম্বে সরবরাহ করা উচিত (ইউ, এন-এর মত লিখিত বিবৃতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের ব্যবস্থা মোটেই অসাধ্য কর্ম নয়)।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিন্দী, বাঙলা, তামিল প্রভৃতি লেখায় ও অনুবাদে 'আরবী' (ইংরাজিতে প্রচলিত) সংখ্যা চিহ্ন (1, 2 প্রভৃতি) ও রোমক লিপির ব্যবহার, এবং ক্রমে ভারতের সর্ব-ভাষায় সেইরূপ সংখ্যা চিহ্ন ও রোমক লিপির প্রচলন। লিপির বৈষম্য এরূপে ঘুচে গেলে ভাষার বৈষম্য একদিক দিয়ে এত দুস্তর ঠেকবে না।

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন—এটি তৃতীয় কথা—একটি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ট্রানসেলেশন সার্ভিস বা অনুবাদ বিভাগের প্রবর্তন—

যারা ভারতের একটি ভাষা থেকে আর একটি ভাষায় অনুবাদ অগৌণে সাধিত করবে এবং ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে দেশীয় ভাষায় ও দেশীয় ভাষা থেকে ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষায়ও অনুবাদ করবে। এ বিভাগের এক শাখার কাজ হবে শাসন-সংক্রান্ত চিঠিপত্র, বিবৃতি, বক্তৃতা প্রভৃতির অনুবাদ দেশীয় নানা ভাষায় সাধন করা ; অন্য শাখার কাজ হরে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আদান-প্রদান সহজ-সাধ্য করা। প্রয়োজন মত ব্যবসায়ীরাও এরূপ অনুবাদক আপিসের সাহায্য নেবেন, তা বোঝা যায়। অবশ্য এ বিভাগের আপিস দিল্লী কেন, বর্তমানের প্রচার বিভাগের মত দেশের প্রত্যেকটি জিলা কেন্দ্রেই তা বিস্তৃত হওয়া উচিত। সে সবের বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, এরূপ অনুবাদ-বিভাগ স্থাপন স্থির হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আই-এ'তে, বি-এ'তে ভাষাপাঠীদের জন্য বিশেষ কোর্স প্রণয়ণ করতে পারে—যাদের ইতিহাস, পৌরবিদ্যা প্রভৃতির পরিবর্তে মাতৃভাষা ইংরেজি, হিন্দী ছাড়াও এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষা পাঠ ও আয়ত্ত করা প্রয়োজন হবে। অনুবাদ বিভাগে চাকরির সম্ভাবনা থাকলে এরূপ ভাষা শিক্ষার্থী ছাত্রের অভাব হবে না।

হিন্দীর ভবিষ্যৎ

শেষ কথা, আমরা বাঙালীরা যেন বিস্মৃত না হই যে, ভারতবর্ষে হিন্দী শুধু শাসকের বিধানেই প্রসারিত হচ্ছে না, স্বাভাবিকভাবেই নানা সূত্রে প্রসারিত হচ্ছে। যেমন, ভারতের গুজরাতী-মাড়োয়ারী প্রভৃতি ধনিক ও বণিকশ্রেণী তাদের ব্যবসায়-গত স্বার্থেই একটি সর্বভারতীয় ভাষা চায়, এবং সেই কারণে হিন্দী-প্রচারে উদ্যোগী। ভারতের শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীও ক্রমশই এক ধরণের হিন্দুস্তানী ভাষা আশ্রয় করে 'বাজারীয়া হিন্দী' বল্‌ছে এবং সেই

সূত্রে হিন্দী ভাষার বাহক হচ্ছে। তাই ভারতের শিল্পায়ন যতই অগ্রসর হবে ততই ভারতীয় জনগণের যোগাযোগ নিবিড়তর হবে, বিভিন্ন-ভাষী ভারতীয় জনগণের একত্র বসবাস বৃদ্ধি পাবে, এবং এই বিভিন্ন ভাষীদের মধ্যে হিন্দী উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করবে। তা ছাড়া, আমরা নিজেরাও জানি—আমাদের মহাজাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্যও একটি ভারতীয় ভাষার সহায়তা-লাভ করা সুবিধাজনক, এরং একটি বা দু'টি ভারতীয় ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক-ভাবেই সেরূপ বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। হিন্দী ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার পক্ষে এই সৌভাগ্য লাভ সম্ভব হবে না, তাও আমরা জানি। কিন্তু সেই সুস্থির পরিণামে পৌঁছবার জন্য শাসক-গোষ্ঠী জোর করে হিন্দীকে প্রসারিত করতে গেলে হিন্দীর প্রসারের পথে বাধা জুটবে বেশি, তার শক্তির অপব্যয় হবে অধিকতর, এবং ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশও ব্যাহত হবে।

মহাদেশের মত বিরাট এই দেশে একটি 'রাষ্ট্রভাষা' গড়ে উঠতে যদি বিশ পঞ্চাশ কেন, একশত বৎসরও লাগে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ফাল্গুন, ১৩৬০ বাং

॥ সাহিত্য প্রসঙ্গ ॥

বাঙলা সাহিত্যের পটভূমি

জাতি ও সংস্কৃতির প্রধান এক আশ্রয় ভাষা। ভাষার প্রথম সার্থকতা সামাজিক যোগাযোগে, কিন্তু ভাষার চরম সার্থকতা সাহিত্য-সৃষ্টিতে। আধুনিক ভারতবর্ষে বাঙলা ভাষার এবং বাঙালী জাতিরও প্রধান গৌরব বাঙলা সাহিত্য। বিশ্ব-সাহিত্যের মানদণ্ডে তার বিচার করা চলে; তাতেও বাঙলা সাহিত্য একেবারে অগ্রাহ্য হবে না। অথচ ভারতবর্ষের অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যের সম্বন্ধে এ কথা বলা চল্‌বে কিনা সন্দেহ।

এই বাঙলা ভাষাকে অবলম্বন করে প্রায় হাজার বৎসরের উর্ধ্বকাল ধরে বাঙালী জাতি গড়ে উঠ্ছে। হয়ত তার সূচনা হয়েছিল পাল সম্রাটদের কালেই (আনুমানিক খ্রীঃ ৭৫০—খ্রীঃ ১,১০০)। সেন রাজাদের কালে (আনুমানিক খ্রীঃ ১১০০—খ্রীঃ ১২০২) বাঙালী জাতির সে বৈশিষ্ট্য আরও বিকশিত হয়। অবশ্য মৈথিলী থেকে বাঙলার পার্থক্য স্থির হয় আরও শত দুই বৎসর পরে; ওড়িয়া থেকে তার কিছু পরে; অসমিয়ার থেকে বাঙলার পার্থক্য আরম্ভ হল আরও পরে—আনুমানিক তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর আগে। হাজার বৎসর আগে যে বাঙালী জাতি গড়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিল তার নিজের ভাষায় যে সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সে হচ্ছে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের 'চর্যাপদ'—তা সাধনতন্ত্রের গুহ্য-গীতি। প্রায় খ্রীঃ ৯০০—খ্রীঃ—১২০০ এর মধ্যে তা লেখা; ওড়িয়া-মৈথিলী অসমিয়া তখনো স্বতন্ত্র হয় নি। অত পুরনো জিনিস অন্য কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষায়ও আর নেই।

বাঙলা সাহিত্যের এই প্রাচীন যুগ বা প্রথম যুগ (আঃ খ্রী ৯০০—খ্রী ১,২০০) শেষ হয় তুর্ক-আক্রমণে। তারপরে আসে একটা যুগ-সন্ধিকাল—খ্রীষ্টীয় প্রায় ১,২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ১,৩৫০ অব্দ কিংবা খ্রীষ্টীয় ১,৪৫০ অব্দ পর্যন্ত। এ-সময়ে আমরা বাঙলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাই না। তার পূর্বে আমরা পাই 'চর্যাপদ'; আর

বাঙালায় না হলেও সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে লেখা তখনকার বাঙালী কবিদের সাহিত্য-রচনারও প্রচুর পরিচয় সুরক্ষিত রয়েছে। তারপরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে আমরা চৈতন্য-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের প্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি। সে পর্বের প্রধান কবি হচ্ছেন বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপ্‌লাই, হয়ত বা বিজয় গুপ্তও। কিন্তু খ্রীঃ ১,২০০ থেকে খ্রীঃ ১,৩৫০ কেন, প্রায় খ্রীঃ ১,৪৫০ পর্যন্ত আমরা বাঙলা দেশে না পাই কোনো বাঙলা রচনার প্রমাণ, না পাই কোনো অন্যবিধ রচনার নিদর্শন। এজন্য একালকে বলা যায় 'অন্ধকার কাল'।

রাজনৈতিক হিসাবে এই কালটা হল তুর্ক-আক্রমণের ও তুর্ক-বিজয়ের কাল—আর এটা সামাজিক 'আপৎকাল'। এই দেড়শ' বা আড়াই শ' বৎসর বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার কাল হলেও একটা যুগসন্ধি-কাল। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য এ সময়ের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে যখন আবার পঞ্চদশ শতকে দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, শ্রীরাম পাঁচালীতে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে, চণ্ডীমঙ্গলে ও পদ্মাপুরাণে তখন বুঝতে পারি আমরা মধ্যযুগে পদার্পণ করেছি। এদিকে এই দেড়শ'-দু'শ বৎসরের মধ্যে বাঙলা দেশের জীবন কি ভাবে আবর্তিত-বিবর্তিত হচ্ছিল তা অনুমান করা যায় পরবর্তী সাহিত্য থেকে। অবশ্য বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস—অনেকটাই রাজবংশের ও রাজাদের সিংহাসন লাভ, সিংহাসন হারানোর ইতিহাস। সে ইতিহাস মোটের উপর সুস্থির হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ইংরেজিতে লেখা "বাঙলার ইতিহাস," ২য় খণ্ড)। কিন্তু বাঙালীর সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস অনেকটাই অনিশ্চিত। বলা বাহুল্য, সামাজিক ও বাস্তব জীবনের ছাপ সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে পড়ে পরোক্ষে। সাহিত্য বা শিল্প-বস্তু থেকে তা আক্ষরিক হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল হয়। তথাপি এই সামাজিক হিসাব না জানলে সে সাহিত্যের যথার্থ মূল্যও নিরূপণ করা যায় না।

তুর্ক-বিজয়ের হিসাব

যে কারণে বাঙালী জীবনে বিপর্যয় এল সে কারণটা সুবিদিত। তা প্রধানত রাজনৈতিক—বিদেশীর আক্রমণ ও বিজয়, নূতন শাসক-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও নূতন শাসক-ধর্মের ও শাসক-সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ। তাতে করে যে-বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতি ইতিপূর্বে (পাল ও সেন রাজত্বে) গড়ে উঠ্‌ছিল তার গড়ার পথে বাধা পড়ল।

খ্রীষ্টীয় ১,২০০ অব্দ শেষ হতে না-হতেই বাঙলার উপরে তুর্ক-আক্রমণের সে ঝড় ভেঙে পড়ে। দিল্লীতে তখন তুর্ক-সুলতানী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিহার জয় ও বিধ্বস্ত করে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করতেও মুসলমান তুর্কদের বিলম্ব হল না। সম্ভবত নদীয়া খ্রীঃ ১,২০১ বা ১,২০২তে বিজিত হয়। লক্ষণ সেন অবশ্য পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গে গৌড় ও পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) বহু রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন তখন পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গ থেকে কামরূপে চলে যান, তা অনুমান করা যেতে পারে। আরও প্রায় এক শত বৎসর কাল নদীনালা পরিবৃত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে সেন, বর্মন্, দেব প্রভৃতি রাজারা স্বাধীন ছিলেন। তখন কামরূপ কামতাও বিজিত হয়নি। অন্যদিকে বিহার ও গৌড় দেশ আক্রান্ত হলে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত পুঁথিপত্র, মূর্তি, পট প্রভৃতি নিয়ে নেপালে পলায়ন করেছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে। কাজেই এই তুর্ক আক্রমণে গৃহচ্যুত বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতি একদিক দিয়ে নেপালের গিরিপথে অগ্রসর হয় তিব্বত চীনের দিকে, অন্যদিক দিয়ে পূর্ব-বাঙলার থেকে আরও কিছু কাল সম্পর্ক অব্যাহত রাখে ব্রহ্ম-আরাকানের সঙ্গে।

কিন্তু তুর্ক-আক্রমণের ফলে বিহারে, গৌড়ে, পশ্চিম বাঙলায় প্রথম দিকে চলল এক ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা, মুসলমান ঐতিহাসিকরা তা সগর্বে উল্লেখ করেছেন। তুর্করা নিজেরাও ছিল দুর্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর জাতি; তার পরে ইস্‌লাম গ্রহণ করে নব ধর্মোন্মাদনায় তাদের

নৃশংসতা ও ধ্বংস-প্রবৃত্তি বেড়ে গেছল। যা মুসলমান ধর্মে নেই তাই তাদের বিবেচনায় ভ্রান্ত ; বিশেষ করে আবার হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবদেবী, শাস্ত্র, শিল্পকলা, সংস্কৃতি। কাজেই, যেখানে তারা বিজয়ী হল সেখানে তারা রক্তে ও আগুনে পৌত্তলিক বৌদ্ধ ও হিন্দু-সংস্কৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত করতে কোনো দ্বিধা বোধ করেনি, এ তাদেরই কথা।

মনে রাখতে পারি—তুর্ক বা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী বিজেতারাই শুধু নয়, মধ্যযুগের কোনো জাতি ও কোনো বিজয়ী ধর্মই এরূপ সার্বিক ধ্বংসকে অন্যায় মনে করত না। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের পরেও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা বিজিতদের জাতি-কে-জাতি ধ্বংস করতে এর থেকে কম নৃশংসতার বা কম বর্বরতার পরিচয় দেয়নি। পেরু ও মেক্‌সিকোতে স্পেনীয়দের, আমেরিকায় ব্রিটিশদের, আফ্রিকায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের ধ্বংস-লীলার কথা আমরা মনে রাখতে পারি (আর, এ বর্বরতা কি একেবারেই লোপ পেয়েছে ?)। সে তুলনায় বিজয়ী তুর্করা বা বিজয়ী মুসলমান ধর্ম তো বরং ভালোই মনে হবে।

প্রায় পাঁচশত বৎসর মুসলমান রাজা ও সম্রাটরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। তথাপি ভারতবর্ষে "হিন্দু" নাম লোপ করা তো দূরের কথা, মুসলমানরা ভারতবর্ষে সংখ্যায় এক তৃতীয়াংশও হতে পারেনি (যেসব বিশেষ কারণে পশ্চিম পাঞ্জাবে ও পূর্ব-বাঙলাতে তারা সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠে, তা আমরা জানি)। অথচ, সামন্ত যুগে রাজার ও রাজপুরুষদের ধর্মই প্রজা-সাধারণের ধর্মে পরিণত হত। তাই মুসলমান বিজেতারা মরক্কো থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত যেখানেই অগ্রসর হয়ে গিয়েছে সেখানেই অচিরকাল মধ্যে দেশবাসীও ইস্‌লাম ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ পাঁচশত বৎসরেও ভারতবর্ষে তা সম্ভব হল না। এর কারণ, প্রথমত, ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড, জনবহুল এবং সহন-ও-গ্রহণপটু বিচিত্র সভ্যতার

দেশ, দু-এক শতাব্দীতে তার পারাপার পাওয়া সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, বিজিত ভারতবাসীও নিজেদের সভ্যতার সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচনা করতে পেরেছিল; বাঙালীর এই প্রতিরোধেরই প্রধান হাতিয়ার হল মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য। আর তৃতীয়ত, বিধর্মী বিজয়ীরা তাড়াতাড়ি প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি মুছে ফেলে দিতে না পারাতে এ-দেশে বসবাস করতে গিয়ে ক্রমে নিজেদের সেই সর্বধ্বংসী মূঢ়তা ও ধর্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষ অনেকটা খুইয়ে ফেলল; এমন কি, পরস্পরের জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতিকেও ক্রমে কতকটা মেনে নিলে। তাই মুসলমান সুলতানরাও ক্রমে বাঙলা রচনায় উৎসাহ দিতে থাকেন। প্রধানত প্রতিরোধমূলক হলেও বাঙলা সাহিত্য তাই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সময়ে সময়ে বঞ্চিত হয়নি।

মধ্যযুগের বাঙালা সাহিত্যে এই তুর্ক-আক্রমণের ধ্বংসচ্ছায়া ও তারপর হিন্দু-বাঙালীর প্রতিরোধ-রচনা এবং মুসলমান বিজয়ীদের ক্রমিক রূপান্তরের ও বাঙালীত্ব লাভের পরিচয় লাভ করা যায়।

তুর্ক-বিজয়ের প্রাথমিক রূপটি ছিল ধ্বংসের রূপ। উচ্চবর্গের বহু জ্ঞানী ও মানী যাঁরা পলায়ন করেননি তাঁরা অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দান করেন, অনেকে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান—অর্থাৎ সংস্কৃতির শীর্ষস্থানীয়রা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে বস্‌লেন। মন্দির ভগ্ন হল, বিগ্রহ চূর্ণ হল, মঠ-বিহার ভস্মসাৎ হল। পুঁথিপত্র, শাস্ত্র, শিল্প আগুনে সব ছারখার হয়ে গেল। দেব-মূর্তি, পূজার বিগ্রহ গৃহস্বামীও পুরোহিতেরা ভয়ে জলে বিসর্জন দিলে। এই হচ্ছে তখনকার আক্রান্ত নগরের সাধারণ চিত্র। মগধের বৌদ্ধ বিহার (নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, প্রভৃতি) ধ্বংসের কথা জানা যায়। বাঙলায় যা ঘট্‌ল তার সাক্ষ্য বেশি নেই। পরবর্তী বাঙালা পুঁথি 'শূন্য-পুরাণের' (১৮শ শতকের রচনা) অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুখা' থেকে আমরা ওড়িষ্যার ধ্বংসলীলার কথা জানতে পারি। সম্ভবত সে

চিত্রটি ফিরুজ্‌শাহ-তুঘ্‌লকের ওড়িষ্যার সমুদ্রতীরস্থিত নগর কোনারক-ধ্বংসের চিত্র। কিন্তু শুধু এক কোনরক নয়, ছোট বড় অনেক কোনারকের ধ্বংস-স্মৃতি তাতে সুরক্ষিত।

বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই আক্রমণের প্রাথমিক ধ্বংসকাণ্ডের শেষেও শান্তি অনেকদিন এল না। প্রায় দেড়শত বৎসর, খ্রীষ্টীয় ১,৩৫০ পর্যন্ত গেল দুর্যোগের দিন। তারপরে (১৩৫০শর পরে) সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ গৌড়ে একটী স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন—সে রাজবংশও বেশি দিন স্থায়ী হল না। গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে সুলতামদের হাব্‌সী রক্ষী-দলের নেতারা, নব নব তুর্ক ও পাঠান ভাগ্যান্বেষীরা, আর আমীর ওম্‌রাহ্‌ সেনাপতিরা জুয়া খেলতে লাগ্‌ল। কে কখন তা পায় ও হারায় তার ঠিকানা নেই। দৃঢ় রাজ শক্তির অভাবে এ অবস্থায় দেশ জুড়ে অরাজকতা বিস্তার লাভ করল। কিন্তু দুর্যোগ আপনার নিয়মেই কেটে আসছিল,—আর তা কেটে গেল যখন খ্রীঃ ১৪৯৩ সালে হোসেন শা গৌড়-সিংহাসন লাভ করলেন। যথার্থই তিনি হয়েছিলেন 'বাঙালীর সুলতান!' রাজনৈতিক বিরোধের কারণ তাতে চলে যায়। ততক্ষণে বাঙালীরও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের নতুন বনিয়াদ প্রায় রচিত হয়েছে।

সামাজিক বিবর্তন

বিদেশীয়, বিধর্মীর রাজ্যমধ্যে বসবাস করে সেদিনের (খ্রীঃ ১,২০০—খ্রীঃ ১৪৫০) হিন্দু জনসাধারণ যে সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে তা একদিকে যেমন কঠিন, অনমনীয়, বহি-র্বিমুখ, অদ্ভুত কথা এই যে, অন্যদিক থেকে তা তেমনি আঘাতে নির্বিকার, সহনপটুত্বে আসাধারণ। ধর্মই মধ্যযুগের সংস্কৃতির প্রধান কথা; শুধু ভারতবর্ষ নয়, ইউরোপের মধ্যযুগ সম্বন্ধেও একথা সত্য। ধর্মের কোন না কোন একটা তত্ব ও বিধানের সঙ্গে জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি প্রধান ক্ষেত্রই

সে যুগে জড়িত থাকত। তখন পর্যন্ত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular state) ছিল অজ্ঞাত, ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজও ছিল প্রায় অসম্ভব। ইস্‌লাম ছিল মধ্যযুগের তুর্ক-মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধর্ম। সে হিসাবে ইসলাম ধর্মের ও (তুর্ক-আরবী-ফারসি) ইসলামী সংস্কৃতির জয় ছিল দুর্নিবার। তা ছাড়া নানা সূফী, ফকির, দরবেশ এবং গোঁড়া পীর ও প্রচারক ইসলামের বাণীকে বহন করে এনে সমাজের বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। রাজশক্তির ও ধর্মপ্রচারকের এই দুই দিককার আক্রমণের থেকে শাসিত-সমাজ ও শাসিত সংস্কৃতিও আপনাকে রক্ষা করতে চাইল দুই ক্ষেত্র থেকেই সামাজিক শক্তিকে পুনর্গঠন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আয়াজনকেও সংগঠিত করে; না হলে তা শাসক-সংস্কৃতির মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্মের বিলোপ

তুর্ক-আক্রমণে যা প্রথমত ঘটল তা হচ্ছে হিন্দু-বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের পূর্ণ সংযোগ। অবশ্য এর ফলে প্রকাশ্যত বৌদ্ধ সম্প্রদায়েয় বিলোপই ঘটল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বিলোপের পথে এগিয়ে আসছিল অনেকদিন থেকেই। যে বাঙলার ৭ম-৮ম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রসার ছিল, তার স্মৃতি থেকেও এর পূর্বেই জৈনধর্ম মুছে যাচ্ছিল। বৌদ্ধধর্মও তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়ে তান্ত্রিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে,—'চর্যাপদে' তা দেখছি। তুর্ক-আক্রমণ তার এই বিলোপ আরো দ্রুত ও সুনিশ্চিত করে দিলে। পশ্চিম বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম আত্মগোপন করলে জনসমাজের নানা লৌকিক পূজা-আচারের মধ্যে—অবশ্য সে সব কোনো কোনো পূজা-আচারের মূলও ছিল প্রাক্-আর্য জীবন-যাত্রায় ও ধর্ম-আচরণে। পূর্ববঙ্গে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম এরূপভাবে হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশে গেল না। সেখানে বৌদ্ধ জনগণ স্বতন্ত্র ছিল, হয়ত হিন্দু সমাজে অপাংক্তেয় ও নিপীড়িতও হয়েছে। তাই পরবর্তী কালে ইসলাম

ধর্ম গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধা করেনি—যেজন্য পূর্ববঙ্গ মুসলমান-প্রধান দেশ হয়ে উঠল সকলের দৃষ্টির অগোচরে পরবর্তী দু'তিন শতাব্দীতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বৌদ্ধধর্ম মগ-বর্মীদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে।

উচ্চবর্ণের বিপর্যয়

কিন্তু সর্বপ্রধান কথা—তুর্ক-বিজয়ে পূর্বেকার হিন্দু অভিজাত ও উচ্চবর্ণের শাসকশ্রেণী আর শাসক পর্যায়ে রইল না—তারা রাষ্ট্রমধ্যে শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হ'ল। এ কথা ঠিক যে, অভিজাতদের অনেকেই আপনাদের সম্পত্তি ও মর্যাদা একেবারে হারাল না, এবং কালক্রমে তারা বিজেতাদের সহকারী, মন্ত্রী, সেনাপতি, বৈদ্য, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি রূপে খেলাত-খেতাবও পেল। কিন্তু প্রথম দিকে যা ঘটল তা হচ্ছে পূর্বতন এই হিন্দু শাসক শ্রেণীর অধোগতি, নিজেদেরই শাসিত ও শোষিত শ্রেণীর পার্শ্বে গিয়ে তারা দাঁড়াতে বাধ্য হল।

আপস রফার দিক

এই শাসক শ্রেণী ছিল প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু। নিজেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, শাস্ত্র-পুরাণ ও আচার-নিয়মেয় দর্পে তারা নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের জনসারণের জীবনযাত্রা, ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা, আচার-নিয়মকে এতদিন ঘৃণাই করে এসেছিল। কিন্তু তুর্ক-বিজয়ে উচ্চবর্গ থেকে অধোগতি ঘটতেই তাদের পক্ষে এই 'ছোট জাতদের' লৌকিক দেবদেবী ও কথা-কাহিনীকে আর অবজ্ঞা করে তত দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না। সর্প-দেবী মনসা ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, কচ্ছপরূপী (?) ধর্মঠাকুর ও লাউসেনের কীর্তিকথা, ভয়ঙ্করী বনদেবী ও তার ভক্ত কালকেতু-ব্যাধের কথা, শ্রীকৃষ্ণ নামের আড়ালে গ্রাম্য প্রণয়ীর গোপ-বধূদের সঙ্গে লীলাবিলাস, ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের যে কথা সিন্ধু, পাঞ্জাব, গুজরাত পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে আছে—এ

সকলের উদ্ভব-ক্ষেত্র ছিল মূলত এই নিম্নবর্গের ও নিম্নবর্ণের লোক-জীবন। এইগুলিই বাঙলার নিজস্ব জিনিস, বাঙলা সাহিত্যের লব্ধ Matter of Bengal. ইতিপূর্বেই হিন্দু সভ্যতার অনেক কিছু এই নিম্ন শ্রেণীও গ্রহণ করে এসব পূজা ও কাহিনীর ক্রম-পরিশোধন করছিল। তবু উচ্চবর্গের হিন্দু তা শাস্ত্রে, পুরাণে তখনো গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু এখন সেই রাষ্ট্র-শাসন হারাবার পরে ক্রমশই এইসব কাহিনীকে এই উচ্চবর্ণদেরও গ্রাহ্য করতে হল, হিন্দুর সেই অদ্ভুত গ্রহণশক্তির বলে তারা তা মানিয়েও নিলে। এইরূপে চাষী, গাঁজাখোর সেই লৌকিক দেবতা শাস্ত্রোক্ত রুদ্র শিবের সঙ্গে মিশে গেল; ভয়ঙ্করী বনদেবী ক্রমে রণচণ্ডী হয়ে উঠল; গ্রাম্য প্রণয়ী ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে কৃষ্ণমঙ্গলের বিষয় হয়ে গেল। হিন্দু শাসক শ্রেণীর ও হিন্দু শাসিত শ্রেণীর একটা সাংস্কৃতিক আপস-রফা এরূপে ধীরে ধীরে সংঘটিত হল। অবশ্য বিনা সংঘর্ষে তা হয় নি, আর তা দু'এক শত বৎসরেও শেষ হয় নি,—সমস্ত মধ্যযুগ ধরে তা চলেছে। কিন্তু লৌকিক কৃতির ও উচ্চবর্গের সংস্কৃতির এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও এই আপস-রফা দুই বর্গের সামাজিক নৈকট্যের ও আপস-রফার জন্যই সম্ভব হল,—আর তুর্ক-বিজয় হিন্দু উচ্চবর্গকে ঠেলে নীচে নামিয়ে দেওয়াতে এই আপস-রফা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

অপরদিকে বাঙলার এই লোক-সাধারণ মূলতও আর্যভাষী ছিল না, আর আর্যভাষা গ্রহণ করলেও ততদিন পর্যন্ত তারাও হিন্দু-আর্য সংস্কৃতির উচ্চতর বস্তু থেকে বঞ্চিতই ছিল। শাস্ত্র চর্চা, জ্ঞানাহরণ, তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; সংস্কৃত কাব্যের রসাস্বাদন ছিল অসম্ভব (যদিও কবি ধোয়ী সম্ভবত তন্তুবায় বা রজক ছিলেন)। কাজেই সামাজিক হিসাবে এই সব অন্‌-আর্য কোম বা উপজাতিগুলি (পুণ্ড্র, পুঁড়, বাগদী, শবর, ব্যাধ, হাড়ি, ডোম) তাদের কৌম (tribal) জীবনযাত্রা খুইয়ে হিন্দু সমাজের প্রান্তে শুধুমাত্র এক-একটা

স্বতন্ত্র জাতিতে (caste) পরিণতি লাভ করছিল। হিন্দু উচ্চবর্গের দ্বারা অবহেলিত হয়ে চলিত বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু তারা গ্রহণ করে এক ধরণের 'লৌকিক বৌদ্ধধর্ম' নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করছিল। কিন্তু এখন উচ্চবর্ণের বর্গচ্যুতিতে এইসব জাতি হিন্দু পুরাণ-কাহিনীর আখ্যায়িকা প্রভৃতি গ্রহণ করবার অধিকতর সুযোগ লাভ করলে। ইস্‌লামের জনপ্রিয়তা ও প্রচারের থেকে তাদের রক্ষা করার প্রয়োজনেই হিন্দুর পুরাণ প্রভৃতিরও বহুল প্রচার পাঁচালী, নাট ও কথকতার মারফত আরম্ভ হয়। সেই শাস্ত্র-বাঁধা হিন্দু ধর্মকে তারা আবার নিজেদের মত করে ক্রমে ক্রমে একটা লৌকিক হিন্দু ধর্মেও পরিণত করে নিলে। বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হতে হতে যা ছিল 'লৌকিক বৌদ্ধধর্ম'—তার স্থান গ্রহণ করলে 'লৌকিক হিন্দুধর্ম।'

সংরক্ষণ কৌশল

ভাগ্যবিপর্যয়ে শাসন ও প্রতিষ্ঠা হারালেও সমাজ ও সভ্যতার খাতিরেও হিন্দু উচ্চবর্ণ কিন্তু দেশের নিম্নবর্ণের সঙ্গে একেবারে হাতে হাত ধরে একত্র দাঁড়াতে পারল না; সম্ভবত সেরূপে দাঁড়াতে তারা প্রস্তুতও ছিল না। অথচ দুর্ধর্ষ বিদেশী শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ রচনা করতে হলে শাসিতদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল এইরূপ সর্বশ্রেণীর ব্যাপক ঐক্য গঠন। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদে সে ঐক্য বরাবরই সুদূর ছিল। হিন্দু-সমাজের বর্ণভেদের মূল উদ্দেশ্য ও কাজ ছিল শাসক-শ্রেণীর অধিকার, তাদের শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতিকে সনাতন ধর্ম ও ঐতিহ্যের নামে একেবারে পাকা করে রাখা। রাজশক্তি হারালেও রাজ্যচ্যুত উচ্চবর্ণ এ সব সামাজিক অধিকার এখন ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন কেন? বরং সামাজিক পদ-প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-সুবিধাই তখন তাঁরা আরও আঁকড়ে ধরলেন। সমাজ-শাসনে তাঁদের কর্তৃত্ব তাঁরা অব্যাহত রাখতে আরও সচেষ্ট হলেন। রাজশক্তি যখন হাতে নেই, তখন আত্মরক্ষার

অর্থ হল সমাজ-রক্ষা, এবং সমাজের ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতিকে ম্লেচ্ছধর্ম ও আচার-নিয়ম থেকে রক্ষা।

সেদিন রাষ্ট্র অপেক্ষাও সমাজ ছিল বেশি সচল জীবন্ত জিনিস। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা ঐক্যবদ্ধ সমাজ ছাড়া সম্ভব নয়। বিজিত হিন্দু সমাজের এই প্রতিরোধ তাই রাজনৈতিক প্রতিরোধ-রূপে ততটা প্রকট হয়নি। বরং রাজনৈতিক পরাজয় মেনে নিয়েই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা অধিকতর মনোযোগী হলেন। এইদিকে তাঁরা অদ্ভুতরূপে সার্থকও হলেন।

হিন্দুর প্রচলিত বর্ণভেদের নীতি অনুসরণ করেই এই উচ্চবর্ণের সমাজ-শাসকেরা সমাজের প্রতিরোধ-কেন্দ্র রচনা করতে আরম্ভ করলেন। 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবনের' সমস্ত সম্পর্ক থেকে সযত্নে তাঁরা দূরে রাখতে লাগলেন নিজেদের। যে-কেউ ম্লেচ্ছাচারে দুষ্ট হলে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারও যবন-সংসর্গ ঘটলে, তার আর মার্জনা নেই। হিন্দু সমাজ তাকে তৎক্ষণাৎ নির্মমভাবে বর্জন করবে। প্রচলিত আচার-ধর্মও তাই এ সময়ে আরও শক্ত, আরও অনড়, আরও কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। প্রচলিত বর্ণভেদে তখনো পর্যন্ত যেটুকু অবকাশ ছিল—যেটুকু নমনীয়তা ছিল বিবাহে, ক্রিয়া-কর্মে তখন পর্যন্ত,—তাও এবার বন্ধ হল। আহারে, বিবাহে, ক্রিয়াকর্মে প্রত্যেক জাতি এখন থেকে গণ্ডীবদ্ধ ও পৃথক হয়ে রইল। যারা মিলেমিশে এক জাত হয়ে উঠতে পারত তেমনিতর নিম্নবর্ণের ছোট ছোট কোম বা জাতগুলো পর্যন্ত এর ফলে এক-একটা স্বতন্ত্র জাত হয়ে উঠল। অবশ্যই উচ্চবর্ণ রইল উচ্চ, নিম্নবর্ণেরা রইল নিম্ন, অনাচরণীয়, আর 'নবশাখরা' মধ্যখানে সুনির্দিষ্ট স্থান দখল করে রইল পৃথক। এই জাতের প্রাচীর ভেঙে মুসলমান ধর্মের সামাজিক সাম্য বা আচার-নিয়মের সাধ্য কি প্রবেশ করে, আর সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদ ঘুচিয়ে দেয়?

সাংস্কৃতিক সংগঠন

এই সামাজিক প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই চল্‌ল সাংস্কৃতিক সংগঠনও—তার একটা স্থূল অংশমাত্র সেই উচ্চ-নীচ সংস্কৃতির বা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতাদের আপস-রফা। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আপস-রফা করলেন বাধ্য হয়ে, কিন্তু নিজেদের শাসক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করতে লাগলেন নিজেদেরই উদ্যোগে—সমস্ত শক্তি দিয়ে। রাজশক্তি অবশ্য তাদের হাতে নেই; কিন্তু ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি ছিল পল্লী-কেন্দ্রিক। দূরবর্তী ছোট ছোট পল্লীতে অনেকখানেই হিন্দু সামন্তরা তুর্কদের রাজনৈতিক বশ্যতা মেনে নিয়ে আপনার ধন-সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পল্লীর জীবন-যাত্রা রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। উচ্চবর্ণের সামাজিক কর্তৃত্ব সেখানে অব্যাহতই ছিল। এই সমাজ-নেতৃত্ব ও সামন্ত-শক্তিকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণরা খৃঃ ১২০৪এর পরে এক-দেড় শতাব্দীর মধ্যেই আবার নতুন করে সাংস্কৃতিক সংগঠনে উদ্যোগী হলেন। মিথিলার শাস্ত্রচর্চা শেষ হল না। দেখতে দেখতে নবদ্বীপের অভ্যুদয় ঘটল। চৈতন্য-দেবের জন্মকালে (খ্রীঃ ১৪৮৫) তাই দেখি নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, রামকেলি প্রভৃতি এক-একটি বিদ্যাকেন্দ্র শাস্ত্রচর্চায় মুখরিত, দেশ-বিদেশে নব্যন্যায়ের খ্যাতি, আর কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য সেই বাঙালী উচ্চবর্ণের! চৈতন্যের পরিকরদের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারি। এর পিছনে যে অন্তত এক-আধ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগেরই একটা দিক হল পৌরাণিক কাহিনীর বাঙলায় পরিবেশন। তুর্ক-আক্রমণে সব কিছু বিপন্ন হলে সমাজের সাধারণ মানুষদেরও সনাতন ধর্মের সাধারণ সত্যগুলো জানানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নইলে সুফী, দরবেশ প্রভৃতি প্রচারকদের সামনে সেই জনসমাজ ভেসে যেত। এ উদ্দেশ্যে পুরাণের

অনুবাদ—বিশেষ করে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের লোকচিত্ত-*চমৎকারিণী অমর উপাখ্যানগুলির লোক-বোধ্য ভাষায় পরিবেশন* —কর্তব্য হয়ে ওঠে। সম্ভবত, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিদের পূর্বেও গ্রাম্য পাঁচালীতে এই সব আখ্যায়িকার রসাস্বাদন করছিলেন বাঙালী জনসাধারণ, উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবর্ণ সকলেই,—এমন কি, মুসলমান শাসনকর্তারা পর্যন্ত। তাই হোসেন শাহ্ ও তাঁর সেনাপতি পলাগল খাঁ হয়ে ওঠেন এই বাঙালী কবিদের পৃষ্ঠপোষক। ব্যাপারটা বুঝবার মত—হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি কোনো আধুনিক ভাষায় কৃত্তিবাসের পূর্বে রামায়ণ কাহিনী রচিত হয় নি (তুলসীদাসী রামায়ণ শতখানেক বৎসর পরে রচিত হয়); সঞ্জয়ের (বা কাশীরাম দাসের) মহাভারতের মত মহাভারত অন্যান্য দেশে আর নেই; মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মত ভাগবতও সেখানে পরিবেশিত হয় নি। বাঙলা সাহিত্যে যাকে বলে Matter of Sanskrit এগুলি তার প্রধান অবলম্বন। অন্য ভাষার তুলনায় বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য তাই অনেক বেশি সংস্কৃত-আশ্রয়ী হয়েছে, এটিও প্রতিরোধ-প্রয়াসেরই ফল।

বিজেতার স্বাজাত্য-লাভ

আসলে ততদিনে (খ্রীঃ ১,৪৫০এর পরে) আর একটি বড় সামাজিক বিবর্তনও প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এই মুসলমান সুলতান ও তাঁর সেনাপতিদের বাঙলা-পরিপোষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এঁরা অনেকাংশেই বাঙালী হয়ে গিয়েছেন। কাজেই মুসলমান শাসক-শ্রেণীও আর বাঙলা সাহিত্য কিংবা এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়াসের বিরোধী নন। এমন কি, শাসক-শ্রেণীর এই স্তরে শুধু মালাধর বসু বা রূপসনাতম নন, ভাগ্যবান হিন্দুরাও অনেকেই স্থান লাভ করেছেন (দ্রষ্টব্য ঃ সুকুমার সেন, 'মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী')। তখনো সময়ে-অসময়ে ইস্‌লামের নাম করে অবশ্য

কাজী বা কোনো মুসলমান শাসনকর্তা হিন্দুর উপর অত্যাচার করত, সমস্ত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সে অত্যাচার হচ্ছে অনেকাংশেই মধ্যযুগের সামন্ত শাসকের অত্যাচার; হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইসলামের কোনো নিয়মিত জেহাদ নয়। আসলে, মুসলমান শাসক-শ্রেণীর মধ্যেও এ পরিবর্তন ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কারণ ধ্বংসের যুগেও তুর্করা এদেশে বসবাস করে। এদেশেই স্ত্রী গ্রহণ করে। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা নিশ্চয়ই বাঙলা জানতেন। আবার, তাঁরাও বিবাহ করেন এদেশেরই কন্যা। এঁদের বংশধরদের রক্তে সিকি ভাগ কিংবা দু'এক আনি যদি বা তুর্ক রক্ত থাকে, কয় পুরুষের মধ্যে তা দু'এক পাইতে গিয়ে ঠেকে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য তা হলেও তাঁরা নিশ্চয়ই ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে চর্চা করতেন আরবী, আর দরবারী ব্যাপারে চর্চা করতেন ফারসি, এবং হয়ত তখনকার মুসলমান অভিজাতরা (ইংরেজ আমলের এ দেশের খ্রীষ্টান বা ফিরিঙ্গীদের মতই) শাসকধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতিকেই মনে করতেন নিজধর্ম, নিজসংস্কৃতি। তথাপি সাধারণ লোকের সঙ্গে বাঙলা কথা না বলে তাঁদের উপায় কি? তাছাড়া সাধারণ মুসলমান,—সে এ দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানই হোক, কিংবা হোক সাধারণ তুর্ক-সৈনিকের সন্তান—বরাবরই বাঙলা বলত, শুনত বাঙলা পাঁচালী, গান। বেহুলা-লখিন্দর প্রভৃতির "বাঙালী উপাখ্যানের" সঙ্গে জন্ম থেকেই তার পরিচয় ঘট্‌ত। শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যেও এই বাঙালী-স্বাজাত্য ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছিল। তা'ই আমরা দরাফ খাঁর (জাফর খাঁ গাজীর, ১৩শ শতক) নামেও পাই সংস্কৃতে লেখা 'গঙ্গা-স্তোত্র'; আর হোসেন শাহ্‌-পরাগল খাঁকে দেখি হিন্দু রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর রসিক। অথচ গোঁড়া না হলেও তাঁরাও খাঁটি মুসলমান ছিলেন। অবশ্য এই মুসলমান উচ্চবর্গেরা প্রধানত যেমন ভক্ত ছিলেন উচ্চবর্গের বিষয়বস্তুর (রামায়ণ-মহাভারতের), নিম্নবর্গের

মুসলমানরা আবার তেমনি মত্ত ছিল মনসামঙ্গল, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতিতে, তাও বুঝ্‌তে পারি।

চৈতন্য-যুগের স্বরূপ

যুগসন্ধিকালের এই অনালোকিত সামাজিক বিবর্তনের পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপ প্রকাশ লাভ করে এই হোসেন শাহ-এর কাল থেকে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও বাঙলা সাহিত্যের চৈতন্য পর্বে (খ্রীঃ প্রায় ১,৫০০—খ্রীঃ ১,৭০০)। তখনই মধ্যযুগের বাঙালীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তাঁর ধর্মে ও সাহিত্যে শান্তসুন্দর সার্থকতা লাভ করে। বাঙালী সমাজের উচ্চস্তরে তখন যে ম্লেচ্ছাচার দেখা দিয়েছে—বৃন্দাবন দাস যার উল্লেখ করেছেন—চৈতন্যদেবের প্রচারের একটা উদ্দেশ্য ছিল তা রুদ্ধ করা, হোসেন শাহ্ প্রভৃতি সুলতানদের উদার ধর্ম-সহিষ্ণুতার বিরুদ্ধাচরণ না করে, শুধু নবদ্বীপের কাজীর মত ধর্মান্ধদেরই বাধা দেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আপামার সাধারণ উচ্চ-নীচ সকলকে ভক্তিধর্মে ও নাম-ধর্মে একত্রিত করা। এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফল সুস্পষ্ট। উচ্চবর্ণের ও নিম্ন-বর্ণের মধ্যে হিন্দু সংযম, সদাচার প্রভৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল; বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষা দর্শন, কাব্য প্রভৃতির চর্চা সুপ্রসারিত হল; আর এই ভাব-লোকের (স্থূলত ও মূলত যা হিন্দু) উপর স্থাপিত হল বাঙালা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতির বনিয়াদ। সাধ্য নেই বাঙলা সাহিত্য পরবর্তী কালেও আর তার এই ভাবলোককে একেবারে ত্যাগ করে যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেক্ষাপট এই ভারতীয় হিন্দুত্বের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট।

অবশ্য এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, বৈষ্ণব ভাবাদর্শের মধ্যে, সেই ভক্তিবাদের মধ্যে, ইসলামের বিরুদ্ধেও বিরোধিতা নেই—সমস্ত

হিন্দু প্রতিরোধের মূল লক্ষ্যটা পূর্বাপর ছিল ঘর-সমলানো,—পর-আক্রমণ নয়। বড় জোর যা সে চেষ্টা করেছে তা হচ্ছে অসহযোগ, অপর ধর্মের অস্তিত্ব বিষয়েও নীরবতা। সমস্ত মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যে কোথাও তাই মুসলমান ধর্ম, মুসলমান জীবন যাত্রার চিত্র প্রায় পাওয়া যায় না। অথচ মুসলমানদের শক্তি, ধর্ম, সংস্কৃতির মর্যাদা তখন কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল। চৈতন্যদেব দুই সম্প্রদায়ের সমন্বয় করার অপেক্ষা মনে হয় শান্ত প্রতিরোধ ধারাকেই রূপদান করেছেন; হিন্দু সংস্কৃতি সদাচার, নিয়ম সংযম প্রভৃতিই দৃঢ়তর করেছেন। সত্য বটে চৈতন্যদেব যবন হরিদাসকেও আপনার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যবন হরিদাস আর কতটুকু তখন 'যবন' ছিলেন ধর্মে ও আচারে? চৈতন্যদেব ইস্‌লামের একটা বড় গণতান্ত্রিক প্রথাকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজের প্রচার-পদ্ধতিতে—সংকীর্তনে। তাঁর গণতান্ত্রিক ঝোঁকও অবশ্য হিন্দু সমাজের ভেদ-নীতিকে দূর করতে পারেনি।

অথচ যে-সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সে সময় প্রতিরোধের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। বাঙলার শাসকগোষ্ঠী মুসলমান হলেও বাঙালী হয়ে যাচ্ছেন। এমন কি, বাঙলা কবিতার হিন্দু ভাবলোকেও তাঁদের আপত্তি নেই। অবশ্য এই কারণেই এই প্রতিরোধকামী বাঙলা সাহিত্যও মুসলমান-বিরোধী হয় নি। তার প্রতিরোধ-প্রেরণা ধর্ম ও সংস্কৃতিগত, রাজনৈতিক নয়, আক্রমণমূলকও নয়।

বাঙালী জীবনে তারপরে দেখা দিতে থাকে 'নবাবী আমলের' (খ্রীঃ ১৭০০-খ্রীঃ ১৮০০) ভাবধারা। ফারসি বিষয়ও এবার এল বাঙলা সাহিত্যে, তাতে হিন্দু-মুসমানের পৃথক জীবন অনেকটা এক হয়ে উঠেছে,—বিজয়ী ও বিজিতের বিরোধ, কিম্বা তার ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত ব্যবধানের স্মৃতিও তাতে বিশেষ নেই। এদিকে বিশেষ করে দৌলত কাজী ও আলাওলের কীর্তি স্মরণীয়। এঁরা

মুসলমান হয়েও খাঁটি বাঙালী সাহিত্য ঐতিহ্যের ধারার কবি। এই নবাবী আমলের ভাব ও ভাষার সহায়তায় একটা হিন্দু-মুসলমানের সমবেত বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিল। একটা মিলিত জাতীয় সংস্কৃতির জন্ম হতে পারত তখন। কিন্তু তা ব্যাহত হল দু'কারণে। প্রথমত, নবাবী আমল সামন্ততন্ত্রের পতনের যুগ, তাতে সৃষ্টির বীজ বেশি রস পেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সামন্ত যুগের পরে স্বদেশীয় বণিকবিপ্লব না ঘটতেই এল ইংরেজ আমল—ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করলেও রাজ্যচ্যুত বাঙালী মুসলমান রাগ করে তার থেকে দূরে থাকে। বরং তখনি আরম্ভ হয় ওহাবি আন্দোলন ও মুসলমান গোঁড়ামি। আর তাতে বাঙালী হিন্দুর তুলনায় বাঙালী মুসলমান সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে লাগলেন; আলাওল দৌলত কাজীর পথও পরিত্যক্ত ছিল 'কেচ্ছা' লেখকদের নিকটে। আর সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শ্রেণীও নবাবী আমলের হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষীয়মান এই সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবধানকে আপনার ভেদনীতিতে নতুন করে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে লাগল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই নতুন প্রতিরোধের বাঙালা সাহিত্যে এবারও (খ্রীঃ ১৮০০-১৯৪৭ ?) ঠিক সমস্ত বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সৃষ্টি হল না। বরং মুসলমানের অচেতনতার ফলে হিন্দু ঐতিহ্যের প্রভাবই তাতে প্রবল হয়। তা না হলে বাঙলা-বিভাগ হত দুঃসাধ্য। অথচ সত্যই এ সাহিত্য সমস্ত বাঙালীর জাতীয় সম্পদ, তাতে ভুল নেই;—যদিও তার পটভূমি ভারতীয় হিন্দু জীবনের ও সংস্কৃতির, তাতে জাতীয় আত্মপ্রকাশ পরিস্ফুট।

এই হাজার বৎসরের জাতীয় উৎস থেকেই এখনো পূর্ব বাঙলার বাঙালীর ও পশ্চিম বাঙলার বাঙালীর নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা ও উপাকরণ সংগ্রহ করতে হবে। দু' বাঙলার অন্য অখণ্ড

সম্পদ বাঙলা লোক-সাহিত্য। শিষ্ট সাহিত্যের সব যুগ এদিকে সমভাবে ফলদায়ক হবে না। মধ্যযুগের পদ ও মঙ্গল-কাব্যের আর বিকাশ সম্ভব নয়। উনিশ শতকেরও কিছু কিছু জিনিস আজ মনে হবে অবান্তর, তবু অনেক জিনিসই গ্রহণযোগ্য। কারণ, তা আধুনিক সাহিত্যদর্শে গ্রাহ্য;—সাহিত্য তখন ধর্ম ও আচার-নিয়মের বশ্যতা কাটিয়ে এই মর্ত্য জীবন ও মর্ত্য মানুষের মহিমার সন্ধান পেয়েছে। এই হচ্ছে এ যুগের সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমি। আজ দুই বাঙলার লেখকই পুরোনো বাঙলা ঐতিহ্য গ্রহণ করবেন তাকে নিজের নিজের মত করে বিকশিত করবার জন্য। এবং এইখানে দাঁড়িয়েই তাঁরা আবার এই জীবন্ত কালের সত্যকে—জীবন-সত্যকে, মানব-সত্যকে—গ্রহণ করবেন একই সাহিত্যিক প্রক্রিয়ায় তাকে রূপদান করবার জন্য। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই পূর্ব বাঙলার বাঙলা সাহিত্য শুধুমাত্র পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যের প্রতিলিপি হবে না। তাতে পূর্ব-বাঙলার মাটির ও মানুষের আত্মপরিচয় থাকবে—যেমন থেকেছে এতদিন প্রধানত পশ্চিম বাঙলার মানুষের পরিচয় বাঙলা সাহিত্যে। সেই মাটির পরিচয় ফুটে উঠলে এই বাঙলা বিভাগের ট্রাজিডিও একটা সার্থকতায় বিমণ্ডিত হবে; এবং বাঙলা সাহিত্য অখণ্ড না হলেও সমগ্র ও সম্পূর্ণ বাঙলার পরিচয় বহন করবে।

ইং ১৯৩৯

সাহিত্যের ভূমি-সংস্কার

সোবিয়েত সাহিত্যিক সংঘের সভাপতি মঁসিয়ে টিখোনভ্‌কে অকস্মাৎ স্বাগত করতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছিলাম ঃ—আমাদের সাহিত্য-জগতের মূল তথ্যগুলি তাঁকে প্রথম বিজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন। সেই পটভূমিকাতেই তায়পর আমাদের গণ-সাহিত্যের সমস্যা এবং সোবিয়েত সাহিতের সঙ্গে সম্পর্কের কথা মঁসিয়ে টিখেনভ্‌ এর পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য-জগতের মূল তথ্য কী ?

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্য নিয়েই আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ঐতিহ্য। তার মধ্যে প্রাচীনতর ভারতীয় সাহিত্যের বহুধারার বহু উত্তরাধিকার সঞ্চিত আছে ; আবার সেই সঙ্গে অর্জিত হয়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও বিশ্ব সাহিত্যের বহুল বিকশমান ধারার বহুতর দানে আমাদের অধিকার। এই সবই আমাদের আজকের সাহিত্য-জগতের ভিত্তি, এ তথ্য সর্ব-স্বীকৃত। হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই—মঁসিয়ে টিখোনভ্‌এরও তা সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু অধুনিক ভারতীয় যে-কোনো সাহিত্যের পক্ষে মূল তথ্য শুধু এইটুকু নয়। সেই মূল তথ্য এই যে, আমাদের সাহিত্যের এই ভিত্তি-ভূমি যথেষ্ট প্রশস্ত রূপে প্রস্তুত হয় নি, দেশের মাটি থেকে সে কতকাংশে বিচ্ছিন্ন ; বিভিন্ন দেশের তরুলতাও সে মাটিকে এখন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে আপনার করে নিতে পারেনি। এ-রূঢ় সত্য রবীন্দ্রনাথও আপনার কীর্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি করে-ছিলেন, অন্যের কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়া দ্বিতীয় মূল তথ্য আছে, বাঙালা সাহিত্যেরই সম্বন্ধেই তা বিশেষ করে সত্য—বঙ্গ-বিভাগ। এ আঘাত এখনো বাঙলা সাহিত্যকে বিভক্ত করতে পারে নি ; কিন্তু তাতে আত্মতৃপ্তির কারণ নেই। কারণ, এই আঘাতে বাঙলা সাহিত্যের ও বিশেষ করে বাঙ্গালী সংস্কৃতিরই

বিশেষ পরীক্ষা চলেছে। 'দুই রাষ্ট্র এক জাতি, এক সংস্কৃতি' :—বাঙালীর এই অদ্ভুত নিয়তিকে সত্য-সত্যই কি ভাবে কোনো ঐক্যময় মহৎ পরিণতিতে আমরা উত্তীর্ণ করব?—পরীক্ষা তা'ই। সেই পথে আমাদের প্রধানতম আশ্রয় বাঙলা সাহিত্য, তা বলাই বাহুল্য।

পতিত জমি

অবশ্য এরও পিছনে সে-ই প্রথম কথাটিই রয়েছে। আমাদের সাহিত্য যদি সত্যই যতটা কীর্তিতে সমুজ্জ্বল ততটা সর্বত্রগামী হতে পারত তা হ'লে হয়ত হিন্দু বাঙলী ও মুসলমান বাঙালী এত সহজে এই সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক খেলার ঘুঁটি হয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হ'ত না। রবীন্দ্র সাহিত্যের মতই এই বাঙলা সাহিত্যও যে সর্বত্রগামী হয়নি তার একটা কারণ এই যে, এ সাহিত্যে জনতার প্রাণস্পন্দন, তার আশা-আনন্দ-বেদনা-পীড়িত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত নিবিড় হয় নি। এক কথায় যাকে বলা যায় গণ-সাহিত্য, তা হতে পারে নি, অনেকটা জনতার প্রতিনিধি স্থানীয় বিপ্লবী মধ্যবিত্তের সাহিত্য হয়েছে; সে হিসাবে জাতীয় সাহিত্যও হয়েছে, কিন্তু তথাপি তা গণ-সাহিত্য হয় নি। এইটি এ সাহিত্যের চরিত্রের এক দিক। অবশ্য চরিত্রের এই সীমাবদ্ধতার কারণ বাঙালী সাহিত্য-জগতের বাস্তব সীমাবদ্ধতা,—এবং সেইটাই অন্যদিক। অর্থাৎ এ সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শিক্ষিত না হলে অবশ্য সাহিত্যের পাঠক হওয়াই সম্ভবপর নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাট্যকলা, প্রভৃতি সংস্কৃতির অন্য দুই একটি বিভাগের সমঝদার বা কৃতী তথাকথিত অশিক্ষিতরাও হতে পারেন। সে দিকে সাহিত্য মন্দ-ভাগ্য;—সে সর্বত্রগামী নয়। আরও দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে শিক্ষা এখনো অত্যন্ত সংকুচিত। শতকরা ত্রিশজন লোকও এদেশে অক্ষরজ্ঞান লাভ

করেন নি। আর যাঁরা তথাকথিত 'সাক্ষর' তাঁদের মধ্যেও ক'জন সত্যই 'শিক্ষিত', অর্থাৎ সাহিত্যের পাঠক হবার মত শিক্ষা লাভ করেছেন, আর ক'জনেরই বা তারপরে জোটে সাহিত্য পাঠের সুযোগ, সাহিত্য-ক্রয়ের মত উপার্জন? এভাবে হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে—শতকরা ২ থেকে ৩ জন মাত্র বাঙালী বাঙলা সাহিত্যের পাঠক শ্রেণী বলে গণ্য হতে পারেন, ক্রেতারা নগণ্য। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এই পাঠক শ্রেণীকেই মনে রেখে সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন; এবং যাঁরা জন-সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁরাও এই ক্ষুদ্র বালুস্তরের মাধ্যমেই আশা করেন জনতার নিকটে আপনাদের বক্তব্যকে পৌঁছতে। বাঙলা সাহিত্যের বাস্তব পরিধি এই শতকরা ৩।৪ জন। তাদেরই আশ্রয় করে বাঙলার সাহিত্যিক জগৎ। কাজেই এ সাহিত্যের ভিত্তি এখনো এতটা সাধারণের জীবন থেকে আল্‌গা মনে হয়। কারণ, সাধারণ বলতে শতকরা পঁচানব্বইজন, তাদের অবজ্ঞা করা চলে না। এমন কি, এ কালের ভারতীয় সংবিধান আইনেও তাদের এ অধিকার স্বীকৃত। এই সাধারণের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন সেখানে নিরক্ষর—অর্থাৎ পতিত জমি। যতক্ষণ এ ভূমি সংস্কার না হয়, ততক্ষণ কি করে আশা করা সম্ভব শস্যের প্রাচুর্য, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সাহিত্যের সহজ বিস্তার, সৃষ্টির বিকাশ?

এ জন্যই বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে আজ আমাদের প্রধান দাবি—চাই সাহিত্যের এই ভূমি-সংস্কার,—পতিত জমির উদ্ধার; আর সাহিত্য-ভূমির প্রস্তুতি,—নিরক্ষরতার অবসান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার।

কিন্তু প্রশ্ন হবে—নিরক্ষরতার অবসান ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা—এ দাবি তো দেশেরই একটি মৌলিক দাবি। তাহলে তা আবার বিশেষ করে সাহিত্যিকদের দাবি, এবং গণ-সাহিত্যবাদীদের দাবি বলে ঘোষণা করায় বিশেষত্ব কোথায়?

নামে স্থখমস্তি

বিশেষত্ব না থাক, সাহিত্যের দিক থেকে এ স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে। যা জনসাধারণের মৌলিক দাবি, তা যে সাহিত্যেরও মৌলিক দাবি, এই সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জন-জীবনের স্বার্থ ও সাহিত্যের বিকাশ একই সূত্রে গ্রথিত। চীনের জনায়ত্ত প্রজাতন্ত্র তাঁদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে—নিরক্ষরতার অবসান; এ নিরর্থক নয়। একথা তাঁরাও জানেন যে, দেশের মানুষের মামুলী প্রাথমিক শিক্ষালাভ হলেই যে, সাহিত্য ফুলে ফলে অমনি বিকশিত হয়ে উঠবে তা নয়। এমন কি পাশ্চাত্য বহু দেশের দিকে তাকালে একথাও বুঝতে পারি, সেই মামুলী শিক্ষার ফলে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাও অনেক সময়ে স্বচ্ছ হয় না, বরং কুশিক্ষায় তা আরও মলিন হতে পারে। কারণ শিক্ষাও শাসক শ্রেণীর হাতে তাদের স্বার্থ উদ্ধারের নূতন কৌশল হয়। জনতার মূল শিক্ষালয় জনতার সংগ্রাম, আর্থিক-সামাজিক স্বরাজের প্রয়াস। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জনতাকে গ্রহণ করতে হয় তার রাজনৈতিক শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান ও লেখাপড়ার প্রাথমিক অধিকার আয়ত্ত থাকলে মানুষের পক্ষে এই সংগ্রামের শিক্ষাকে আরও সহজে আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয়; স্পষ্ট করে মানুষ বুঝতে পারে জীবনের এই রূপ ও নির্দেশ—সাহিত্যের মধ্য থেকেও। তাই সর্বদেশের শাসকশ্রেণী বরাবরই তাদের শাসিত জনসাধারণকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চেয়েছে। যখন তা অসম্ভব হয়েছে তখন পেতেছে কতকটা শিক্ষার সঙ্গে অনেকটা অ শিক্ষা ও কু-শিক্ষার জাল। সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত ভারতবাসীর পক্ষে এ সত্যটা বোঝা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তাই জনতা যেখানে শাসন ক্ষমতা লাভ করে সেখানে সে প্রথমেই চালিত করে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান—তার প্রমাণ দেখেছি সোবিয়েত

ভূমিতে; এখন দেখছি তা নূতন চীনে। আর, কেন ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান আজও প্রায় অবহেলিত, তা-ও তাই আমাদের পক্ষে বুঝা দুঃসাধ্য নয়। স্বাধীন ভারতের শাসন জনায়ত্ত হয়নি।

কথা হবে, সাহিত্যের নামে এ 'রাজনৈতিক প্রোপাগণ্ডা' কেন? সংক্ষেপে তার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ শতকরা দু' জনের বা তিন জনের জন্য যে সাহিত্য আমরা রচনা করেছি, তাতে সাহিত্যের সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়ে আছে; এবং বৃহৎ জনসমাজের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্বচ্ছন্দ না হলে কোনো সাহিত্যের বিস্তার ও বিকাশ সম্ভব নয়। শতকরা আশী জন যদি আমার লেখা পড়তেই না পারে তা হলে আমার লেখার প্রধান একটা পরীক্ষাই অনারব্ধ থেকে যায়। সাহিত্য-বিচারে কে নির্ভুল পরীক্ষক, সে তর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু সকলেই মানবেন যে, জনতার নিকট যে-লেখা আপন মর্য্যদা লাভ করেছে তাকে অবজ্ঞা করবার উপায় নেই। কালের পরীক্ষায় সে টিকবে কি টিকবে না, তা হয়ত স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু সমসাময়িক জনসমাজের প্রশংসা যে লেখকের অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এ কথা যে-কোনো লেখকই মানবেন! এমন লেখক হয়ত আছেন যিনি আপন প্রেরণাকেই মনে করেন 'একমেবাদ্বিতীয়ং', পাঠকের মতামতে যিনি উদাসীন। তিনি তা হলে লেখা প্রকাশ করেন কেন? লেখক মাত্রই প্রকাশ চায়। এবং নাল্পে সুখমস্তি। কি বেদনা তা হলে সে-দেশের লেখকের যে-দেশের লেখক জানে— শত মাথা খুঁড়লেও আসলে তার লেখা শতকরা আশীজনের নিকটে সে পরিবেশন করতে পারবে না, নিরক্ষরতার হিমালয় দাঁড়িয়ে থাকবে বিশাল নিষেধের মত তার আশা ও প্রয়াসের বিরুদ্ধে? এই শতকরা আশী জনের মনোভূমিকে আপনার বাণী-বিস্তারের উপযোগী করে না তুলতে পরলে সে লেখক শুধু সঙ্কীর্ণ শিক্ষিত সমাজের সঙ্কীর্ণ আবর্তের পরিধির মধ্যেই পাক খেতে

থাকবে; তার সাহিত্য-জগৎ থাকবে গণ্ডীবদ্ধ—শিক্ষিত শ্রেণীর লেখা ও শিক্ষিত শ্রেণীর কথা।

লেখার মজুরী

শুধু এই আধ্যাত্মিক দৈন্য নয়, যতক্ষণ বাঙলার শতকরা আশী জন নিরক্ষর ততক্ষণ বাঙালী সাহিত্যিকের আর্থিক দৈন্যও অনিবার্য। ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখ্‌লেই আমরা বুঝি—এক কালে সাহিত্যিক ছিলেন জনতার চারণ, তার মুখপাত্র। সে যুগের শেষে এল সামন্তযুগ—সাহিত্যিক তখন হলেন রাজ-প্রসাদজীবী, হোন তিনি নবরত্নের পারিষদ কালিদাস, কিংবা হোন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারতচন্দ্র। এ যুগ শেষ হলে গণতন্ত্রের যুগ যখন আসে—আসে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সাহিত্য-প্রচারের সুযোগও,—তখন সাহিত্যিক লাভ করেন আংশিক স্বাতন্ত্র্য—যতটুকু স্বাতন্ত্র্য তার প্রকাশক ও পাঠকেরা তাঁকে দেয়। তাঁর পাঠক বা পে-মাস্টার তখন আর শুধু দু'চার জন মুনিব বা মুনিব-গোষ্ঠী নয়, তারা জনসাধারণ—অবশ্য যে জনসাধারণ ক্রয়ক্ষম। সাহিত্যে শেষ হয় পেট্রনের যুগ, আসে 'রেপাব্‌লিক অব লেটার্সের' যুগ—কিন্তু আসে যেখানে সাহিত্যের সে অবস্থা। আমাদের সাহিত্য-রাজ্যে শতকরা আশী জনই অধিকার বঞ্চিত, সাহিত্যিকেরই বা তা হলে ভরসা কতটুকু? শতকরা যে তিনজন তাঁর পাঠক ও সিকি জন সম্ভাব্য ক্রেতা তাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রতেই,—তাদের চাহিদার হিসাবেই,—সাহিত্যিকের আধ্যাত্মিক অভিযানও সীমাবদ্ধ। অথচ শতকরা এই সিকি জনের বেতনে তার বাস্তব জীবন যাত্রা প্রায় দুর্বহ। তাই, তাঁকে অন্য জীবিকা খুঁজতে হয়—শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিষয়কর্ম, আর সিনেমা, রেডিওর প্রসাদ-ভিক্ষু হিসাবে শাসক-গোষ্ঠীর তাঁবেদারি না করে উপায় কি? এমন সাহিত্যিক কে আছেন যে, আজ এই শতকরা তিন জনে-গঠিত পাঠক সমাজের উপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর

করে তৃপ্ত থাক্‌তে পারেন—আপনার সৃষ্টির আনন্দে? চান না তাঁর লেখাকে শতকরা আরও সাতানব্বুই জনের নিকট পরিবেশনের বিষয় করতে এবং লেখার মজুরী বাড়াতে? অন্ততঃ সাহিত্যিকরা যদিবা কেউ তা না চান, তাঁদের প্রকাশকদের কিন্তু এইটাই আকাঙ্ক্ষা, তাদের স্বপ্ন—দুর্ভাগ্যক্রমে নিরক্ষরের দেশে তা ব্যর্থ আশা ও ব্যর্থ স্বপ্নও।

শুধু আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন—যতক্ষণ দেশের সাধারণ মানুষ পাঠক হিসাবে লেখকের সহযোগী হয়ে না উঠ্‌ছেন, সার্বজনীন শিক্ষার প্রভাবে সেরূপে তাদের মনোভূমি সংস্কৃত না হচ্ছে—ততক্ষণ গণ-সাহিত্যের বিকাশও স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। সে শুভদিন যখন আসবে তখন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আস্‌তে পারবেন সেই লেখকেরা—কৃষকের শ্রমিকের সরিক যে জন, যার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কান পেতে—পিপ্‌ল্‌স্‌ রাইটার বা জন-সাহিত্যিক।

শেষ কথাঃ বলা নিষ্প্রয়োজন, বাঙলা সাহিত্যের ভূমি-সংস্কার আসলে বাঙলার ভূমি-সংস্কারের সঙ্গেই অনেকাংশে জড়িত। অর্থাৎ যতক্ষণ বাঙলার চাষী ভূমির মালিক না হবে, ততক্ষণ সে মালিক ও শাসক শ্রেণীর হাত থেকে আপনার প্রকৃত শিক্ষার দাবিও আদায় করতে পারবে কিনা সন্দেহ। আবার যদি বাঙলার চাষী শিক্ষার অধিকার আয়ত্ত করতে পারে, তা হলে তার ভূমির অধিকারই বা ঠেকিয়ে রাখা যাবে কতক্ষণ?—আর্থিক-সামাজিক ভূমি-সংস্কার যদি আরম্ভ হয় তা হলে সাহিত্যের এই ভূমি-সংস্কারও নিকটতর হবে।

ইং ১৯৫৩

লেখকের ক্লাশ

কিছু দিন পূর্বে আমরা একটি সংবাদ পড়ি—যুদ্ধের শেষে সোবিয়েত ভূমির লেখক ও শিল্পীদের এখন ক্লাশ হচ্ছে, সেখানে সোবিয়েত সঙ্ঘের নানা দেশের নতুন নতুন লেখকেরা 'বিপ্লবী বাস্তব-বাদ' (ডায়েলেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম্) সংবন্ধে পাঠ নিচ্ছেন। সংবাদটি পড়ে আমরা সকলেই বেশ কৌতুক বোধ করেছি। 'লেখকের ক্লাশ' শুন্‌লে কার না হাসি পায়?

সম্ভবত আমাদের মতই কোনো সংবাদ-সাহিত্যিক ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে এ নিয়ে ইংরাজিতে একটি সরস সম্পাদকীয়ও লেখেন। ক্লাশ করে লেখক তৈরী করা হচ্ছে আর "বিপ্লরী বাস্তববাদের" সূত্র অনুসারে লেখকরা লিখ্‌ছেন—এ সংবাদে সোবিয়েত-ভূমির লেখকদের জন্য অবশ্য অনেকের দুঃখ হয়েছে। রাষ্ট্রের অনুগত হতে গিয়ে শিল্পের ও সাহিত্যের যে কি দশা ঘটে তা আমরা অনেকে অনুমান করতে পারি। ইংরেজ লেখক জন্ লে'ম্যানও সোবিয়েত রাষ্ট্রের ও সোবিয়েত সাহিত্যের এই অবস্থার উল্লেখ করেই কিছু দিন আগে বেশ বিলাপ ও বিদ্রূপ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। (The Penguin New Writing, No. 24., 'State Art and Scepticism'.)

যুদ্ধকালীন সোবিয়েত সাহিত্য

লেম্যান লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বিশেষ করে তিনি আবার ইংরেজ নতুন লেখকদের মুরুব্বি; সাহিত্যে ও জীবনে তিনি নাকি প্রগতি-পন্থী ছিলেন। লেম্যানের তিরস্কারের উপলক্ষ প্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যিক নিকোলাই টিখোনোভ্‌এর একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ১৯৪৪-এর লেখা, তখনো সোবিয়েত দেশে যুদ্ধ চলেছে। টিখোনোভ্ লেনিনগ্রাদের কবি; সোবিয়েত লেখক সমিতির তিনি সভাপতি, যুদ্ধ নিয়ে তাঁর নিজের লেখা ছোটগল্পও (ইংরেজি নাম Tales of Leningard)

বেশ আদর লাভ করেছে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত সোবিয়েত লেখকরা কি সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের নেতা হিসাবে টিখোনভ্ তাঁর প্রবন্ধে এই যুদ্ধকালীন সাহিত্যের একটি হিসাব দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য—Soviet Short Stories, 1944, Pilot Press, 'The Soviet Writer'. Nikolas Tikhonov.)। তাতে লেখকদের প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা প্রচুর আছে ; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সোবিয়েত সাহিত্যের অভাব ও ত্রুটির কথাও আছে। স্বভাবতই সোবিয়েত লেখকের এই আত্ম-সামালোচনা সমালোচক লেম্যানেরও চোখে পড়েছে ; নিজের সমালোচনার জন্য টিখোনোভের সে সব উক্তিকে লে'ম্যান কবুল জবাব হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। যেমন, টিখোনভ্ বল্‌ছেন, কবিরা অনেকে এখনো তুচ্ছ, বাজে বাগ্‌বাহুল্য ও লেখার শিথিলতা ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেন নি ; অধিকাংশ লেখকই যুদ্ধের একটা ধরা-বাঁধা দিক, শুধু বীরত্বের কাহিনী, লিখ্‌তেই মশ্‌গুল, ইত্যাদি। এ সব মন্তব্য থেকে লেম্যান প্রমাণ পাচ্ছেন—সোবিয়েতের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, সোবিয়েত লেখকদিগের গৃহীত শিল্প-সূত্র 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা', এবং শিল্পীদের উপর সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের প্রভাব। এইরূপ কারণেই রুশ শিল্প ও সাহিত্যে আজ আগেকার যুগের মত সুমহৎ কিছু সৃষ্টি হতে পারছে না—এমন কি, তাতে ফরষ্টার (ইংরেজ), হেমিঙ্গোয়ে (মার্কিন), জয়েস্ (আইরিশ) ও প্রুস্তের (ফরাসী) মত লেখকও একালে জন্মে নি। তাই লিও টলষ্টয়ের 'কসাক' এবং তার সঙ্গে ভান্দা ভাসিলেভ্‌স্কার 'রামধনুর' তুলনা করলে হতাশ হতে হয়।

শিল্পী ও রাষ্ট্র

টিখোনোভ্-এর প্রবন্ধের মূল কথাটি ছিল এই--সোবিয়েত লেখক নিছক লেখক বলে নিজেকে মনে করে না ; এই যুদ্ধকালে সে 'লেখনিক' মাত্র নেই, সেও হয়েছে সৈনিক। লেখক হিসাবেই

স্বদেশ-রক্ষার জন্য সে তুলে নিয়েছে তার অস্ত্র ; সে অস্ত্র লেখনী। আবার লেখক হিসাবেই সে দায়িত্ব নিয়েছে সোবিয়েত ইতিহাসের এই বীরত্বময় মহাযুগকে চিত্রিত করবার ভার। "আমাদের লেখকদের কর্তব্য হল সোবিয়েতের অন্যান্য নর-নারীর মত, সকল সোবিয়েত 'বুদ্ধিজীবীর মত', মহোদ্যমে বিজয়-লাভের জন্য সচেষ্টা হওয়া। জনগণ, পার্টি ও সরকারের প্রতি যে দায়িত্ব তাঁদের আছে লেখকদের তা উপলব্ধি করা অবশ্য কর্তব্য—তারাও তো এক মহৎযুগের রাষ্ট্রগুরু। লেখকের অস্ত্র লেখনীকেও লাল ফৌজের অস্ত্র-শস্ত্রের মত হতে হবে বিজয়ী, সার্থক।"

রাষ্ট্রের নিকটে শিল্পীর এই আত্ম-সমর্পণ লেম্যান্ বরদাশ্‌ত করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'অবশ্য কর্তব্য' এই কথা শুন্‌লেই ইংরেজ শিল্পীর মন বিদ্রোহ করে (ইংরেজি-পড়া বাঙলা সাহিত্যিকেরও তা করে)। তাঁরা চিরদিন স্বাধীনতা চান; লেখকের স্বরাজ তাঁদের প্রধান কথা, ন্যূনতম প্রয়োজন। হ্যামলেট্, ডেনমার্কের রাষ্ট্রানুচর রোজেন্‌ক্রান্‌ত্‌জ্‌ ও গুয়েল্‌ডেন্‌স্টের্ণকে যা বলেছিলেন, ইংরেজ লেখকও রাষ্ট্রের নির্দেশ শুন্‌লেই তা বল্‌বে, "হ্যা, ছাখো, তোমরা আমাকে কি মনে করেছ? তোমাদের খুশী মত তোমরা আমাকে চালাবে?...এই ছোট বাজনাটা থেকে খাশা সুর, চমৎকার সঙ্গীত সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তোমরা কেউ তার থেকে আওয়াজও বের করতে পার না। জাহান্নামে যাও! তোমরা ভাব—এর থেকে সহজেও তোমরা পারবে আমাকে বাজাতে তোমাদের ইচ্ছা মত সুরে?'

সোবিয়েত সাহিত্যের রূপ

জন লেম্যানের এ তর্ক অবশ্য নতুন নয়। আর তাতে যতটা ধার আছে ততটা ভার নেই। কারণ, ইংরেজ সাহিত্যিক তাঁদের ইংরেজি ঢঙের গণতান্ত্রিক স্বরাজের ভক্ত; কিন্তু মার্কিন সাহিত্যিক

ইংরেজদেরও উপরে যায় আমেরিকার গণতান্ত্রিক স্বরাজের বাগাড়ম্বরে। এমন কি, বাংলা সাহিত্যিকও বড়াই করেন 'সৃষ্টির স্বাধীনতার'। অথচ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সকলেই দেখা যায় মনে মনে সেই নিজ-নিজ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যবস্থার বশ, যে-বশ্যতার জন্য লেম্যান টিখোনোভ্ ও রুশ সাহিত্যিকদের অত ব্যঙ্গ করতে উৎসাহী। 'লেখকের স্বরাজের' অর্থ তা হলে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' নয়। তা ছাড়াও ধনিক-তন্ত্র-চালিত গণতন্ত্রে লেখকের স্বরাজ কতটা মিলে আর 'শ্রমিকতন্ত্রের একাধিপত্যে' লেখকের স্বরাজ কতটা মিল্‌ছে, এ তর্কও আছে। তবে এ তর্ক পুরনো, তার মীমাংসাও এক রকম হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তাই বলে তর্ক ফুরোয় নি। কারণ যতক্ষণ পৃথিবীতে এই দুই সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব চল্‌ছে ততক্ষণ দুই সমাজের সাহিত্যেরও এ তর্ক শেষ হবে না। তবে লেম্যান যদি বর্তমান রুশ সাহিত্যের "অধোগতি" হয়েছে প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তাঁর স্বপক্ষে একটা বড় প্রমাণ দাঁড় করানো যায়। সেদিক থেকে লেম্যানের প্রমাণ কিন্তু টেকসই নয়। যেমন, এ যুদ্ধকালে পৃথিবীর বিবিধ ভাষায় সাহিত্য যতটা সৃষ্টি হয়েছে, যতদূর জানা যায়, সোবিয়েত দেশেই সৃষ্টি হয়েছে সব চেয়ে বেশি সাহিত্য। বিশেষ করে, এমন আশার, উদ্দীপনার, মহত্তর জীবন-বোধের সাহিত্য এ সময়ে আর কোথায় কতটা জন্মেছে? দ্বিতীয়ত, এ সময়কার রুশ সাহিত্যিকরা যদি টলষ্টয় প্রভৃতির থেকে ছোট হন লেম্যান প্রভৃতিরাও তো শেক্‌স্‌পীয়র, থ্যাকারে, ফিল্‌ডিং প্রভৃতির তুলনায় নগণ্য! তা হলে ইংরেজ সাহিত্যের "অধোগতি"র কারণ কি? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্লীবত্ব? হয় রাষ্ট্রাদেশ, নয় সমাজ-চক্রান্ত? তৃতীয়ত, ভান্দা ভাসিলেভ্‌স্কা, সাইমনভ, সোবেলোব প্রভৃতি একটি দেশের জীবিত লেখকদের সঙ্গে লেম্যান যাঁদের তুলনা করছেন (যেমন, ফরষ্টার প্রুস্ত, জয়েস্, প্রভৃতি), লেম্যান ভুলে যাচ্ছেন তাঁরা সকলেই ঠিক সমকালীন নন, অন্তত অনেকেই

তাঁরা (প্রুস্ত, জয়েস্) আজ বেঁচে নেই; এবং তাঁরা সকলেই এক দেশের বা এক ভাষার লেখকও নন। তাই, এ প্রসঙ্গে 'যুদ্ধকালীন রুশ দেশে পৃথিবীর নানা দেশের নানা কালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মত লেখক নেই' বলাটা যুক্তি নয়, যুক্তির ফাঁকি।

তথাপি আমরা লেম্যানের অনেক কথার সঙ্গে এক মত হব। এই যুদ্ধকালীন রুশ সাহিত্যে সত্যই টলষ্টয়, ডষ্টেয়ভস্কির মত বিরাট প্রতিভা নেই। তা ছাড়া, এসব লেখার মর্মবাণীও যেন অন্যরূপ। যেমন, প্রতেক লেখাই দেখি বীরত্বের 'বাখানিতে' ভরা। তার পরে, অধিকাংশ লেখাতেই আছে একটা তীব্র বিদ্বেষ, অসহনীয় জ্বালা। শোলোকভ্ বা ভান্দা ভাসিলেভ্স্কার মত স্রষ্টাদের লেখা পড়েও মুখে তাই একটা উৎকট স্বাদ লেগে থাকে। তা ছাড়া সকলেই আবার উগ্র রুশ-প্রেমিক। আলেকসি টলষ্টয়ের মত পুরনো দিনের লেখকদের লেখায়ও দেখি একটা স্বাদেশিকাতর ছোপ লেগেছে। এ স্বাদেশিকতাকে ডষ্টেয়ভ্স্কির পুরনো রুশ-গর্বেরই সোবিয়েত-কালীন পরিণতি বলেও আমরা ব্যাখ্যা বা বিদ্রূপ করতে পারি,—তাতে অবশ্য লেখার মূল্য বাড়ে-কমে না। আসলে, শিল্প হিসাবে এ সব লেখায় আমাদের রস-বোধ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। কারণ, অনেক লেখাতে একটা সাংবাদিক স্থূলভ রিপোর্টের ছাপ রয়েছে; প্রায়ই রূপায়ণে অবহেলা দেখা যায়। শিল্পরীতি বিষয়ে শক্তিমান লেখকেরাও যেন অমনোযোগী। সত্যই, শুধু বীরত্বগাথা, বিদ্বেষবুদ্ধি, রাষ্ট্রের তাগিদ ও যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতেই যেন লেখকেরা মনোযোগী। নিশ্চয়ই তাঁদের দেশের লোকও সে সময়ে তা'ই চাইছিল; আর রাষ্ট্রের শিরোপাও তাতে লেখকদের ভাগ্যে জুট্ছিল। কাজেই তাঁরা মোটা স্থরে এ সময়ে বীরত্বের ও উদ্দীপনার গানই গাইতে মেতে উঠেছেন।

এইজন্যই লেম্যানের মত গণতান্ত্রিক দেশের সেবকেরা সত্যই বল্তে পারেন, সাহিত্যিকদের মান-মর্যাদা, স্বস্তি-সম্পদ যেখানে

রাষ্ট্রের কৃপার উপরে নির্ভর করে সেখানে এইরূপই হবে। সাহিত্যিকরা সেখানে পরীক্ষার্থীর মত রাষ্ট্রের মাষ্টারদের নিকট বেশী নম্বর পাবার জন্য জেনে-না-জেনে যত কৌশল আছে তাই গ্রহণ করবে। তাই সেখানে লেখকেরও ক্লাশ দেখা দেবে—যাতে লেখকরা জীবন-সমস্যার রাষ্ট্রনির্ণীত ধরা-বাঁধা উত্তর শিখে নিতে পারেন, সেই নোট মুখস্ত করে পাশ করতে পারেন। রাষ্ট্রও যখন একবার বুঝ্‌ল যে, সৃষ্টির পরীক্ষায় সাহিত্যিকদের তাঁবে পেলে উদ্দেশ্য ভাল সিদ্ধ হয়, তখন আপনারই মতবাদে ও কার্যধারায় লেখকদের শিক্ষিত করে তুল্‌বার জন্য রাষ্ট্রও লেখকের ক্লাশ খুলবে, জগৎ-সমস্যা সম্বন্ধে সহজ নোট্‌ ও সূত্র দিয়ে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করবে, জীবন-সমস্যার রাষ্ট্রসমর্থিত উত্তর বাৎলিয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

সোবিয়েত দেশে 'লেখকের ক্লাশ' হচ্ছে, এ সংবাদে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সাহিত্য-রসিকের মনে স্বভাবতই কৌতুক জাগবে—সাহিত্য কি এমন ক্লাশ করে সৃষ্টি করা যায়? দল বেঁধে লেখা যায় কবিতা, উপন্যাস ? শিল্পও কি যৌথ সৃষ্টি ? না, ব্যক্তির দান ?

ব্যক্তির সৃষ্টি ও সম্মিলিত সৃষ্টি

জয়পুরে ভারতীয় পি, ই, এন্‌, সম্মেলনে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ সৃষ্টিক্রিয়ার এই রহস্য নির্দেশ করেছেন এই বলে, "সাহিত্য মানুষের নির্জনতার সৃষ্টি !" যেখানে মানুষ একান্ত সেখানে তার ব্যক্তি-স্বরূপ পরের চাপ থেকে মুক্ত। সেখানে তার মন আপনাকে প্রকাশিত করবার অবকাশ লাভ করে ; মানুষের সত্তা সেখানেই সৃষ্টিতে বিকশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথও বহুস্থলে সৃষ্টির রহস্যকে এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের এই মর্মের উক্তিও তাই আমরা

সহজেই বুঝি ; এবং অভ্যাস বশে সহজেই আমরা তা মেনেও নিই। কিন্তু অনেক সাধারণীকৃত সত্যের মতই এ যুক্তি যেমন সত্য তেমনি মিথ্যাও। স্থূল চক্ষেও আমরা সকলেই দেখি—সাহিত্য ও শিল্প দল-বেঁধে লেখা হয় না, একা বসে এক-একটি বিশেষ মানুষ এসব সৃষ্টি করেন। বারোয়ারি উপন্যাস হয়ত লেখা চলে, কিন্তু বারোয়ারি কবিতা তো কল্পনাতীত। তবু আমরা দেখি কোনো কোনো শিল্প দল-বেঁধেও একত্র হয়ে সৃষ্টি করা হত, এখনো সৃষ্টি করা চলে। যেমন গণনৃত্য, জনসঙ্গীত। আবার, বিশেষ কোনো কোনো শিল্প তো সমবেত সৃষ্টিই, একার সৃষ্টি নয়। যেমন, নাটক, ফিল্‌ম, সঙ্গতযুক্ত সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, স্থাপত্য। এ সব শিল্প প্রয়োজনানুরূপ সম্মিলিত শক্তির রচনা। নানামাত্রার যৌথ সৃষ্টিই।

আসলে কিন্তু এসব যৌথ সৃষ্টির মধ্য দিয়েও সৃষ্টির মূল রহস্যই প্রমাণিত হয়। সৃষ্টির মধ্যে আমরা দেখি নতুনের আবির্ভাব, সে নতুন জন্মে বিরোধী-শক্তির সংঘাতে-সমন্বয়ে। বস্তু ও ভাবের জটিল সংবন্ধের মধ্যে সৃষ্টিকুশল মন সমন্বয় স্থাপন করে, সঙ্গতি এনে ফুটিয়ে তোলে যে কোনো শিল্প। যে কোনো সম্মিলিত শিল্পেও এই নিয়মই দেখি। তাতে দেখি শিল্পেও বহু রকমের সৃষ্টিশক্তির মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয়েছে। যেমন নাট্যশিল্প। নাট্যকারের সৃষ্টিশক্তি, অভিনেতার সৃষ্টিশক্তি ও রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের শক্তি—প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটিকে সমন্বয় করে প্রযোজক নাট্যকলা ফুটিয়ে তোলেন। বহুমনের বৈচিত্র্য এরূপ সম্মিলিত কলায়—নাটকে, নৃত্যে, সঙ্গীতে—আবার নতুন ঐক্য লাভ করে, এক বিচিত্রতর সৃষ্টির নিদর্শন হয়ে ওঠে। যে শিল্পকলা শুধু একার সৃষ্টি, তার থেকে এরূপ সম্মিলিত কলা জটিলতর ও বিচিত্রতর। শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক,—শেক্‌স্‌পীয়ারের সনেট, শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক। একক রচনার রস কম তীব্র নয়, কিন্তু

যৌথসৃষ্টির ঐশ্বর্য আরও বেশি। এরূপ শিল্প তাই সভ্যতার আরও অভিনব আবিষ্কার, মানুষের নিত্য নবায়মান সৃষ্টি-প্রতিভারই প্রমাণ।

কাজেই, এইরূপ স্থূল অর্থে 'শিল্পমাত্রই শুধু নির্জনতার সৃষ্টি', এ কথা বলা চলে না। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণও নিশ্চয়ই সেরূপ অর্থে কথাটা বলেন নি। তাঁর কথার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিল্প ব্যক্তি-মনের দান, ব্যক্তি-সত্তারই বাণী। এ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেও আমরা বারে বারে শুনেছি। কিন্তু এ কথাও এক অর্থে যেমন সত্য অন্য অর্থে তেমনি মিথ্যা।

ব্যক্তির "ব্যক্তিত্ব"

আসলে কথাটার সঙ্গে একটা পুরনো তর্ক জড়িত রয়েছে—মানুষের ব্যক্তিত্ব একান্ত কিনা, তা অন্য-নিরপেক্ষ কি না, তা সমাজ-নিরপেক্ষ কি না। কিন্তু এ পুরনো তর্কের ঘূর্ণাবর্ত ও চোরাবালিতে আজ স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের আটকে যাবার কথা নয়। কারণ, "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের (ইনডিভিজুয়েলিজম্) যুগের" ধোঁয়া আজ অনেক কেটে আস্‌ছে। আবার সমূহতন্ত্রের (কলেক্‌টিভিজম্) ভূয়া বিভীষিকাও অনেকটা দূর হয়ে যাচ্ছে। তাতেই সহজ চোখেও আজ ব্যক্তির ও সমাজের সংবন্ধ, তার দেনা-পাওনার রূপ, অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

মোটামুটি এদিকে আজ যা বোঝা যাচ্ছে সংক্ষেপে তা এই :—প্রথমত, ব্যক্তির এই "ব্যক্তিত্ব" গড়ে ওঠে ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের সংযোগে, সংঘাতে। এই ব্যক্তিত্ব-গঠনের ইতিহাসে ব্যক্তিও তাই একমাত্র সত্য নয়, পরিবেশও একমাত্র সত্য নয়। দুইই কতকটা সত্য; আর আসল সত্য যা—'ব্যক্তি-স্বরূপ' বা "ব্যক্তিত্ব" বা "ব্যক্তিসত্তা", যা'ই তাকে বলি,—তা এই দুয়ের মিলনে গঠিত নতুন, স্বতন্ত্র এক তৃতীয় সত্য।

দ্বিতীয়ত, ভেতরের-বাইরের নানা টানা-পোড়েন, বাস্তব ঘটনার ও মানসিক ভাব-কল্পনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতে রচিত হয় এই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিস্বরূপ। সেই ব্যক্তিস্বরূপ তাই এক বিচিত্র "প্যাটার্ণ।" কিন্তু ভেতরে বাইরে প্রতিনিমিষে ঘটনা ও চেতনা বদলে যাচ্ছে। তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক নতুন হচ্ছে। তাই ব্যক্তিত্বও একটা মূল ভিত্তির উপরে প্রতিনিমেষে একটা নবায়মান প্যাটার্ণ, একটা বিকাশশীল 'প্রোসেস্ও'।

তৃতীয়ত, এই ব্যক্তিত্বের বলেই প্রত্যেক মানুষ যেমন unique, অপূর্ব, অদ্বিতীয়, তেমনি সেই ব্যক্তিত্ব সত্বেও প্রত্যেক মানুষই আবার মানুষ, এমন কি বিশেষ বর্গ-সম্মত (class) মানুষ;— আজকের সমাজে, অনেকাংশে 'প্রমাণ-সই' (standardised) মানুষও সে। তাই একই কালে সে ব্যক্তিও (individual) বটে আবার 'টাইপ'ও বটে ; কেউ এটা বেশি, কেউ ওটা বেশি।

চতুর্থত, ব্যক্তি ও পরিবেশের সংঘাতে যে ব্যক্তিত্ব রূপায়িত হয়, মোটেই তা হলে তা একরঙা সরল সত্তা নয় ; সেও যথেষ্ট বিচিত্র এবং বর্ধনশীল। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই বৈচিত্র্য বিকশিত হয়, ব্যক্তিত্বেরই তাতে বিকাশের অবকাশ ঘটে। যুগে যুগে দিনে দিনে মানুষকে বাড়তে হয় একটা সমন্বয় ক'রে, একটা সমাহিতি (integration) সাধন ক'রে। যখন সভ্যতা জটিল হয়ে পড়ে, সংঘাতসঙ্কুল হয় তখন ভেতরের বাইরের দ্বন্দ্বও বেড়ে যায়, ব্যক্তিত্বে সরলতা অপেক্ষা জটিলতা বেশি দেখা দেয়, অখণ্ডতা অপেক্ষা খণ্ডতাই নিয়ম হয়ে পড়ে। সাধারণত ব্যক্তিত্ব তখন ভেতরের বাইরের দ্বন্দ্বে, নিরাশায়, ব্যর্থতায় খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। আজকের যুগে সভ্যতার সংকট যেখানে যত গভীর সেখানেই তাই দেখতে পাব ব্যক্তিত্ব তত খণ্ডিত, অসুস্থ, অস্বস্থ, অস্বচ্ছ।

কাজেই, সাহিত্য যদি ব্যক্তিত্বের বাণী হয় তা হলেও সাহিত্য নির্জনতার সৃষ্টি নয়, 'একান্ত মানুষের' বাণী নয়। কারণ, ব্যক্তিত্ব

এক বিকাশশীল বিচিত্র প্যাটার্ণ, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের সংযোগে সংঘাতে তা রূপায়িত। তাই এই দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে সাহিত্য পরিবেশেরও বাণী। কোথাও বা সাহিত্যে এ সত্য প্রত্যক্ষ হয়, কোথাও বা তা পরোক্ষ থাকে। ব্যক্তির সৃষ্টিও আসলে এই অর্থে যৌথসৃষ্টি, একক মানুষের নিছক ধ্যান-কল্পনা তা নয়। অবশ্য সাহিত্য যে শুধু পরিবেশের প্রতিলিপিও নয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, সাহিত্য বা শিল্প প্রতিলিপি মাত্র নয়, সৃষ্টি। শিল্পী ও সাহিত্যিক যা আছে তাই শুধু গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ করে না; যা গ্রহণ করে নিজের চেতনার দান তার সঙ্গে মিশিয়ে তাকে নতুন করে; পরিবেশকে নতুন কিছু তারা যোগায়।

কিন্তু কথা হবে, এই গ্রহণ ও সৃষ্টির কাজে সাহিত্যিক কি কোনো ইস্কুল থেকে কিছু সহায়তা লাভ করতে পারেন?—এই প্রশ্নটিই সোবিয়েত রাষ্ট্রের লেখকের ক্লাশ আমাদের কাছে উত্থাপন করেছে। অবশ্য প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের জন্য কয়েকটি কথার অর্থ পরিষ্কার করে বোঝা দরকার।

ইস্কুলের অর্থ কি?

প্রথম কথা, ইস্কুল বলতেই আমরা একটা গুরুমশায়ি ব্যাপার ভেবে নিই। তার কারণ ইস্কুল সম্বন্ধে শুধু রবীন্দ্রনাথের কেন, আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতাও ভাল নয়। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এটা আমরা বড় করেই জানি ইস্কুল মানেই একটা খোঁয়াড়—মামুলি নিয়ম কানুন, ধরাবাঁধা পাঠ ও রুটিন। এ সব মিথ্যা নয়। তবু আমরা জানি, একেবারে না পড়ার থেকে ইস্কুলে পড়া ভাল। এমন কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরে একা-একা বসে পড়ার থেকেও ইস্কুলের দশজনের সঙ্গে বসে একত্র শিক্ষালাভে ব্যক্তিত্ব ঘাতে-প্রতিঘাতে বিকাশ লাভ করে। তা ছাড়া, ইস্কুলের মামুলি-পনা, গদ-বাঁধা শিক্ষা প্রভৃতি যা ত্রুটি সে সব ছেঁটে ফেলা যায়,—

নইলে রবীন্দ্রনাথই বা ইস্কুল গড়লেন কেন ?—আর সভ্যতা ক্রমেই তা দূর করে ইস্কুলকে আরো উন্নত করে তুলছে। সভ্যতা ও সমাজপ্রগতির সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষার ধারণা এবং ইস্কুলের রূপ ও রীতিও ক্রমেই বিকশিত হয়, এ তো দেখ্‌ছিই। আর ভুললে চলবে কেন, ইস্কুল সভ্যতারই একটা প্রধান আবিষ্কার। যতই মানুষ বুঝেছে এক পুরুষের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা আর-এক পুরুষকে দান করতে পারলেই সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব, ততই মানুষ চেয়েছে সেই শিক্ষাদানের পথকে সুস্থির ও পরিচ্ছন্ন করতে। পরিবার-পাঠ, গুরুগৃহ থেকে পাঠশালা, তারপর চতুষ্পাঠী, মঠ, বিহার, বিশ্ববিদ্যালয়, এসব এভাবে ক্রমে এসেছে। অন্যদিকে সে যুগের দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের শিক্ষানবীশী থেকে একালের টেক্‌নিকাল কলেজ, টেকনোলজির বিশ্ববিদ্যালয় এসব সভ্যতার ক্রমাবিষ্কার, তার প্রসারিত চেতনার ও সংগঠন-শক্তির প্রমাণ।

সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা

মোট কথা, ইস্কুল এক ভাবে না এক ভাবে আগেও থাক্‌ত, কিন্তু তখন থাক্‌ত অ-সংগঠিত অবস্থায়। নতুন ছাত্রদের শিক্ষানবীশী করতে হত বাপ-দাদার কাছে বা বড় বড় শিল্পীদের কাছে। সেগুলোই তখনকার ইস্কুল। সে শিল্পী দা ভিঞ্চিই হোন্, কিংবা হোন্ মিকালএঞ্জিলো। ব্যক্তির বা দলের প্রভাবে এরূপ ইস্কুল এখনও চলে। এখনো আমরা বলি অমুক শিল্পীর ইস্কুল। সেকালের গুরুগৃহে বা শিল্পী বা কারিগরের ঘরে বাধ্যবাধকতা কম ছিল না; বোধ হয় একালের ইস্কুল থেকেও তখনকার সে সব ইস্কুলের আদর্শ ও আব্‌হাওয়া আরও সঙ্কীর্ণ ছিল। যতই সভ্যতা জ্ঞানে কর্মে অগ্রসর হয়েছে ততই এই শিক্ষা ব্যবস্থারও সুব্যবস্থা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। যতই মানুষের সামাজিক দায়িত্ব-বোধ বেড়েছে ততই সমাজকে এই শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করতে হয়েছে,

ব্যক্তির বা দলের উদ্যোগের বা শুভবুদ্ধির উপরে আর তা ফেলে রাখা যায়নি।

আবার, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে প্রত্যেক শিল্পই কতকাংশে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, নতুন নতুন শিল্প-ধারাও আবিষ্কৃত হচ্ছে। যেমন, বিংশ শতকের বাক্‌চিত্র। তাই সভ্য সমাজও বিভিন্ন শিল্প-ধারা শিক্ষার ব্যবস্থা করবার তাগিদ বোধ করেছে। এ জন্যেই ধরাবাঁধা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আজ অগ্রগামী দেশে ইস্কুল গড়তে হয় কারুবিদ্যার, ইস্কুল গড়তে হয় নাট্যকলার, অভিনয়কলার, এমন কি বাক্‌চিত্রাভিনয়েরও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে এরূপ ইস্কুল এখনো কম বেশী ব্যক্তির বা শ্রেণী বিশেষের হাতেই রয়েছে। তারা এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও ব্যবসা হিসেবে চালায়। কিন্তু এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলা উচিত সমাজের ও সৃষ্টির স্বার্থে, তা আজ কেউ অস্বীকার করবে না। সভ্যতার পরীক্ষাই তো এখানে—মানুষের সৃষ্টিশক্তিকে আগেকার যুগের অভিজ্ঞতা-বলে পুষ্ট করে আরও সবল, আরও সুপটু করতে সমাজ উদ্যোগী হয়েছে কিনা, সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে সে পুরোপুরি সার্থক করতে পারছে কিনা।

যদি আজ লেখকদের এই আত্ম-গঠনের সুযোগ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র যথোচিত ভাবে তৈরী করে দিতে চায় তাহলে তাকে লেখকদের ইস্কুলও তৈরী করতেই হবে। হয়ত প্রথম দিকে অন্যান্য ইস্কুলে যেমন হয়, এখানেও তেমনি ভুলত্রুটি জুটবে। অথবা যেমন ইস্কুল মাত্রেই একটা মামুলিপনা, টুলোমনোভাব (academicism) ও নিয়ম-পূজা (routine worship) দেখা দেয়, তেমনি এই লেখকের ইস্কুলেও ত্রুটি থাকবার সম্ভাবনা। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে এরূপ ইস্কুল যে একটা অগ্রবর্তী চেষ্টা তা' বলে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার যুক্তি কোথায়?

লেখাও শিক্ষাসাপেক্ষ

সঙ্গীতের ইস্কুল, আর্টের ইস্কুল, এ সব না থাক্‌লে আমরা কোনো সভ্য দেশকে সভ্য বলি না। আর লেখকের ইস্কুল শুনলে আমরা হাসি কেন? তার কারণ—লেখা কী, এ সংবন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। লেখা জিনিসটাকে আমরা এখনো দেখি একটা যাদুবিদ্যার মত—যা-কিছু অসামান্য তাকেই "অলৌকিক" বলে আমরা মনে করি। পুরোহিততন্ত্রের আমলের সেই মনোভাব এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। অবশ্য লেখা একটা আর্ট ব'লে, ক্রাফ্‌ট্‌ ব'লে, বিদ্যা ব'লে তথাপি আমরা মানি। জানি যে, ও-বিদ্যাও কিছুটা শিখ্‌তে হয়, অভ্যাস করতে হয়। তাই জুটি গিয়ে নানা সাহিত্যপত্রের সম্পাদকের আড্ডায়, সংবাদপত্রের কর্তাদের আপিসে, প্রকাশকের দোকানে। সেগুলোও শুধু ব্যক্তির 'কোটারি' নয়, লেখকের ইস্কুলও। তবে আমাদের এসব সাহিত্যের আড্ডা সংগঠিত ইস্কুল নয়, এদেশের ঢিলে ঢালা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সমাজে কোনো সংগঠন সহজে স্থিররূপ লাভ করে না। মুরুব্বির কাছে বা দল গড়ে সাহিত্য সৃষ্টি যে চলে না, এ কথা আমরা এ দেশে অন্তত কিছুতেই বল্‌তে পারি না। বরং 'দল' না পেলেই আমাদের নতুন সাহিত্যিক মীইয়ে যায়; দলের মধ্য দিয়ে সে খানিকটা শিক্ষা, খানিকটা ভাবের আদান-প্রদান, রুচি ও রীতি বুঝবার সুযোগ পায়। নিয়মিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে লেখকের ইস্কুল থাক্‌লে এ সব জ্ঞান, চেতনা ও কলা-কৌশল তার আয়ত্ত হত আরও সহজে, সচ্ছন্দে, ধারাবাহিক ভাবে, আরও পরিচ্ছন্ন রূপে। বলা বাহুল্য, শুধু তাতেই কোনো লেখক আগেকার যুগের স্রষ্টাদের থেকে বড় স্রষ্টা হয়ে উঠবেন তা নয়। তবে নিশ্চয়ই পূর্বগামামীদের তুল্য প্রতিভা থাক্‌লে সে প্রতিভা পরিচ্ছন্ন ও পরিপুষ্ট হত এই শিক্ষার সহায়তায় আরো সহজে ও স্বচ্ছন্দে। অন্তত সাধারণশক্তি-সম্পন্ন বহু লেখক যে এরূপ

সুযোগ পেলে সহজে পরিণত শক্তি আয়ত্ত করতে পারেন তাতে সন্দেহ নেই।

সাহিত্যে মতবাদ

ইস্কুল ও লেখা—এ দুটি বিষয়ে ধারণা একটু পরিষ্কার হলে লেখকের ক্লাশে তত হাসি পায় না। কিন্তু আপত্তির তৃতীয় কারণটি তখনও থেকে যায়। সংশয় জাগে—এ ইস্কুল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের হাতে গেলে বুঝি লেখকের স্বরাজ আর থাক্‌ল না। কিন্তু সরকারী আর্ট স্কুলে আপত্তি করি না কেন? তা ছাড়া, যদিও সে বিষয়ে নতুন করে তর্ক করে লাভ নেই,—আমরা সবাই জানি ব্যক্তির স্বাধীনতার মতই লেখকের স্বাধীনতাও আসলে ধনিক সমাজে নেই, তা বরং থাক্‌তে পারে সমাজতন্ত্রী সভ্যতায়। এ কথার উত্তরে লেম্যানের মত কেউ সে রাষ্ট্রের ১৯১৭—১৯৪৫ পর্যন্ত শিল্পদৃষ্টির ও শিল্প-নীতির ভুল ভ্রান্তির কথা তুলতে পারেন, বল্‌তে পারেন—তাদের এখনকার গৃহীত শিল্পনীতি, "সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা" (সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজম্‌), একটা বাজে গোঁড়ামি! যেন ইউরোপের ধনতন্ত্রী দেশের এই কয় বৎসরের এক্‌সপ্রেশনিজম্‌, স্যুররিয়েলিজম্‌, কিউবিজম্‌, ভোরটিসিজ্‌ম্‌, ডাডাইজম্‌, প্রভৃতি শিল্পমতবাদ একেবারে নির্ভুল চিন্তার বা সার্থক সৃষ্টির সাক্ষ্য। অবশ্য অন্য কেউ আবার আমাদের ষ্টেটস্‌ম্যানের রসিক সংবাদিকের মত লেম্যানের কথাই ঘুরিয়ে বল্‌তে পারেন,—বিপ্লবী বাস্তব-বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা হবে নাকি? দু'জনারই আপত্তি মূলত এক। ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌ বা বিপ্লবী বাস্তববাদ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে "সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা" রূপে দেখা দিয়েছে। ধনিকতন্ত্রী দেশে এই সংকটের কালে হয়ত তার রূপ একটু স্বতন্ত্র হবে, তার নাম হতে পারে 'বিপ্লবপন্থী বাস্তবতা'। সে যা'ই হোক, এঁদের আপত্তি

মূলত এক—সাহিত্য ক্ষেত্রে বিপ্লবী বাস্তববাদ বা ডায়েলেকটিক্যাল মেটারিয়ালিজম্ খাটবে না।

এ আপত্তি অনেকেরই। কারণ, অনেকেরই প্রথমত ধারণা নেই—ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ কি, আর সাহিত্য-ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কি ভাবে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেকেরই আবার ধারণা সাহিত্য ক্ষেত্র বুঝি জীবন-ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন একটা রহস্যলোক। সাহিত্য বা শিল্প যেন কোনো যাদুবিদ্যা। এই দ্বিতীয় কথাটা নিয়েও আবার আলোচনা নিরর্থক। শিল্পে ও সাহিত্যে বিশেষ করে মানুষের মানস-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় বেশি। তাই মানুষ তা নিয়ে অনেক বেশি কুয়াসা রচনা করার অবসর পায়। করেছেও তা'ই। কিন্তু শিল্পও বাস্তব জীবনেরই আর এক দিক, জীবনেরই অচ্ছেদ্য অংশ, এ কথা আজ কোনো সাহিত্য-জিজ্ঞাসুই আর অস্বীকার করবেন না। সাহিত্য মানেই সেই জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবনরস স্বীকৃতি—বিপ্লবী বাস্তববাদ এ সত্যই জিজ্ঞাসুর চোখে আরও পরিষ্কার করে তোলে। লেম্যান্ হয়ত তাই বুঝেও বুঝে উঠ্‌তে পারেন না টিখোনোভ্-এর এই কথার মানে কী—"In the days of war, as formerly in the days of peaceful construction, the hero of our literature is Truth."—এ কোনো বিশেষ মতবাদ ঘোষণা নয়, চিরন্তন সাহিত্যাদর্শ।

কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদের বিপ্লবী বাস্তববাদ সংবন্ধে এত আপত্তি যে তাঁরা তা বুঝ্‌তেও চেষ্টা করেন না। নিজেদের মন-গড়া এক-একটা কথাকেই তাঁরা বিপ্লবী বাস্তববাদের প্রতিপাদ্য বলে ঠিক করে নেন। কখনো সে সব কথা একেবারেই ভুয়ো, কখনো আংশিক সত্য,—এবং তাই যথার্থ জিজ্ঞাসুর পক্ষে বিপজ্জনক মিথ্যাও। সে সব অদ্ভুত কথার ফিরিস্তি নিয়ে এখানে আলোচনা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে যা আমরা মনে রাখতে পারি তা এই :—এসব পণ্ডিতদের ডায়েলেকটিক্যাল আইডিয়ালিজম্-এ

আপত্তি নেই, যেমন, হেগেলে। আপত্তি কাণ্টে নেই, প্লেটোতে নেই, বেদান্তে নেই, ন্যায়ে নেই, জীনস্‌-এ নেই, এডিংটনে নেই,—যত রকমের স্পষ্ট বা বর্ণচোরা ভাববাদ আছে তার কোনোটাতে তাদের আপত্তি নেই। অথচ জগৎ ও জীবনকে সব ভাববাদই কম বেশি মায়া বা গৌণ বলে। ভাববাদ কম বেশি জীবন-বিমুখী। আর যে জীবন-বিমুখী সে জীবনরসের রসিক নয়। তথাপি এদের মতে সাহিত্যিকের জীবন-বোধ ও সৃষ্টিশক্তি সেই জীবন-বিমুখী ভাববাদেই পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সাহিত্যিকের দৃষ্টি অন্ধ হবে যদি সাহিত্যিক অলৌকিকতায় বিশ্বাস হারান, অতীন্দ্রিয়তায় আস্থা না রাখেন; জগৎ ও জীবনকে বাস্তব বলে জানেন, সত্য বলে মানেন; যদি জীবনসত্যকে তিনি গ্রহণ করেন, জীবন-রসের রসিক হন, মানুষের সৃষ্টিশক্তিতে শ্রদ্ধা রাখেন, মানুষকে মার্যাদা দেন মহা-সম্ভবনাময় ইতিহাসের বিচিত্র-চরিত্র নায়ক হিসাবে।

অথচ আমরা জানি—সাহিত্য হচ্ছে জীবনের স্বীকৃতি—জীবন-রসের পরিবেশন। বিশেষ করে, মানুষের স্বীকৃতি—মানব-রসের আস্বাদন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এ বুঝে মানুষ দার্শনিক হতে পারে, মরমী সাধক হতে পারে; কিন্তু রূপস্রষ্টা বা শিল্পী হবার পক্ষে নিশ্চয়ই এ জ্ঞান বাধা। অপর পক্ষে, জগৎ সত্য, জীবন সত্য, এ না জানলে, না উপলব্ধি করলে কোনো শিল্পী কি সৃষ্টি করতে পারেন কোনো শিল্প, কোনো সাহিত্য, কোনো গান, কোনো রূপ? "To be an engineer of the human soul means to stand with both feet planted in the realities of life."

বিপ্লবী বাস্তববাদ অবশ্য মানুষকে কর্মী করে তোলে। কারণ, তা শুধু একটা পুথিগত 'তত্ত্ব' মাত্র নয়। তা এক বিশ্ববীক্ষা, আর জীবন-শিল্পেই তার চরম সার্থকতা হয়। এ সংবন্ধে শিল্পীর সত্যকারের ধারণা জন্মালে তিনি শুধু এই বিশ্ববীক্ষার অধিকারী হবেন, তা নয়, জীবন-শিল্পেরও শিল্পী হবেন। কিন্তু তা হবেন

জীবনরসের রসিক রূপে, হবেন নব নব রূপের স্রষ্টা হিসাবে। কারণ সৃষ্টি হচ্ছে বিপ্লবের মূল শক্তি, আর বিপ্লব অর্থ সৃষ্টিশক্তির বন্ধন মুক্তি। অন্তত আর কিছু না হোক্, বিপ্লবী বাস্তববাদের সংবন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে কোনো দেশের লেখকেরই বুঝতে দেরী হয় না—কেন লেখকের ক্লাশ ও 'বিপ্লবী বাস্তববাদের' কথা শুনলে নানা দেশের পণ্ডিত ও মানী লোকেরা বিরোধে উগ্র ও ব্যঙ্গে মুখর হয়ে ওঠেন।

আর, বাঙালী সাহিত্যের অবস্থা জান্‌লে নিশ্চয়ই আমরা মান্‌ব—আমাদের লেখকদের লিখ্‌তে শেখার কত প্রয়োজন, কত প্রয়োজন লেখকদের পক্ষে ধারাবাহিক শিক্ষার—অর্থাৎ 'লেখকের ক্লাশের।' শুধু 'লেখকের আড্ডাই' যথেষ্ট নয়, চাই নিয়মিত পড়াশোনা, লেখার অভ্যাস, ওবিদ্যায় দক্ষ মানুষের থেকে পাঠ নেওয়া, আলোচনা-সমালোচনা, এক কথায় 'লেখকের ক্লাশ।' নইলে প্রতিভা জন্মাবে,—কারণ প্রতিভার জন্ম এখনো নিয়ম-রহিত; কিন্তু সুলেখক যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরী হবে না, এবং প্রতিভাবানের জন্যও আসর তৈরী থাকবে না।

॥ সমাজ প্রসঙ্গ ॥

জাতি গঠনের নূতন পথ

একটি ছোট অঞ্চলের কথা দিয়ে বাঙালী সমাজের কথাটার প্রস্তাবনা করব—ত্রিপুরার কথা।

ত্রিপুরার কথা ভাবতে গেলে আজ যা মনে পড়ে তা হচ্ছে এই—এই ত্রিপুর রাজ্য বা ত্রিপুর জাতির দেশ ভারতের সীমান্তের একটি দেশ। পর্বত আর বনে মিলে অনেকাংশে তা আমাদের নিকট পূর্বেও অপরিচিত ছিল, এখন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে তা আবার সাধারণের নিকট আরও দুর্গম হয়ে উঠেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙালার মধ্যেই যখন যাতায়াত এমন কষ্টসাধ্য, তখন এই সীমান্তের দেশটিতে গমনাগমন সহজ হবে কি করে? তাই একই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দেশ হলেও আজ ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আকাশ পথে হয়, আর নইলে হয় অনেক ঘুরে আসাম ও মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়ে।

ত্রিপুরা ও বাঙালা

অথচ ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিম বাঙালার মানুষের যোগ নাড়ীর যোগ। ত্রিপুরাই ছিল একমাত্র রাজ্য যেখানে মাউন্টব্যাটন-যুগের পূর্ব পর্যন্ত শাসন কার্য বাঙালায় চল্‌ত। ত্রিপুরার রাজবংশ ও প্রধানগণ বাঙালা ভাষার ভক্ত ছিলেন। সঙ্গীতে শিল্পচর্চায় বাঙালী সংস্কৃতিতে তাদের দান স্মরণীয়। অবশ্য বর্তমান স্বাধীন ভারতে ত্রিপুরার রাজা নেই, কিন্তু ত্রিপুর জাতিরও যথার্থ স্বাধীনতা লাভ হয় নি। তাদের শাসন চলে নয়াদিল্লীর হুকুমে। তাই ত্রিপুরা ও মণিপুরে যদি বাঙালা ভাষার বদলে 'হিন্দী' নামীয় রাষ্ট্রভাষার বাড়াবাড়ি শুরু হয় তাতে আশ্চর্য হবনা। অবশ্য

ত্রিপুরারাজের নিজ ভাষা কি হবে তা ঠিক করবার অধিকারী ত্রিপুরদেশের জনসাধারণ— যেমন তাঁরাই অধিকারী তাদের দেশ শাসনেও।

ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিবাসীরই (পৌনে চার লক্ষ) মাতৃভাষা আজ বাঙালা। তবু সাড়ে ছয় লক্ষ ত্রিপুরার অধিবাসীর মধ্যে এখনো তিপরাইভাষীর সংখ্যা সোয়া লক্ষের অধিক। সে ভাষায় তাঁর নিশ্চয়ই শিক্ষা-দীক্ষা লাভের অধিকারী এবং তাদের সম্মতি হলেই বাঙালা বা হিন্দী ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র রাজ্যভাষা বলে গণ্য হতে পারে, নইলে নয়। যতটুকু জানি—সাধারণ ভাবে তিপরাইভাষী মানুষরা বাঙালা ভাষাকে ক্রমেই স্বীকার করে নিচ্ছিলেন। মাঝখানকার বিপুল দূরত্ব দূর করে নয়া দিল্লীর সাহায্যেও হিন্দী তাদের মনে সে স্থান স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। অসমিয়া (মাত্র ৩ শত জন তা বলে) সে স্থান গ্রহণ করতে আরও বেশি বাধা পাবে। যদি ত্রিপুরার বাঙালী সাধারণ ত্রিপুরার তিপরাই জনসাধারণের সঙ্গে সমস্বার্থে জড়িত হয়ে গণতান্ত্রিক জীবন গঠন করতে উদ্যোগী হন, তাহলে বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরার নিজস্ব বিকাশের পথ সুস্থির হবে। বাঙালীর মনে রাখা দরকার—ত্রিপুরা রাজ্য আসলে তিপরাই জাতির স্বদেশ, তাকে বাঙালীরও স্বদেশ করতে হচ্ছে তিপরাই জাতির সঙ্গে মিলে মিশে, একাত্ম হয়ে, তাদের দানকে গ্রহণ করে ;—তিন শতাব্দি ধরে এইদিকেই ত্রিপুরাও এগিয়ে চলেছে।

এসব দিকে এখন যেসব বাধা আসতে পারে তা আমরা জানি,—মূলতঃ সে বাধা হচ্ছে শাসক-শোষক শক্তির সৃষ্ট বাধা। ত্রিপুরার জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই তা চিন্‌তে পারছেন। আমার বক্তব্য শুধু এই—বাঙালী বুদ্ধিজীবী, দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালী উদ্বাস্তু ও জীবিকান্বেষী যেন শোষকদের সঙ্গে সাময়িক স্বার্থের চাপে একত্রিত

না হন; হলে স্বাভাবিক ভাবেই তিপরাই জাতির নিকট তাঁরা বাঙালা ভাষা, সাহিত্য, বাঙালী সাংস্কৃতি প্রভৃতিকে ঘৃণ্য করে তুলবেন।

অবশ্য এই জাতি ও ভাষা বিকাশের সমস্যা ছাড়াও ত্রিপুর রাজ্যের সমস্যা আছে,—তাও এই সঙ্গে সমাধান করতে হবে। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য, তা সীমান্তের অঞ্চল, জনসংখ্যাও মোটামোটি অল্প; দেশ বনাকীর্ণ ও পার্বত্য, পথঘাট, যানবাহন প্রায় নেই। এমন রাজ্যের আধুনিক কালের উপযোগী বিকাশ সহজ নয়, আমরা সবাই তা জানি। কি করে এ বিকাশ ঘটবে, সে সম্বন্ধেও কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। কী ধারায় অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন জাতির বিকাশ ঘটেছে, আমরা তার বিবরণ জানলে একটা দৃষ্টান্ত পাই। একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করছি। (মূল বিবরণটি ছিল রুশ ভাষায় সোবিয়েত সাময়িক পত্র 'বোপ্রোসি ইস্‌তোরাই' এর দ্বিতীয় সংখ্যায়; তা সংক্ষিপ্ত করেছে ইংরেজী 'এ্যাংগ্লো সোবিয়েত জর্ন্যাল' ১৯৫৩ এর দ্বিতীয় সংখ্যায়;— তারও সংক্ষিপ্ততর সার এখানে উল্লেখ করছি)।

সুমেরু প্রান্তের দৃষ্টান্ত

রুশ দেশের সুদূর উত্তরের দুটি জাতি—তাইমির ও এভেংকি জাতি। আমরা বলব তারা সুমেরুর মানুষ। রুশরা বলে 'সুদূর উত্তরের সীমান্তবাসী'। এরূপ ছাব্বিশটি জাত ছিল সেই অঞ্চলে জারদের আমলে। ২০টি জাতে মিলে লোকসংখ্যা তখন ছিল মাত্র ৬ লক্ষ। আর অঞ্চলটা?—এক-একটা এলাকা দু'চারখানা অখণ্ড বাঙালা-আসামের থেকে বড়। জাতিগুলি আসলে তখনো যাযাবর; ছোট ছোট পিতৃশাসিত গোষ্ঠী বা কোম (ক্ল্যান) মাত্র। ভাষাও তাদের বিভিন্ন। আর সেই কৌম সমাজ তখনো অত্যন্ত প্রাথমিক পদ্ধতিতে জীবিকা নির্বাহ করে। বল্গা হরিণ পালন ও মাছ

ধরা—এই ছিল প্রধান জীবিকা-অবলম্বন। তবু তাদের যোগানো চাম্ড়ার বিলাস-আচ্ছাদন ও 'ফার'এর চাহিদা ছিল শীতের দেশের সর্বত্র। তাই তার একটা ব্যবসা ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। সেই ব্যবসা সূত্রে এসেছে শোষক বণিক; জার-রাষ্ট্র জাতিদের উপর বসিয়াছে ট্যাক্স; আর এসব কৌম সমাজের মধ্যেও শুরু হয়েছে ছোট ও বড় হরিণ-মালিকের শ্রেণী-বিভাগ। ১৯১৫তে দেখা যায় একটী অঞ্চলে ১৭ জন বিদেশী ব্যবসায়ী সমস্ত ব্যবসা হাত করে বসে আছে। অর্থাৎ জারদের আমল যখন শেষ হচ্ছে তখন এই ব্যবসায়ের চাপে কৌম সমাজে ভাঙন ধরেছে, বংশগত পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে প্রতিবেশী কোমরা আদান প্রদানের সূত্রে একত্র হতে শুরু করেছে; হয়ত এবার তারা পরিণত হবে উপজাতিতে (ট্রাইব)। এসবের কোমের মধ্যেও মালিক ও দরিদ্র নানা শ্রেণী-ভাগ হচ্ছে। তবে সবার উপরে আছে বিদেশীয় বণিক ও জারের শোষণ।

এল অক্টোবর বিপ্লব ১৯১৭তে। তার পরে কোন্ দিকে কি পদ্ধতিতে শুরু হল এই কৌম-সমাজের শেষ প্রান্তস্থিত জাতিদের বিকাশ, তা'ই আমাদের প্রথম দেখবার।

'কৌম-সমাজ' থেকে 'জাতীয় অঞ্চল'

বিকাশের প্রথম পর্ব আরম্ভ হল ১৯২০ এ। ১৯১৭-১৯২০ পর্যন্ত বিপ্লবের বিপর্যয়ে এসব জাতের কেউ খোঁজ রাখতে পারে নি। এগিয়ে এল তারপর কমিউনিষ্ট পার্টি। তুরুক্‌হান্‌সক-এর স্থানীয় পার্টিই কেন্দ্র স্থাপন করলে ক্রাস্‌নোইয়ারস্‌ক্‌-এ। ১৯২১-এ তাদের মাত্র ২৪ জন সদস্য, ১৫ জন শিক্ষানবীশ সদস্য ছিল। কিন্তু তারাই গরীবের মুখপাত্র—শোষক প্রধান ও ওঝাদের বিরুদ্ধে। তাদের উপর অত্যাচারের একশেষ করত সেই প্রধানেরা। এদিকে লেনিনের অনুপ্রেরণায় প্রায় ১১৫ জন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক নানা দলে গেলেন সে অঞ্চলে—জাতিতত্ত্ব গবেষণা করবেন, আর্থিক অবস্থার

গবেষণা করবেন, ইত্যাদি। ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব থেকে বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যই তাঁরা সংগ্রহ করে আনবেন। এই প্রথম পর্বে তবু কৌম সমাজকেই সাময়িক ব্যবস্থারূপে মেনে নিয়ে জাতিদের সংগঠন শুরু হল। সঙ্গে ছিল যাযাবরদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা—৮টি চলন্ত ইস্কুল। ১৯৩০ পর্যন্ত এব্যবস্থাই চলে, কিন্তু আর্থিক জীবনে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯২৬ এ। তার পূর্বেই শোষণের পর্ব শেষ হয়েছে। উত্তর রুশিয়ার শ্রমিক এল কোমদের শ্রমশিল্পে দীক্ষিত করতে। অন্যদিকে 'যাযাবর ইস্কুল' বাড়ল, তার 'চলন্ত ছাত্রাবাস' চল্‌ল যাযাবরের সঙ্গে সঙ্গে। কৌম অর্থনীতিতে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তিত হল। কোমগুলি সে পদ্ধতিতে সোবিয়েৎ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় সরাসরি করতে লাগল। মৎস্য, চর্ম, চর্বি, শিকারের প্রাণী, বাদাম, বল্‌গা হরিণের নানা জিনিষ কৌম-সমবায় সংস্থা বিক্রয় করত। তদতিরিক্ত নানা নূতন কারুশিল্পও সমবায়-সংস্থাই শিক্ষা দিতে লাগল। স্কুল তখন বাড়ছে হু হু করে। সমবায় কেন্দ্রগুলি এরূপে সামাজিক কেন্দ্র হয়ে উঠে। এভাবে কোম (ক্ল্যান) সমূহ উপজাতিতে (ট্রাইব) পরিণত হয়ে উঠছিল তাড়াতাড়ি—যে ধাপে এখন আছে আমাদের তিপ্‌রাই, গাঢ়ো, সাঁওতালরা।

এরপর ১৯৩৬-৩৫ এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। ততদিনে সোবিয়েৎ দেশও 'নেপ' বা নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে সুস্থির হতে পেরেছে।—বাঙলা দেশে আমরা যেন এপর্ব থেকেই যাত্রা আরম্ভ করছি এখনো।

এবার এসব অঞ্চলের অর্থনীতিতেও কারখানার পত্তন করা ও পরিবহনের উন্নয়ন করা হল প্রথম কর্তব্য। ১৯২৯ থেকে সমগ্র সোবিয়েত ভূমি প্রথম পঞ্চবার্ষিক সংকল্পে রূপান্তরিত হতে থাকে। উত্তর অঞ্চলেও দেখি ১৯২৬এ যেখানে শ্রমিক ছিল মাত্র ৮,২০০, (৭ হাজার রুশ, ১,২০০ কৌম সমাজের শ্রমিক) সেখানে শ্রমিকের

সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় লক্ষের উপরে। কৌম শ্রমিকের সংখ্যা ১৭ হাজার। অবশ্য ১৯৩০এ এই কৌম-সংগঠন ভেঙে সাজানো হয় নূতন রূপে—৮টি জাতীয় এলেকায় (ন্যাশনাল এরিয়া)! কিছু কিছু কোম তখন ভেঙে অন্যদের সংগে মিশে উপজাতির (ট্রাইব) মতো গড়ে উঠেছিল। তাদের আর যাযাবর অবস্থা নেই। এসব এলেকা স্থির করা হয় প্রধান যেখানে যে উপজাতি আছে তার, সংগে অপ্রধান কৌমদের নিয়ে,—যাদের আর্থিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ তারাই একত্রিত হয়। যেমন 'এভেংকি জাতীয় অঞ্চলে' শতকরা ৯০ জন ছিল এভেংকি গোষ্ঠীর। কিন্তু 'তাইমীর জাতীয় অঞ্চলে' ছিল দোলগানি, নেনেৎস্ প্রভৃতি পাঁচটি গোষ্ঠীর বহু মানুষ। তা ছাড়া লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যেন এসব বাসিন্দাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে এলেকাগুলি পরিমাণেও যথেষ্ট হয়। যেমন, 'এভেংকি' অঞ্চল জার্মাণী, ব্রিটেন, বেল্‌জিয়াম্-হল্যাণ্ডের মোট আয়তনের থেকেও বড়। 'তাইমীর' অঞ্চল হবে ফ্রান্স ও নরওয়ে একত্র করলে যা হয়, তার থেকেও বৃহৎ।—আমাদের উপজাতি এলেকাগুলি কিন্তু বড় নয়, ত্রিপুরা দার্জিলিং-এ গতায়াত কঠিন, তা স্মরণীয়।

যাযাবর হল গৃহস্থ

এই সংগঠনের ভিত্তিতেই শুরু হল পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের শিল্প-বিপ্লব। আর তাতে এই 'জাতীয় এলেকায়' বিন্যস্ত সংগঠন আরও সুদৃঢ় ও প্রশস্ত হয়ে উঠল—এক-ধরণের ভাষাগুলি তাতে মিলে-মিশে কাছাকাছি এল। কৃষিকর্মেও যৌথ-উদ্যোগ (ক্যালেকটি-ভাইজেশন) প্রবর্তিত হয়েছে। যাযাবর মানুষকে প্রধানতঃ এই যৌথ-কৃষি ব্যবস্থা গৃহস্থ করে ফেল্‌ল। ১৯৩৬ এর পরে তার প্রসার সর্বত্র দেখা গেল। তাই সে সময়কে তৃতীয় পর্ব বলতে পারি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর হলেও কর্মীরা তখন পরস্পরের আত্মীয় হয়ে পড়ছে।

যেমন, 'তাইমীর' অঞ্চলের কিরভ্ যৌথ কৃষিক্ষেত্রে ১৯৪৮এ শতকরা ৪৫ জন ছিল সেন্‌ৎসি, ৪২ জন এন্‌ৎসি, ১০ জন এলগানি ইত্যাদি। একদিকে নৌকা, জাল প্রভৃতি পুরাতন জীবিকোপকরণ বাড়ছে; অন্য দিকে এসেছে বিদ্যুৎ, এসেছে কৃষির সংগে গো-পালন, অশ্ব-পালন প্রভৃতি। আর এসবের সংগেই চলেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার। পূর্বেকার 'যাযাবর বিদ্যালয়' তখন গৃহস্থের স্থায়ী বিদ্যালয় হয়েছে; তার শিক্ষা-বিষয়ও হয়েছে প্রধানত বাস্তব জীবনানুযারী, অথচ তার শিক্ষা পদ্ধতি প্রস্তুত হয়েছে জাতিদের নিজ নিজ ঐতিহ্য অবলম্বন করে। এই বিদ্যালয়গুলিই হয়ে উঠল রাজনৈতিক চেতনার জন্মক্ষেত্র—এখানেই পিতৃশাসিত কৌম-ঐতিহ্য ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

আরও একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এই দিকে। তা হল 'সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি' (কাল্‌চারাল বেজ্)। দূরে দূরে এক একটা কেন্দ্রে এসব স্থাপিত হল—বহু যোজন জুড়ে এক একটি এলেকা। সমস্ত জেলার যেন তা' সদর—বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, স্কুল ও ছাত্রাবাস, শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু-সদন (ক্রেচ) পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল, সমবায় প্রতিষ্ঠান, স্নানাগার, হাওয়া আপিস, বিদ্যুৎ কারখানা ইত্যাদি থাক্‌ত এই সদরে বা 'সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠ-ভূমিতে।' সমাজতান্ত্রিক জীবন গঠনে জনগণকে আকৃষ্ট করাই হল এই 'সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি'র প্রধান উদ্দেশ্য। পরে ক্রমে এই সব পৃষ্ঠভূমিই হয়ে উঠেছে শহর। যেমন তুরা, সাতাংগা প্রভৃতি শহর :—কারখানা, ক্লাব, লাইব্রেরী সব আছে সেখানে।

সংস্কৃতির রূপান্তর

বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র কোমগুলি এভাবে এই সব ব্যবস্থায়—এবং শোষকদের চক্রান্ত ও বাধা না থাকাতে,—১৯২০ থেকে ১৯৪৫ বা ১৯৫০, এই পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে অতিক্রম করে গিয়েছে দু' তিন

হাজার বছরের পথ। বলা বাহুল্য, এই সব জাতিরা সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভাষার বৈষম্যও আপনা থেকে সহজেই সমাধান করে নিয়েছে। ছোটবড় এসব কোনো কোমের ভাষা ১৯২০ এর আগে লেখা হত না! ভাষাতাত্ত্বিকদের কমিশন ১৯২২এ প্রশ্নটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে। হরফ তৈরী করা ১৯৩২এ সমাপ্ত হয়। মূলত তারা নিলে রুশ হরফ, তবে ওসব ভাষার প্রয়োজনানুরূপ সেই হরফে পরিবর্তনও সাধিত হল। এদিকে কোম ভাষা উপভাষা হতে-হতেই অনেক জিনিস গ্রহণ করেছিল। আধুনিক নূতন জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ভাষী আরও পরস্পরের নিকটতর হয়েছে; ভাষার সঙ্গে ভাষার তফাৎ তা'ই কমেছে। অন্য দিকে স্বভাবতই বহু নূতন শব্দ তারা রুশভাষা থেকে গ্রহণ করেছে। প্রকাশকের হিসেবে ১৯৩৪-এর পূর্বেই এসব ভাষায় মোট ২ লক্ষ পাঠ্য বই ও ১ লক্ষ রাজনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; আরও ৪ হাজার ছিল বৈজ্ঞানিক এবং ২ হাজার চিকিৎসা শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ক বই। প্রথম থেকেই একটা লক্ষ্য ছিল এই সব জাতির মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে সাংস্কৃতিক বিকাশের গোড়াপত্তন করা। জন-বিদ্যালয়ে তাই উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ১২ শ' ছাত্র তাতে এখন পড়ছে। লেলিনগ্রাদ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব জাতির ভাষা ও অর্থনীতি পঠনের আরও উচ্চতর ব্যবস্থাও রয়েছে। শিক্ষকদের উচ্চ-শিক্ষণ বিদ্যালয়ও গুটি তিনেক আছে। তাই, এসব জাতির মধ্য থেকেই বেরিয়েছে আজ ডাক্তার, শিক্ষক, কর্মকর্তা (ম্যানেজার), কারুবিদ্, পশু-চিকিৎসক প্রভৃতি। সাহিত্যে শিল্পেও তাদের মানদণ্ড বোঝা যায় নিম্নোক্ত তথ্য থেকে—পুশকিন থেকে আধুনিক রুশ লেখক, সকলের গ্রন্থই তাদের ভাষার অনূদিত হয়েছে; অন্য দিকে সমস্ত রুশিয়া পড়ছে রুশ অনুবাদে এসব নূতন জাতির লেখকদের নিজ নিজ ভাষায় লেখা বই। রুশদের কাছে সুপরিচিত নাম—এভেংকি লেখক এলেক্সি সালকিন, এলেক্সি প্রান্তাজোর,

গ্রিগরি চিন্‌কোব্‌, নিকোলাই তারাবুকিন, চেরকানব্‌, নাজাই লেখক অকিম চশমার; খাজৎ লেখক গ্রিগরি লাজাবোভ্‌, চুক্‌রি লেখক এর মাগিগিন; নেনেৎ লেখক নিকোলাই ভিল্‌কো—ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপই অগ্রসর হচ্ছে তারা শিল্প-কলায়, মূর্তি-শিল্পে, সংগীতে, নৃত্যে, নাট্যে। কোরিয়েফ কিচিগিজের গড়া 'হরিণ-শিশু' কলকাতায়ও প্রদর্শিত হয়েছিল। প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতেও এসব চিত্রশিল্পীরা স্বুবর্ণ পদক লাভ করেছেন অনেকে।

হয়তো অনেক কথাই এখনো আমাদের পক্ষে অজ্ঞাত রয়ে গেল; এবং নিশ্চয়ই ওরকম সুমেরু প্রদেশের যাযাবর জাতিদের বিকাশের উদাহরণ থেকে ভারতীয় সীমান্ত জাতিদের বিকাশ সমস্যা বা ত্রিপুরা রাজ্যের, গাড়োদের কিম্বা গোর্খা, লেপ্‌চা, ভুটিয়া বা সাঁওতাল প্রভৃতি বাঙলার ক্ষুদ্র জাতিদের সমস্যার সমাধান আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করা নিবুদ্ধিতা হবে। কিন্তু আমরা বোধ হয় তার থেকে কিছু ইংগিত পাই। যদি কোনো রাষ্ট্র যথার্থ বৈজ্ঞানিক শুভবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে কোন্ মূলনীতি ও মূল পদ্ধতি অনুসরণ করে তার অন্তর্ভুক্ত পশ্চাৎপদ ও সুদূর এলেকার নানা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীদের আত্মীয় করে আপনার করতে পারে; এবং সমাজ বিকাশের ধারায় বহু-ভাষিক জাতিদের ঐক্য কিরূপে দ্রুত অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারে। নীতিটা হচ্ছে জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি, গণতান্ত্রিক জাতি সংগঠনের নীতি। আর পদ্ধতিটা সববেত আর্থিক উদ্যোগের পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের পদ্ধতি, ইকোনমিক ও কাল্‌চারল প্ল্যানিংর পথ।

বাঙালীরও চাই তাই 'বৈজ্ঞানিক শুভবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র", আর এরূপ প্ল্যানিং। বিশেষ করে অবশ্য এ দায়িত্ব বাঙালী মধ্যবিত্তের; তারাই বাঙলার বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি-কর্মী।

১৩৬১ বাং

বাঙালী জীবনে মধ্যবিত্তের সার্থকতা

বাঙালীর যেন আজ কপাল ফিরেছে। যে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" এত কাল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলনের মাথা হিসাবে বাঙালীর, বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্তের, মুণ্ডপাত না করে জলগ্রহণ করত না, ব্রিটিশ পুঁজির সেই মুখপাত্র আজ মধ্যবিত্তের, বিশেষ করে আবার বাঙালী মধ্যবিত্তেরই দুঃখ-দুর্দশায় গলদশ্রুলোচন। পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থসচিব প্রভৃতি রাজ্য পরিচালকেরা এই মধ্যবিত্তের জন্য গণ্ডায়-গণ্ডায় স্বর্গলোক গঠনে উদ্যোগী—মার্কিন 'পয়েণ্ট ফোর' কর্মসূত্রানুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে মার্কিন ঋণ হস্তগত হলেই হয়! কীর্তিমান রাজপুরুষেরা ও ভাগ্যবান্ ঠিকাদারেরা তখন জেলায় জেলায় মধ্যবিত্তের স্বর্গ গড়ে ফেলবেন। এসব আশ্বাসে বিশ্বাস করেও সুখ! অবশ্য তাঁদের আশ্বাসটি খতিয়ে দেখলে আর তাতে বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেই সুখ শান্তির 'পল্লীর নীড়ই' যদি 'মধ্যবিত্ত সমস্যার' সমাধান হয়, তা হলে ভারতের এই অনাদি কালের স্বয়ং-নির্ভর 'ভিলেজ কম্যুনিটি' গত দেড়-শ দু'শ বৎসরে ভাঙল কেন? এবং এখন সেকালের পল্লীশিল্পের সংগে এ কালের প্রস্তাবিত সাইকেল, টর্চ-লাইট, রেডিওর মেরামতির বিদ্যা জুড়ে দিলেই তা আবার জুড়ে যাবে কিরূপে? আর, সেই কৃষি-নির্ভর সমাজের ওসব মামুলি জোগান জুগিয়ে এ কালের মধ্যবিত্তের জীবিকা-সমস্যা ও জীবন-সমস্যাই বা মিট্‌বে কি করে? আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই—কৃষি-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব এই দুই পরস্পর নির্ভরশীল বিপ্লব সম্পূর্ণ না হলে ভারতবর্ষের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না; আর ও-দুই বিপ্লবের অর্থ—একই কালে কৃষকের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকের আত্মপ্রতিষ্ঠা; এই বৃহৎ জন-সমষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় না

করলে মধ্যবিত্তেরও সমস্যার সমাধান নেই, এ মূলতত্ত্বটা মনে রাখা বুদ্ধিজীবীদের সর্ব সময়েই দরকার।

কারা এদেশের মধ্যবিত্ত ?

কারণ, কারা এই মধ্যবিত্ত ? অতি-পুরাতন ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে লাভ নেই। আধুনিক কালের বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রধানতঃ দু' পর্যায়ের। এক, যাঁরা জমির উপস্বত্ব ভোগ করতেন, প্রধানত মধ্যস্বত্বভোগী; তাঁরাই বরাবরকার মধ্যবিত্ত, অনেকেই তাঁরা ছিলেন উচ্চবর্ণের ও শিক্ষিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যবিত্ত হল প্রধানত এ কালের সৃষ্টি—প্রথম পর্যায়ের থেকেই তাঁরাও উদ্ভূত। গত দেড়-শ বৎসরে এ দেশে যে বৃত্তিজীবী শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এঁরা তাঁরা। এঁরাও জমির উপস্বত্বভোগী হতে পারেন, কিন্তু এঁদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন শিক্ষিত বৃত্তি, প্রায়ই তা মাথার কাজ (প্রাচীন গ্রীসের মতই এ দেশের 'অধ্যাত্ম-বিলাসী' সভ্যতার মানদণ্ডে বরাবরই হাতের কাজ বহু পরিমাণে হেয় ছিল। অবশ্য ইদানীং শিল্প-সভ্যতার আঘাতে ইংরেজী-শিক্ষিত কারুবিদের প্রতিষ্ঠা দিনে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে)। বিলাতে মধ্যবিত্ত বলতে বুঝায় শোষক-শ্রেণীর ছোট বড় 'বুর্জোয়াকে'! এদেশে আমরা মধ্যবিত্ত বল্‌তে বুঝি প্রায়ই শোষিত চাকুরে ও 'পেটি বুর্জোয়াকে', এবং কতকাংশে আধা সামন্তধর্মী শোষক শ্রেণীর ক্ষুদে জমিদার, তালুকদার, জোত-দারদের—দু'দেশের 'মিড্‌ল ক্লাসের' এই প্রধান পার্থক্যটা সমাজ-তাত্ত্বিকদের বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আমাদের মধ্যবিত্তের এই শোষক 'আধা-ফিউডাল' ভাগটি ক্ষয়িষ্ণু। অবিভক্ত বাঙলার একটা হিসাবে দেখা গিয়েছিল দু চারশ' স্বচ্ছল পরিবার থাক্‌লেও এই লক্ষ লক্ষ মধ্যস্বত্ববান্‌ পরিবারের ভূমি থেকে গড়ে আয় হয় মাসিক ১২৲ টাকা মাত্র। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জমির উপর নির্ভর করে এই সব মধ্যবিত্ত

পরিবারের ১ জনেরও জীবিকা নির্বাহ সম্ভব নয়। তবু যে এঁরা জমি আঁকড়ে পড়ে থাকেন তার কারণ—অভ্যাস ও ঐতিহ্য মাত্র নয়, জীবিকার্জনের অন্য কোনো পথ এঁরা দেখতে পান না। আসলে এঁরা বেকার বা অর্ধ-বেকার পর্যায়েরই মানুষ। মধ্যবিত্তের অন্য অংশটি অবশ্য কেরানি, উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার থেকে দোকানী ও দালাল প্রভৃতি নানা বৃত্তিজীবী। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন আজ বেকার, আরও শতকরা ৩০ জন কিছু না-পেয়েই 'স্বাধীন জীবিকা' গ্রহণ করে (হয় দোকানী নয় দালাল হয়, মাষ্টার হয়)—অর্থাৎ তারা আসলে অর্ধ-বেকার। বাকী ৩০ জন বেতনজীবী বা 'ওয়েজ আর্ণার'—মাত্র ৫ জন তাদের মধ্যে 'স্বচ্ছল' অবস্থার, বাকী ২৫ জনের অবস্থা সংকটজনক। বেতন সামান্য, তার উপরে যেখানে এতবড় প্রকাণ্ড বেকার দলের মানুষ কর্মপ্রার্থী, সেখানে মালিক-শ্রেণী যখন তখন যেভাবে খুশী শ্রমিক ও কর্মচারীদের জবাব দিতে পারে, বেতন কাট্‌তে পারে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর জীবিকার কোনো স্থায়িত্ব নেই। সরকারী কাজেও অনেকেই 'অস্থায়ী'।

মধ্যবিত্তের আয়-ব্যয়

এই মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের অবস্থা কি তার একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছিল সরকারী 'ইকোনোমিক এডভাইসারের' একটি রিপোর্ট থেকে*—সে রিপোর্ট ১৯৪৫-৪৬ সালের, অর্থাৎ ১৲ টাকার জিনিসের দাম, যখন যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় ৩৲ টাকার কম, এবং ৪৲ টাকার দিকে চলেনি। আর সে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় সরকারী কর্মচারী ও

*১৯৫১ সালের পশ্চিম বাঙলার লোক-গণনার রিপোর্টের বিশ্লেষণ এই আলোচনার শেষে উদ্ধৃত হল। মূলত পরিবর্তন সত্যই ঘটছে কিনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে বুঝা যাবে। বলা বাহুল্য, তাতেও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা হয় নি।

রেলওয়ে কর্মচারীদের জীবন যাত্রার হিসাব থেকে। অর্থাৎ এ হিসাব অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল বেতনের কেরানিদেরই অবস্থার সূচক, সাধারণ কেরানি কর্মচারীর নয়। এ রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল— কলিকাতার ও-রূপ মধ্যবিত্ত পরিবারের (পরিবারের পোষ্য ৭ জন ধরে) গড়পড়তা মাসিক আয় ২২৯৸৶, মাসিক ব্যয় ২৭৬৶ ; বাঙলা ও আসামের মধ্যবিত্ত (পরিবারে পোষ্য ৭ জনের একটু কম) মাসিক আয় ১৯৮।৵ মাসিক ব্যয় ২৭৯।৵ ।

কলিকাতার সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাত্রার উপযোগী আয় ও-রূপ সময়ে বে-সরকারী হিসাবে হওয়া উচিত ছিল প্রায় ১০০৲ টাকা। কেউ কেউ বলেন তা ১৫০৲ টাকা হলেই শ্রমিক 'মানুষের মত' বাঁচতে পারে। অবশ্য বেঁচে মরে-থাকা শ্রমিকেরা যেখানে যা পেত তাই গ্রহণ করতে বাধ্য হত—সে ৩০৲ টাকাই হোক্ কি হোক্ ৭৫৲ টাকা।

মধ্যবিত্তের আত্মদ্রোহ

বঙ্গ-বিভাগের পূর্বক্ষণের এই হিসাব থেকে আমরা মনে করতে পারি যে (১) মধ্যবিত্ত হচ্ছে তারা যারা 'আয়ের অঙ্কে' অন্তত পরিবার পিছু ১৫০৲ থেকে ৩০০৲ টাকা মাসিক রোজগার করে। ৫০০৲ টাকার এরূপ রোজগারীকে স্বচ্ছলও হয়ত বলা যেতে পারে। কিন্তু ১৫০৲—৩০০৲ আয়-গণ্ডীর মানুষই মধ্যবিত্তের প্রধান অংশ— নিম্ন ও মধ্যস্থিত মধ্যবিত্ত। (২) সাধারণ ভাবে আজ তারা শোষক পর্যায়ের নয়, বরং শোষিত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আজ তাদের স্বার্থ কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব। (৩) ঐতিহ্য হিসাবে আজও তারা শিক্ষিত শ্রেণী, প্রধানত ভদ্রলোক (অনেকাংশে উচ্চবর্ণেরও— যাদের বলা যায় 'হোয়াইট কলার লেবার' বা ধোপায়-কাচা কাপড়-পরা কর্মচারী), চায় ভদ্র জীবিকা, অর্থাৎ প্রধানত কলম-পেশার কাজ এবং শিক্ষিত কারুবিদের বৃত্তি—'হাতের কাজে' তারা

সাধারণত বিমুখ। এদেশের মজুরদের জীবন, তার দৈন্য-গ্লানি-কুশ্রীতার পীড়িত পরিবেশ, শ্রম-কার্যের জন্য অমর্যাদা-বোধ, আচার আচারণ, এসব এই মধ্যবিত্তের নিকট বিভীষিকা। কারণ, একথা সে মর্মে মর্মে বোঝে যে, সে নিজেও "বেতনের বান্দা" মাত্র (ওয়েজ স্লেভ), এবং আজকের সমাজে আয় যথেষ্ট না থাকলে কেউ 'ভদ্রলোক' থাক্‌তে পারে না। শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে যতই সে বুঝছে সেই ভদ্র শ্রেণী থেকে আসলে সে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে ও গিয়েছে, ততই এই 'ক্ষুদে মধ্যবিত্তের' চেষ্টা হচ্ছে বেতন-জীবী শ্রমিকের জীবনকে দূরে ঠেলে দিয়ে কোনরূপে "ভদ্রলোক" নাম বজায় রাখবার; যে-কোনরূপে নিজের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত স্বার্থকে সর্বস্ব করে চাকরির বাজারে আয়ের হিসাবে একধাপ উপরে উঠে আবার একটু নিঃশ্বাস ফেলবার।

এ ধরণের মধ্যবিত্ত শুধু দৈহিক শ্রম-বিমুখ বা শ্রমিক-বিরোধী নয়, আত্মদ্রোহীও। কারণ তাদের দু'একজন যদিবা একটু উচ্চ আয় লাভের সৌভাগ্য লাভ করে, বর্তমান আর্থিক অবস্থায় শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্তের পক্ষে এভাবে স্বচ্ছল পরিবারে পরিণত হওয়া সম্ভবপর নয়। বরং বর্তমান সমাজে মধ্যবিত্তের অধিকাংশের পক্ষে নিম্ন থেকে নিম্নতর মধ্যবিত্তের পর্যায়ে নামতে নামতে আসলে শ্রমজীবী পর্যায়েই গিয়ে পৌঁছান অনিবার্য। অর্থাৎ আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই শোষিত মধ্যবিত্তের স্থান শ্রমিক-শ্রেণীরই সঙ্গে। বলা বাহুল্য, পৃথিবী জুড়ে মধ্যবিত্তের সংকট মূলত এই ঃ সে শোষিত হয়ে ক্রমশ শ্রমিকশ্রেণীতে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু পৃথিবী জুড়েই মধ্যবিত্ত তবু এই মানসিক রোগে ভোগে, আত্মদ্রোহে পর্যুদস্ত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিও তার বিরূপতা জন্মে নিজের এই সমাগত ভাগ্যলিপি বুঝে, শ্রমিক জীবনের কঠিন দৈন্যের বিভীষিকা দেখে ঃ—এই হ'ল সাধারণ কথা। যারা কার্যত শ্রমজীবী হয়েও সমাজে শ্রমিক হিসাবে পরিচিত হতে চায়না,

তারাই হ'ল এদেশে সাধারণ মধ্যবিত্ত, অন্যত্র "হোয়া'ট কলার লেবার"।

সমস্বার্থের নূতন চেতনা ?

কিন্তু এরই মধ্যে তবু আরও একটি বোধ তার চেতনায় এসেছে—মালিক শ্রেণীর যদৃচ্ছা ছাঁটাই ও বেতন-কাটায়। শোষণে ও পেষণে মধ্যবিত্ত কর্মচারী বুঝেছে সংঘবদ্ধ না হলে তার উপায় নেই। এবং সংঘবদ্ধ হতে হলে একত্রিত হয়ে দাঁড়াতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্শ্বে, শ্রমিকদের সঙ্গে। আবার, পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশে সমাজতন্ত্র ও বিরাট শিল্প-সমাবেশ দেখে বাঙালী শিক্ষিত কর্মচারী বুঝেছে যে, মাথার কাজের কর্মী হিসাবে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা-লাভ সম্ভব তখনি যখন শোষণহীন বাবস্থায় ও শ্রেণীহীন সমাজের পত্তন হবে—তখন শ্রমিকশ্রেণী পাবে নেতৃত্ব, একাধিপত্য ; আর 'মাথার কাজের মজুর' হিসাবে শিক্ষিত শ্রেণীও পাবে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সম্মানিত স্থান। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বিপ্লবের সহকারিতা করে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্বার্থবিলোপ করে, তবেই শিক্ষিত সাধারণের ভদ্রচেতনা ও ভদ্র ঐতিহ্যের উদ্ধার লাভ সম্ভব—শ্রেণীহীন সমাজেই সম্ভব 'বুদ্ধিজীবী শ্রমিক' রূপে এই 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' মানুষের আর্থিক ও নৈতিক সিদ্ধি-লাভ—তা ছাড়া মধ্যবিত্তের কোথাও উদ্ধারের উপায় নেই।

গণতন্ত্রী ঐক্যের সংগঠক

এই দুই অভিজ্ঞতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ আজ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একত্র দাঁড়াতে উদ্যোগী হ'চ্ছে। ইস্কুল কলেজ, রেল, ডাক, তার, ব্যাঙ্ক, সওদাগরী আপিসের কর্মচারী সংগঠন দেখলে আর সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। বিশেষ করে, এ উদ্যোগ বাঙলা দেশে সম্ভবপর। কারণ এ দেশের মধ্যবিত্ত আসলে শোষিতেরও মধ্যে অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত—তাদের স্বার্থ আজ এদেশের সমাজ

বিপ্লবের এ পর্যায়ে—শ্রমিকের কৃষকের সঙ্গে মূলত এক,—প্রয়োজন কৃষকের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও দেশের শিল্পোন্নয়ন। এদেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীও বিশেষকরে এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তকে আপনাদের সহযোগী হিসাবে অভিনন্দন করবে—যদি মধ্যবিত্ত সেই 'ভদ্র' অহমিকার বশে দূরে সরে না থাকেন। কারণ, আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের একটা প্রধান প্রয়োজন—শিক্ষিত মানুষের সহায়তা। আমাদের অধিকাংশ শ্রমিক ও কৃষক নিরক্ষর। নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ম চালাতে তাঁরা যে 'মাথার কাজের মজুরদের' স্বাভাবিক ভাবে সাহায্য চাইবে তাতে সন্দেহ কি? আর, সেই 'মাথার কাজের মজুর' যদি তার মাথা এই সংগঠনকর্মে খাটাতে না চায় তা হলে তার মত মূর্খ আর কে? তেমনি, নিজেদের কৃষকসভা চালাতে, গ্রামের সমবায় সংস্থা চালাতে, পল্লী-সংগঠনে গ্রামের কৃষকও যে প্রথমেই ধরবে তার গ্রামের শিক্ষককে, গ্রামের ডাক্তারকে, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই।

আজকের গণতান্ত্রিক বিন্যাসে তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-গঠনে প্রধান সংগঠক হতে পারেন, তাতেই তার সার্থকতা। কাজের ক্ষেত্র একবার এগিয়ে গেলে দেখা যাবে—শুধু রেলে ডাকে-তারে নয়, প্রত্যেকটি বড় শিল্পেরই শ্রমিক সংজ্ঘে আজ কেরানি ও কর্ম্মচারীরা আপনার স্বার্থে যেমন যোগ না দিয়ে পারবেন না, তেমনি তাতে যোগদান করলে, শ্রমিক সাধারণের সহযোগে, নৈকট্যে, বাস্তব স্পর্শে আপনার অর্থিক মানসিক চেতনাকে তাঁরা সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় করতে পারবেন।

বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত যখন শূন্যবিত্ত, তখন তাদের প্রধান সার্থকতার পথ হল নিজেদের জন্মগত 'শ্রেণী'-মার্কা ত্যাগ করে বুদ্ধিজীবীরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। আর্থিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় মধ্যবিত্তের বিলোপ যেমন নিশ্চিত, বুদ্ধিজীবীর বিকাশও তেমনি ভাবী সমাজে আরও সুস্থির।

বাঙলার বাস্তব রূপ

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী"—

দেশ অর্থ যে মাটি ও মানুষ, তা আমরা সহজে বুঝতে চাই না।

এ-কালের এই দেশপূজার গোড়াপত্তন করে গিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র; কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'-এ তার সূচনা, আর 'আনন্দমঠ'-এর মাতৃমূর্তি-কল্পনায় ও 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে তার বিকাশ। বঙ্কিমের মাতৃমূর্তি ছিল বঙ্গমাতার মূর্তি, ভারতমাতার মূর্তি নয়। কমলাকান্তের 'দুর্গোৎসব' ও 'বন্দে মাতরম্' গানে তা সুস্পষ্ট। বাঙলার রূপ বঙ্কিম যে-চক্ষে দেখেছিলেন তা প্রধানত ভাবতান্ত্রিক মানুষের চক্ষু, ভাবুক ও দেশ-প্রেমিকের চক্ষু। অনেকাংশে এই দৃষ্টিতেই বাঙালী স্বদেশকে দেখে এসেছে; সে-দৃষ্টিতে স্ট্যাটিসটিক্স্, গেজেটিয়ার তুচ্ছ; ভাবময় পরিকল্পনাই প্রধান।

পরিসংখ্যানের বাঙলা

অথচ বঙ্কিমের সমকালেই বাঙলা দেশের খড়-মাটিতে তৈরি একটা তথ্যগত রূপ শাদা চোখে ধরা যেত। হণ্টার প্রমুখ সাম্রাজ্য-ভক্তরা তৎপূর্বেই পরিসংখ্যান সংকলন করছিলেন। এবং যত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হোক, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের আদম-শুমারিও প্রথম আরম্ভ হয়। তাতে সমসাময়িক বাঙলার রূপ কিছু-না-কিছু তথ্যাবলীর মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমও তখনকার ইংরেজ-শাসনের নামাঙ্কিত প্রদেশকেই বাঙলা দেশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ১৮৭২-এর আদম-শুমারিতে বাঙলা প্রদেশ বলতে বোঝাত এখনকার পশ্চিম বাঙলা, পূর্বপাকিস্থান এবং তদতিরিক্ত এখনকার বিহার, ওড়িষ্যা, ছোটোনাগপুর প্রভৃতি (তৎকালীন ১১টি) সরকারী বিভাগ। তার আয়তন ছিল

২,৪৮,২৩১ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ছিল ৬,৬৮,৯৬,৮৫৯। ‘সাতকোটি বাঙালী’ বললে তখন বাঙালীর মধ্যে শুধু এ ভূভাগের গোর্খা, সাঁওতাল প্রভৃতিদেরই ধরা হত না, নির্বিচারে আমরা ওড়িয়া, বিহারী ও অসমীয়াদেরও বাঙালী নামের টিকিট মেরে দিতাম। তখনকার দিনে বঙ্কিমের বাঙলাও ছিল ‘সপ্ত-কোটিকণ্ঠ কল-কল-নিনাদ করালে দ্বিসপ্তকোটি-ভূজৈর্ধৃত খরকর-বালে’র বাঙলা। সে বাঙলা তার বাহুবিস্তার সংরুদ্ধ করে ১৯১১ সালের আদম-শুমারিতে দেখা দিয়েছিল ৮৪,০৯২ বর্গ মাইলের ৪,৬৩,০৫,৬৪২ জন অধিবাসীর বঙ্গদেশ হিসাবে। ১৯৪১ সালে তার আয়তন দেখি—৮২,৮৭৬ বর্গ মাইল, আর জনসংখ্যা ৬,১৪,৬০,৩৭৭। এই হয়তো অখণ্ড বাঙলার (মানভূম, পূর্ণিয়া ও ধুবড়ি শ্রীহট্ট-কাছাড়-বিহীন, দার্জিলিং-সিকিম সুদ্ধ) শেষ রূপ।

১৯৫১ সালের আদম-শুমারিতে এসে প্রথমেই বলতে হয়—বাঙালীর সেই বাঙলা আর নেই, এখন আছে ‘পশ্চিম বাঙলা’ ও ‘পূর্ব পাকিস্তান’। ইতিহাসে বাঙালী ছিল চিরদিনই বাঙালী, সে চট্টগ্রামের হলেও ‘বাঙালী,’ মেদিনীপুরের হলেও ‘বাঙালী’; তার ভৌগোলিক ও জাতিগত একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল—এখনো তা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রগত বিচ্ছেদে তার অখণ্ড রূপকে এখন আর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় ছাড়া পরিসংখ্যানের হিসাবে ধরা যাবে না। ১৯৫১ সালের আদম-শুমারির বিবরণে পাব ‘পশ্চিম বঙ্গের’ হিসাবটুকুই মাত্র—অখণ্ড বাঙলার ছ-আনির তথ্য। বাকি দশ-আনির তথ্য করাচির দপ্তরখানায় ঘষা-মাজা হয়ে উঠবে। সেই দশ-আনির তথ্য এই ছ আনির তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ষোলো-আনা বাঙলার রূপ ফুটিয়ে তোলা যাবে কিনা সন্দেহ। এই দুর্ভাগ্য ও দুর্দৈবের দানকে মেনে নিয়ে ৩১,৫২৪ বর্গ মাইলের ২,৪৯,৯৭,৯৪২ জন অধিবাসীর এই পশ্চিম বাঙলার ১৯৫১ সালের আদম-শুমারির বিবরণী আমাদের সামনে বাঙলার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছে

(পুরুলিয়া সদরের খণ্ডিত অংশ ও পূর্ণিয়ার পূর্বাংশ ১৯৫৬ এর প্রস্তাব মত পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলে এই ভূমি পরিমাণ আরও ৩ হাজার বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা ১৪ লক্ষর মত বৃদ্ধি হবে)। শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র আই-সি-এস্ মহাশয়ের প্রণীত এবারকার এই রিপোর্ট (ভারতীয় আদম-শুমারির ৬ষ্ঠ ভল্যুম, 'পার্ট ওয়ান-এ') ও 'আমার দেশ' প্রকাশিত হবার পর পশ্চিম বাঙলার তথ্যগত পরিচয় গ্রহণে আর কোনো অসুবিধা নেই।

সর্বাঙ্গীণ চিত্র

আদম-শুমারি একটা বৈজ্ঞানিক কর্ম হিসাবে একালে গণ্য হয়েছে। শুধু লোকগণনা নয়, লোক-জীবনের আর্থিক-সামাজিক বা তথ্যগত পরিচয়রূপে এখন তা পরিণত হচ্ছে। অবশ্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সুনিশ্চয়তা ভারতীয় আদম-শুমারির হিসাবে এখনো আশা করা যায় না; কারণ, তদনুরূপ ব্যবস্থাপনা এখনো দুঃসাধ্য রয়েছে। একথাও সবাই জানি, ১৯৪১-এর বাঙলার আদম-শুমারি হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা বাড়াবার দ্বন্দ্বে অনেক বিষয়ে প্রায় অগ্রাহ্য করবার মতো—১৯৫১ সালের বিহার ও আসাম রাজ্যের আদম-শুমারি যেমন বাঙালী-কমানোর তাড়নায় অংশবিশেষে পরিত্যজ্য। ভাগ্যক্রমে পশ্চিম বাঙলায় সাধারণ-ভাবে এই ১৯৫১ সালের আদম-শুমারিতে এমন ত্রুটি ঘটবার কারণ ছিল না। শুমারের কর্তৃপক্ষও নিজেদের তথ্যনিষ্ঠার তাই যেখানে প্রয়োজন বিশেজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন, এবং জনসাধারণের সহযোগিতা লাভেও তাঁদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটে নি। এবারের পশ্চিমবঙ্গের আদম-শুমারি তাই শুধুমাত্র দপ্তরখানার চোখে দেখা 'বাঙলার রূপ' হয় নি, হয়েছে বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখা 'বাঙলার রূপ' এবং সাধারণ বাঙালীর চোখে দেখা 'বাঙলার রূপ'। আদম-শুমারির ইতিহাসে এ

জিনিস শুধু অভিনব নয়, ভারত-রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যের আদম-শুমারির বিবরণের তুলনায়ও পশ্চিম বাঙলার আদম-শুমারির বিবরণ একটি ব্যতিক্রম—শুধু তা আদম-শুমারিও নয়, পশ্চিম বাঙলার একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র।

তার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখলেও চমৎকৃত হতে হয়। প্রকাণ্ড ডেমি কোয়ার্টো আকারের (ভারতীয় আদম-শুমারির ৬ষ্ঠ ভল্যুমের অন্তর্গত) খণ্ডগুলি ও তৎসম্পর্কিত গ্রন্থগুলি তার সাক্ষ্য। সাধারণ ভাবে ১৯৫১এর বাঙলার এই আদম-শুমারি-সাহিত্যের হিসাব নিলে পঃ বাঙলার রূপ আজ দেখা যাবে।

বর্তমান বিবরণ

মূল বিবরণ ("রিপোর্ট") 'পার্টওয়ান-এ' ৫৮৭ পৃষ্ঠার বিবরণী। 'ভূমিকা' ছাড়া এই বিবরণীতে আছে বড় বড় পাঁচটি পরিচ্ছেদ, এবং পরিশেষে (নির্ঘণ্ট ছাড়া) পাকা আঠারো পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী। 'ভূমিকার' প্রথম ভাগে আছে পশ্চিম বাঙলার গেজেটিয়ার বা ভৌগোলিক কোষ, অর্থাৎ ফল, জল, মাটি ও মানুষের খবর, যা সাধারণতই শুষ্ক, কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে নিরর্থক নয়, এমন কি কৌতুহলোদ্দীপকও হতে পারে। যেমন, বাঙলার নদ-নদী ও জলসেচ বাঁধের কথা (অনুচ্ছেদ ১০৬-১১৩) পড়তে কি কারও শ্রান্তি আসবে ? কিংবা (১১৩ অনুচ্ছেদের) যন্ত্র-শিল্পের বিন্যাস বিষয়ে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য কি কম উল্লেখযোগ্য ? কারণ, মূল-শিল্পের বিচারে কলিকাতা-হুগলি এলাকা অপেক্ষা আসানসোলই যন্ত্র-শিল্পের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। অথচ আসানসোলে বাঙালী সে তুলনায় কোথায় ? মাটি ও মানুষের এই বর্ণনার পরে ১৯৫১-র জীবনযাত্রার পশ্চাৎপট হিসাবে দেখা যেতে পারে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০, এই বিশ বৎসরের বাঙলার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মেদিনীপুরের বান-তুফান,

দামোদরের বন্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে ১৯৪৭-এর বঙ্গ-বিভাগ, এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার আর্থিক দুরবস্থার কথা এখানে পাই।

উপজীবিকার শ্রেণী

আর্থিক হিসাবের দিক থেকে আটটি শ্রেণী বা জীবিকা-সম্পর্কিত বর্গে ভারতীয় সমাজকে 'আন্তর্জাতিক শ্রেণী-বিভাগ রীতি' অনুসরণ করে এবার আদমশুমারিতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি এরূপ বর্গ বা শ্রেণীর ১৯৩০—১৯৫০ পর্যন্ত আর্থিক অবস্থা পশ্চিম বাঙলার বিবরণীতে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে বিবেচিত হয়েছে। এ বর্গ-বিভাগ পদ্ধতি সর্ব-ভারতীয়, শুধু পশ্চিম বাঙলার নয়। পঃ বঙ্গে বর্গগুলির অবস্থা নিম্নোক্ত ধরণের :

কৃষিজীবী বর্গ চারিটি : (মোট জন সংখ্যার অনুপাতে ৫৭·২ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল)

॥ ক ॥ প্রথম বর্গ—মালিক চাষী, নিজের জমি নিজেই চাষ করে। (মোট ৩২·৩৪ শতাংশ)

দ্বিতীয় বর্গ—ভাগচাষী, যে-জমি চাষ করে তার মালিক সে নয়। (মোট ১২·০১ শতাংশ)

তৃতীয় বর্গ—ক্ষেত-মজুর বা কৃষি-মজুর (মোট ১২·২৬ শতাংশ)

চতুর্থ বর্গ—খাজনা ভোগী জমির মালিক, জমিদার, জোতদার প্রভৃতি (মোট ০·৬০ শতাংশ)।

॥ খ ॥ অ-কৃষিজীবী চারটি বর্গ (মোট জনসংখ্যা অনুপাতে ৪২·৮ শতাংশ অ-কৃষিজীবী) ; যথা :

পঞ্চম বর্গ—শিল্পাশ্রয়ী উৎপাদক (মাছধরা, পশুপালন, কল-কারখানার মিস্ত্রির কাজ প্রভৃতি নানা কারুবিদ্ ; মোট ১৫·৩৬ শতাংশ)

ষষ্ঠ বর্গ—ব্যবসায়ী (দোকানী, পশারী, বণিক; মোট ৯·৩২ শতাংশ)

সপ্তম বর্গ—পরিবহন কর্মী (মোট ৩·০৫ শতাংশ)

অষ্টম বর্গ—বিবিধ বৃত্তিজীবী (এই বর্গেই প্রধানত বাঙালী 'ভদ্রলোক' বা শিক্ষিত 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণী গণ্য হয়। মোট ১৫·০৬ শতাংশ)

১৯৩০ থেকে ১৯৫০, এই বিশ বৎসরে পশ্চিমবাঙলায় প্রধানত মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরে এবং শেষে দেশ-বিভাগের ঘাত-প্রতিঘাতে যে গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছে এখনকার বাঙালীর জীবনযাত্রা তাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পশ্চিমবাঙলার বিবরণীতে বর্গানুক্রমে সেই বিপর্যয়ের ফলাফল উপস্থিত না করলে কিন্তু সে-কাহিনী অনেকাংশে অবাস্তব থেকে যেত। শুমারি থেকে দেখি তীব্র মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণত কল-কারখানার শ্রমিকদের বেতন যুদ্ধকালে কতকটা বেড়েছিল, কিন্তু কৃষিজীবীদের (প্রথম থেকে চতুর্থ বর্গের) আয় তত বাড়েনি এবং মধ্যবিত্তদের (অষ্টম বর্গের) আয়ও বাড়েনি। ব্যবসায়ী ও পরিবহন-জীবীদের আয়বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি যে অনুপাতে হয়েছে সে অনুপাতে শ্রমিকেরও আয় বাড়েনি—টাকার বেতন বেড়েছে, আসল বেতন বাড়েনি। জীবনযাত্রার মান সমগ্রভাবে উচ্চতর হয়নি, 'বিবরণীর' সাক্ষ্য সে সম্বন্ধে পরিষ্কার।

এই মূল কথা মনে রেখে দেখি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পঃ বঙ্গ শিল্পে একটু উন্নত। কিন্তু, সেই সঙ্গে আরও দু'একটি তথ্য লক্ষ্যণীয়। যেমন, কৃষিজীবীদের মধ্যে যারা সত্যই চাষ করে তারাই অনেকে দুর্দশাপন্ন, আর তাদের মধ্যেও আবার অনেকে হচ্ছে তফ্‌সিলী সম্প্রদায়ের ও খণ্ডজাতের

(সাঁওতাল, গারো ইত্যাদি উপজাতির) লোক। ৪৭ লক্ষ তফ্সিলী হিন্দুর মধ্যে ৩২·৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী, আর ১১·৭৫ লক্ষ খণ্ডজাতির মধ্যে ৯·২৫ লক্ষ কৃষিজীবী। তাদের জীবনে উচ্চতর আশা নেই; কৃষিতেও তাই উৎপাদন ব্যাহত। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় নিজের জমি নিজে চাষ করে বা নিজের তত্বাবধানে চাষ করে—এমন কৃষিজীবীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাপেক্ষা কম। এরূপ দেশে জমির ও উৎপাদনের অবনতি অনিবার্য। এ অবস্থার পরিবর্তন না হতে, কৃষক জমির মালিক না হলে কৃষিসংকট দূর হবে না।

অন্যদিকে দেখা যায় লোকের অনুপাতে জমির মালিক বা খাজনা ভোগীদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের অনুপাতই বেশি। এরাই শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পায়, 'ভদ্রলোক' শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বল্‌তে তাদেরই প্রায় একচেটিয়া।

'উপার্জকের' হিসাব দেখলে দেখা যায় শতকরা ৫৭·৪ জন কর্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৩১·৫ জন 'উপার্জক'। গত ৫০ বৎসর ধরে কৃষিতে উপার্জকের সংখ্যা কমেছে। (১৯৫১তে ১৪·৯ শতাংশে তা দাঁড়িয়েছে)। কিন্তু অকৃষি-উপজীবিকায়ও তাদের স্থান হয় নি। কারণ, ৫০ বৎসরেও সে উপজীবিকার হার বাড়েনি।

বেকার বা শিক্ষিত বেকারের (প্রবেশিকোত্তীর্ণ) হিসাব নেই। কিন্তু ১৯৫২তে 'ক্যাপিটেলের' হিসাবে দেখা গিয়েছিল কলিকাতায় প্রতি ৪ জন কর্মক্ষমে ১ জন বেকার। সরকারী চাকরির জন্য (ভারতে) প্রতিমাসে ২৫০০ শিক্ষিত লোক দরকার, (বৎসরে গড়ে ৩০,০০০); ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডিগ্রিই পায় বৎসরে ৪৫ হাজার। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লীর তুলনায় কলিকাতায় বেকার ডিগ্রিধারীর সংখ্যা আবার সর্বাধিক। অর্থাৎ একটা নিঃস্ব শিক্ষিত বৃত্তিজীবী অংশ আমাদের সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লোকবৃদ্ধি

১৯৫১-র বিবরণী এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান পশ্চিম বাঙলার তথ্য-বিশ্লেষণ করেছে। স্বভাবতই প্রথম পরিচ্ছেদ হচ্ছে জনসংখ্যার বিবরণ। তার প্রথম পর্বে (সেক্‌শন) লোকসংখ্যার বণ্টন, বিভাগ, বৃদ্ধি, জন্ম, মৃত্যু আর জীবিকা-বিন্যাসের কথা, ২৫০ পৃষ্ঠা জুড়ে এই তথ্য-বিশ্লেষণ। এ-পরিচ্ছেদের শেষাংশে ৭ম ৮ম পর্বে (পৃ ৩৬৩ থেকে) যে-সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে তা এই যে, আমাদের লোকবৃদ্ধি ১৯২০ পর্যন্ত অস্বাভাবিকরূপে ব্যাহত হয়ে এখন স্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে ; আরো কিছুকাল এই হারেই বাড়বে ; এই লোকবৃদ্ধি মোটেই ব্রিটেন প্রভৃতি অন্যদেশের তুলনায় অত্যধিক গতিতে হয়নি। কাজেই নিছক লোকবৃদ্ধির জন্য সমাজতাত্ত্বিকদের দুর্ভাবনা নিরর্থক। এবং আমাদের আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতির জন্য এই লোকবৃদ্ধিকে দায়ী করাও অহেতুক। সর্বভারতীয় আদম-শুমারির কর্তারা অবশ্য এই অভিমতের বিপরীত সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারতের লোকবৃদ্ধি ভারতবাসীর শুধু নয়, পৃথিবীর পক্ষেও আশঙ্কাজনক, এ-ধুয়াটা কয়েক বৎসর ধরে মার্কিন-ব্রিটিশ মহলের দ্বারা সুপ্রচারিত হচ্ছে। তাদের প্রভাবিত ভারতীয় অধ্যাপক-গবেষক মহলেও তাই এই কথার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয় ; এবং ভারত-সরকারের পরিচালক পণ্ডিত নেহরু ও স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকাউরও জন্মহ্রাসের উপদেশ দেন। কিন্তু মনে হয় অতি-সম্প্রতি তাঁদের এ-বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে পারে। কারণ, চীন-ফেরত ভারতীয় এঞ্জিনিয়াররা আবিষ্কার করেছেন যে, চীনের সরকার বহু উন্নতির কাজে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের যন্ত্রবলের অভাব লোকবল দিয়ে পূরণ করে ; এ দেশের লোকবলও নানা উন্নয়নের কাজে সেভাবে সার্থক করা যেতে পারে। অর্থাৎ লোকবলটা যে একটা পরমাশ্চর্য বল —একথাটা হয়তো এখন ভারতীয় পণ্ডিত ও শাসকেরা

পুনরাবিষ্কার করতে পারেন। তা হলে এ-বিষয়ে ভারতীয় আদমশুমারির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কে এম পানিকর (রিপোর্টে উদ্ধৃত) ও অশোক মিত্রের সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তই তাঁদের নিকট বেশি গ্রাহ্য হয়ে উঠবে। একদিকে কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং জমির উপর বৃত্তিহারা জনতার চাপ কমানো, আর অন্যদিকে কলকারখানা, পরিবহন, ব্যবসা প্রভৃতি জীবিকা পথকে প্রশস্ত করে তোলা—এই হবে আমাদের জনসমস্যা সমাধানেরও এ-সময়ের প্রথম ব্যবস্থা।

"পল্লীবাসী"দের বিষয়ে আলোচনাকালে বিবরণী অধিবাসীর ঘনতা, বর্গাদার ও ক্ষেত-মজুর জাতীয় ভূমিদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি, অন্যদিকে জমির ক্রমাগত অনুর্বরতাবৃদ্ধি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমানে যে-গতিতে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার চলেছে, কিংবা যেভাবে কৃষি-জীবন ও কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাতে বিশেষ উন্নতি হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে "শহরবাসী"দের বিষয়েও ওরূপ বিশদ তথ্য-বিশ্লেষণ করে এই কথাই রিপোর্ট সিদ্ধান্ত করেছে যে, বিদেশী পুঁজির রাজত্বে গ্রাম গিয়েছে জ্বলেপুড়ে; পূর্বেকার শহরগুলিও প্রায়ই গিয়েছে ম্লান হয়ে; আর এ কালের শহরে স্থাপিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের 'বাজার'—এদেশের কাঁচামাল রপ্তানির কেন্দ্র ও বিলাতের শিল্পজাতদ্রব্য আমদানির কেন্দ্র। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, পশ্চিম বাঙলার যন্ত্রশিল্পে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে সাধারণভাবেও শ্রমিক সংখ্যা বাড়েনি—কৃষিকর্ম ও গ্রামের উপরই চাপ পড়েছে জনতার। অপরদিকে এই সিদ্ধান্তটিও স্মরণীয়—বাঙালী শ্রমিক যে কারখানার মজুর বেশি হয়নি তার কারণ এ নয় যে বাঙালী কর্মকুণ্ঠ, বরং কারণটা এই—অ-কুশল শ্রমিকই বাঙলার এ সব কারখানায় বেশী প্রয়োজন; কিন্তু বাঙালী শ্রমিক মাথা ও হাত খাটিয়ে কুশলী-শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে, বাঙলার

যন্ত্রশিল্পে তাই তার চাহিদা নেই। শিল্পবিপ্লব এলে কারিগর (টেক্‌নিশিয়ন) ও কারুবিদ্‌ বুদ্ধিজীবী রূপে বাঙালী শ্রমিক অগ্রসর হতে পারেন, এরূপ সম্ভাবনা আছে।

বিবরণীয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে কৃষিজীবী বর্গসমূহের কথা এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে অ-কৃষিজীবী বর্গসমূহের কথা। এক হিসাবে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদই এই খণ্ডের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদ। কৃষিজীবীদের কথা আলোচনাকালে ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩, এবং তারপর ১৭৯৩ থেকে ১৮৭২, ১৮৭২ থেকে ১৯২১ এবং ১৯২১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়েছে। সকলেই জানেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রায়তোয়াড়ী অঞ্চলের রায়ত-লুণ্ঠনের প্রতিবাদে সেকালের জাতীয় অর্থনীতিজ্ঞ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙলার জমিদারী-প্রথার স্বপক্ষে ওকালতি করেন; এ কালের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও ভূমি-ব্যবস্থার আলোচনায় অনেকাংশে এ চেষ্টা করেছেন। বাঙলার জমিদারী-প্রথা ততদিনে বাঙলাদেশের কৃষি-সংকটকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে, তা পূর্বেই দেখেছি। বর্তমান রিপোর্টও তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে, এখানে তা বিশদ করে পুনরুল্লেখ করিতে চাই না। পঞ্চম অধ্যায়ের অ-কৃষিজীবী-বর্গদের বিশ্লেষণে রিপোর্ট এরূপেই স্পষ্ট করে তোলে শিল্পক্ষেত্রে বাঙলার ভয়ানক রূপ। যথা, খনি, তাঁত, চামড়া প্রভৃতি অনেক প্রধান শিল্পে এইসব বৃত্তিজীবীদের দিনের পর দিন সংখ্যা কমেছে ও দুর্দশা বেড়েছে; এবং রাসায়নিক, ধাতব-শিল্প, পরিবহন-কর্ম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতি অল্প কয়েকটি বিভাগে জীবীকা-জীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, ছোট পুঁজির কারবারে ও স্বয়ং-চালিত যন্ত্র বা ব্যবসায়ের যথা-প্রয়োজন প্রসার হতে পারে না।

শেষ অবধি তাই পশ্চিম বাঙলার যে-চিত্র ফুটে উঠল

(পৃ ৫৩৫), সত্যই তা শোচনীয়। ১৯১১-র পর থেকে জীবন-যাত্রার অধিকাংশ দিকেই দেখা দিয়েছে অধোগতি। ১৯৫১ আদম-শুমারির বৎসর বলেই হয়তো উল্লেখিত হয়েছে; না হলে হয়তো বলা যেত—এ অধোগতি সমস্যারূপে বাঙলা দেশেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯১৭-১৮য়, আর বাঙালীর জীবনে ভাঙন পরিস্ফুট হয়েছে (১৯২৮-এর মন্দার পরে না হোক) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে।

এই হল দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বেকার পশ্চিম বাঙলার মৌলিক-জীবনের চিত্র যা তথ্য দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে।

সামাজিক সংস্কৃতির অবলম্বন

পশ্চিম বাঙলার আদম-শুমারির 'পার্টওয়ান-সি' শেষ হয়েছে আর একটি ৫১৭ পৃষ্ঠার বিপুল খণ্ডে। সেখানে বিবরণীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ধর্ম, বাড়িঘর, বাস্তুভিটা, স্ত্রীপুরুষের সখ্যা, সাক্ষরতা ও মাতৃভাষা প্রভৃতিবিষয়ের তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। তাছাড়া, এই খণ্ডেই সংক্ষিপ্তাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে আইন-ই-আকবরীর, বের্‌নিয়ের-এর ভ্রমণ কাহিনীর সারাংশ, কোল্‌ ব্রুক এর বাঙলার কৃষক ও অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিবরণ, বুকানন হ্যামিল্‌টন-এর ব-দ্বীপীয় পরিবর্তনের সংকলন। তার সঙ্গে আছে একালের বিশেষজ্ঞদেরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় লেখা,—যেমন, লিখেছেন বাঙলার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে এম, দত্ত; গত ত্রিশ বৎসরের জমির ব্যবহার বিষয়ে বিমলচন্দ্র সিংহ। ৪০টি আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এবং পশ্চিম বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে কমল মজুমদারের নিবন্ধও আছে।

আদম-শুমারির ৭ খানা গ্রন্থ ও ৪ খানা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের সঙ্গে ১৩ খণ্ডে ছাপা পশ্চিম বাঙলার ১৩টি জেলার ,জেলা-বিবরণী'

('হ্যাণ্ডবুক') রচিত হয়েছে। এ সব মিলিয়ে দেখলে পশ্চিম বাঙলার চিত্র পূর্ণাঙ্গ হবে। সাধারণভাবে এসব হ্যাণ্ডবুকের প্রত্যেক খণ্ডেই আছে এক-একটি জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ, ভূমির গড়ন, জমির প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বনবাদাড়, গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতির হিসাব। তারপরে অধিবাসীদের সংবাদ ; তাদের ভাষার, ধর্মের, শিক্ষার, সংস্কৃতির, স্বাস্থ্যের, কৃষির, শিল্পের, ব্যবসা-বাণিজ্যের, যানবাহনের, সেচের, ভূমিব্যবস্থার, রাজস্বের এবং শেষে (পূর্বোল্লেখিত) ৮টি জীবিকা-জীবী বর্গের অবস্থার হিসাব। জেলা, মহকুমা ও এলাকা হিসাবে এসব বিষয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক জেলার বিখ্যাত প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন ও বস্তুর তালিকাও জেলার বিবরণে আছে। কোনো জেলার এরূপ বিবরণী শেষ হয়েছে ২৫০ পৃষ্ঠায়, আর কোনো জেলার বিবরণীতে প্রায় ৬৫০ পৃষ্ঠা লেগেছে। এ ছাড়া প্রত্যেকটি জেলার বিবরণীর শেষে সে জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথাও পরিশিষ্টাকারে সংযোজিত হয়েছে, আর দেখলেই বোঝা যায় সে বৈশিষ্ট্য কত মূল্যবান। তু-একটি জেলার যা প্রথমেই চোখে পড়ে তার উল্লেখ করছি।

যেমন, হুগলি জেলার বিবরণের তিনটি পরিশিষ্টে আছে, (ক) দামোদর নদের পুরাতন খাতের কথা, (খ) 'বর্ধমানী জ্বর' ও বাঁধের কথা, এবং (গ) জেলার দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা। বর্ধমান জেলার বিবরণের পরিশিষ্টে আছে, (ক) জেলায় কয়লা খনিগুলির কথা, (খ) ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই 'বর্ধমানী জ্বর'-এর কথা, এবং (গ) বর্তমান সময়কার দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা ও চিত্র। বীরভূমের জেলা বিবরণীর পরিশিষ্ট সমূহে আছে—(ক) ফারমিঙ্গার-এর পদ্ধতি অনুযায়ী জেলার দলিল দস্তাবেজের কথা (১৭৮৮ থেকে ১৭৯৭), (খ) অ্যাডাম সাহেবের লেখা জেলার ১৮৩৭ সালের শিক্ষা-বিবরণ, (গ) ওলড্‌হ্যাম-এর লেখা জেলার

লৌহসম্পদের কথা, (ঘ) ১৮৭২-এর 'বর্ধমানী জ্বরে'র কথা, (ঙ) ১৮৮৫-এর সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ, এবং একজন সাঁওতালের কথিত সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী। এর থেকে অনুমান করা অসাধ্য নয় যে, এইসব জেলা বিবরণীতে প্রায় নতুন করে বাঙলার প্রত্যেকটি জেলার বৈশিষ্ট্য ও তার কথা কি রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তা ছাড়া, প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার একখানি বিরাট ও মূল্যবান গ্রন্থের এখনো মুদ্রণ শেষ হয়নি—তাতে পাওয়া যাবে পশ্চিম বাঙলার বিখ্যাত প্রাচীন কীর্তিচিহ্নসমূহের কথা। প্রত্যেক জেলার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি কীর্তিচিহ্নের বর্ণনা, অবস্থান, বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি ছাড়াও এ-গ্রন্থে থাকবে প্রত্যেকটি উৎকীর্ণ লিপির ইংরেজি অনুবাদ এবং লিপিতে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বহিরাক্রমণের কথাও। আলোকচিত্র মুদ্রণ সম্ভব হবে কিনা জানি না, তা হলে অন্তত চার পাঁচ শত জিনিসের আলোকচিত্রও এ সঙ্গে বা স্বতন্ত্র খণ্ডে সংযোজিত হতে পারে, শুনেছি।

এসব তথ্যের পরিমাণগত হিসাব ছেড়ে গুণগত হিসাবে অগ্রসর হবার মতো সুযোগ ও সামর্থ্য সাধারণ বাঙালীর জুটবে না, তা ঠিক। তথাপি বলা যায়—এতকাল পরে বাঙালী জাতি, সত্যসত্যই বাঙলার রূপ দেখবার মতো বাস্তব দৃষ্টি লাভ করছে, লাভ করছে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন গবেষক। পশ্চিম বাঙলার প্রত্যেকটি জেলার সাধারণ পাঠাগারের এই সম্পূর্ণ গ্রন্থসমূহ সংগ্রহে সচেষ্ট হওয়া উচিত। কোনো শিক্ষিত মানুষ এর প্রধান খণ্ডগুলি পাঠ না করলে নিজেকে শিক্ষিত বিবেচনা করতে পারবেন না। বিশেষ করে বাঙলার রূপ, বাঙলার কথা যাঁদের আলোচ্য—বঙ্কিমী মাতৃমূর্তি যাঁদের ধ্যান—তাঁরা এই তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণী লাভ করে তাঁদের ধ্যান, তাঁদের জ্ঞান,

তাঁদের প্রেমকে এবার সত্য করতে পারবেন—মাটিতে মানুষে জড়িয়ে মা যা হয়েছেন, তা উপলব্ধি করবেন। মা যা হবেন, তার নির্মাণে আত্মনিয়োগ করবার মত প্রেরণা তখনি বাস্তব হয়ে উঠবে।

১৩৬১ বাং।

॥ সংকল্প ও সংযোজন ॥

বাঙলার বিবর্তন-পথ

পরিবর্তন ও পরিকল্পনা

আমাদের যুগ পরিবর্তনের যুগ, হয়ত বা বিংশ শতক আসলে বিশ্ববিপ্লবের যুগ। সমাজের নব-রূপায়ণ ও সংস্কৃতির রূপান্তর তাই আজ আর কে না চায়? এমন কথাও শুনি—বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দ্বারা অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধন করাই সমাজের লক্ষ্য। ১৯৫০ থেকে ভারতেও আর্থিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

কালের খরস্রোতে অনেক কথাই তলিয়ে যায়। নইলে মনে থাকত—বিংশ শতকের প্রথম পাদে 'দি ওয়ার্লড ক্রাইসিস'-এর লেখক চার্চিল প্রভৃতি শাসকেরা লেনিনের বৈজ্ঞানিক স্পর্ধাকে চূর্ণ করবার জন্য বলতেন, 'বিজ্ঞান অবান্তর অপচয়ে ও দিগ্‌ভ্রষ্ট গতিতে ছাড়া চলতে পারে না।' তথাপি বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে—মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্বে—মস্কো ঘোষণা করেছিল 'প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা'। মানুষের আর্থিক জীবনকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরিবর্তিত করবে, এই তাদের সংকল্প ছিল। সমাতনী সমাজ-তাত্ত্বিকেরা মস্কোর স্পর্ধা দেখে তখন হেসেই খুন: "মুখ্‌খুরা বলে কি? পরিকল্পনা করে গঠন করবে আর্থিক জীবন?—বিধাতার লীলাখেলার মতই দুর্জ্জেয় যে অর্থনীতির রূপ ও পদ্ধতি।" সে হাসি অবশ্য অনতিবলিম্বেই শুকিয়ে গেল। ১৯২৯-এই এল পৃথিবী জুড়ে আর্থিক সংকট—মস্কো যখন নব-নব উদ্যোগে কর্ম-মুখর। দিশাহারা মুনাফাবাদীদের তাই সঙ্গে সঙ্গে দরকার হল অর্থহারা 'পরিকল্পনার'—মুনাফার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে মুনাফার মৃগয়া অব্যাহত থাকবে। 'নিউ ডীলের' পর থেকে তাই সনাতন সমাজতাত্ত্বিকেরাও "প্ল্যান" বা আর্থিক-সামাজিক পরিকল্পনার কথা বলেন। অবশ্য সমাজের সৃষ্টি-শক্তিকে মুক্ত করবার পরিকল্পনা তাতে নেই। তা হচ্ছে ধনিক সমাজের

অন্তর্ঘাতী অপঘাতকে ঠেকিয়ে রাখবার পরিকল্পনা, আর অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে অতি-মুনাফার (সুপারপ্রোফিট্‌স্‌-এর) মৃগয়া-ক্ষেত্র অক্ষুন্ন রাখবার সাম্রাজ্যবাদী পারকল্পনা। অর্থাৎ মুনফাবাদের এসব "পরিকল্পনা" হচ্ছে Planning for planlessness.

তবু এই সব কারণে এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কারো আর না মানলে চলে না—বৈঞ্জানিক পদ্ধতিতে সমাজ সংগঠন সম্ভব; এবং শুধু সম্ভব নয়, প্রয়োজন। এ কথাও এখন প্রায় স্বীকৃত—সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য; সমাজ দিয়েই সংস্কৃতিরও পরিচয়। সমাজ-সৌধের বনিয়াদ যদি হয় আর্থিক জীবন তার উপরতলা তাহলে সাংস্কৃতিক জীবন; সমাজের জীবন প্রতিফলিত হয় সাংস্কৃতিক সৃষ্টিতে, আর সাংস্কৃতিক প্রয়াসও আবার সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে নূতনতর সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনও শুধু সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়। সমাজের নবজন্ম কিংবা নব-সংস্কৃতির জন্ম, কোনটাই তাই আর নতুন কথা বলে শোনায় না। কারণ, বিংশ শতক শুধু সমাজ-বিপ্লবের যুগ নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরও যুগ। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আজ সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি গঠনেরও সাধনা চলেছে।

কথাটা নতুন না হোক, কাজটা কিন্তু এখনো দুঃসাহসিক। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবন এখনো মুনাফার সারথ্যেই পরিচালিত। সে রথে এখনো সমাসীন সাম্রাজ্যবাদ। তার নাম হয়ত এখন আর হিজ্‌ মেজিস্টি দি পাউণ্ড স্টার্লিং নয়; এখন তার নাম হয়ত প্রেসিডেন্ট ডলার অব্‌ "ফ্রি" ডিমোক্র্যাসিস্‌। কিন্তু তার রথতলে এশিয়ার, আফ্রিকার, আমেরিকার, এমন কি ইউরোপেরও, নানা দেশের সমাজ এখনো নিষ্পিষ্ট, সংস্কৃতি এখনো সংরুদ্ধ। নব-সমাজের জন্ম ও সংস্কৃতির নবজন্ম তাই অত সুসাধ্য সাধনা নয়। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের

আলোচনায়ও আমরা তা অনুভব করতে পারি। কেন কেবলি মনে হয়—বাঙালী সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি যেন কোন বালুচরে আটকে গিয়েছে। তাই ভারতে 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর পরিকল্পনার *নীতি যখন সরকারী নীতি, তখনো আমরা কিছুতেই আমাদের* বাঙালী জীবন এবং বাঙালী সংস্কৃতি পুনর্গঠিত করতে পারছি না। ভারতবর্ষের ১৯৫১ সনের আদমশুমারির রির্পোট থেকে পশ্চিম বাঙলার অবস্থা অনুধাবন করি; দেখব ভারতবর্ষের মধ্যে আজ সব চেয়ে মন্দভাগ্য জাতি বাঙালী। অথচ আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস নিতান্ত সামান্য নয়, অত্যন্ত অর্বাচীনও নয়।

ঘাটতি ইতিহাস

প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জনসমাজকে নিয়ে ভারতবর্ষের এই প্রাচ্য-মণ্ডলে ভারতীয় সভ্যতা বিশিষ্ট একটা রূপ লাভ করে। তারই নাম বাঙালী সমাজ, তার পরিচয় বাঙালী সংস্কৃতিতে। রাজা-রাজবংশের গণনায় তখন পাল রাজবংশ ও সেন রাজবংশের কাল। ভারতবর্ষের ও বাঙলার জনসমাজের ইতিহাসে সেটা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রথম পর্বের (৪র্থ শতাব্দী—৯ম শতাব্দী) অবসান-কাল, তার মধ্য পর্বের (১০ম থেকে ১৫শ শতক) সূচনা-কাল। সকলেই আমরা জানি—ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূল বনিয়াদের উপরেই এই বাঙালী জাতি ও বাঙালী সমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের নিজ বৈশিষ্ট্য, আমার মতে, তিনটি; অন্য সামন্ত সমাজে তা এ ভাবে দেখা যায় না। যথা, প্রথমত—**অর্থনীতির দিক থেকে** ভারতীয় সামন্ত সমাজের মূল আশ্রয় ছিল বিচ্ছিন্ন পল্লীসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ-নৈতিক বিন্যাস। দ্বিতীয়ত, **সামাজিক গঠনের দিক থেকে** তার সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'কাস্ট' বা জন্মগত জাতিভেদ। আর তৃতীয়ত, **ভাবাদর্শের দিক থেকে** ভারতীয় সমাজের বিশিষ্ট

ভাবাদর্শ হলো কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ। আমরা দেখেছি—আধুনিক যুগেও (খ্রী ১৮০০-খ্রী ১৯৪৭ পর্যন্ত) ভারতবর্ষের কোন জাতি বা সংস্কৃতি এই তিনটি মূল বস্তুর সব কয়টিকে অস্বীকার করতে পারে নি। তার অর্থ, এখনো তারা সামন্ততন্ত্রের বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যাই হোক, বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতিও এই ভারতীয় বনিয়াদের উপরেই গড়ে উঠেছে। মূলের ভারতীয় উত্তরাধিকারের সঙ্গে বাঙালীর লোক-জীবনের পুঁজি মিশিয়েছে; পরে তার গায়ে—মাত্র অষ্টাদশ শতকে—ফারসী আরবীর কিছু পালিশ লাগিয়েছে। সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই চলেছে বাঙালী সমাজেরও এসব গৌণ পরিবর্তন।

বাঙলার এই মধ্যযুগের সংস্কৃতির গৌরবের কাল,—ষোড়শ ও সপ্তাদশ শতাব্দী। সে গৌরবের কারণ শুধু তখনকার বাঙলা সাহিত্য নয়। বাঙালীর রচিত সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার ছাড়াও বাঙালী সমাজের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে মধ্য যুগের এই মধ্য ও অন্তিম পর্বের স্মৃতিশাস্ত্রে, তন্ত্রে, নব্যন্যায়ে। কিন্তু স্মরণ রাখতে পারি, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাঙালী মধ্যযুগের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। অথচ তার পূর্বেই ইউরোপে রেনেসাঁসের বান ডেকেছে। পৃথিবীতে তখন জন্ম নিচ্ছে বণিক সভ্যতা। বাঙলার বাজারে তখন প্রাধান্য অর্জন করেছে ফিরিঙ্গি বণিক। অর্থনীতিতে তাদের রৌপ্য-প্রচলনে সূচনা হচ্ছে মুদ্রা-মাধ্যমিক যুগ—অর্থাৎ মানি ইকোনমি। আর ফিরিঙ্গির পদাঘাতে ভেঙে পড়েছে নিম্নবঙ্গের মুঘল-শাসনের পশ্চাদ্দ্বার; রাজনীতিতেও তাই সূচিত হচ্ছে বণিক-সভ্যতার অপরাজেয়তা। এরূপ অবস্থায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিচারে বা পদাবলীর কীর্তন-মাধুর্যে, তন্ত্রের শক্তি-সাধনায় বা স্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে সেই নবজাগ্রত বণিক সভ্যতাকে ঠেকানো সাধ্য কি? সত্যসত্যই, পৃথিবীব্যাপী সামাজিক উন্নয়নের ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে দেখলে মনে হয় না

কি—তন্ত্র, স্মৃতি, নব্যন্যায়, এ সব বাঙালী সৃষ্টি—অনেকাংশেই 'বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার'? তাই হাজার দুই-তিন বৎসরের ভার বহন করে মন্দগতি বাঙালী সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি অষ্টাদশ শতকে আপনারই ভারে আপনি তলিয়ে যেতে বসল। যতটুকু প্রাণ তখনো তার ছিল তা রইলো লোকজীবনে ও লোক-সংস্কৃতিতে। লোক-গীতিকায়, লোক-সঙ্গীতে, লোক-শিল্পে ও কারুকর্মে পল্লী সভ্যতার প্রাণের পরিচয় তখনো লুপ্ত হল না—এখনো তা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, তবে তার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। কিন্তু ঘাটতি ইতিহাসের প্রতিশোধ এল ঘনিয়ে।

ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ

তারপর পোহাল শর্বরী, বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে—অর্থাৎ পল্লীসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভিত্তি বিলাতী শিল্প-বিপ্লবের আঘাতে নড়ে গেল। পল্লীর কারিগর বৃত্তি হারাল, জমিদারী-প্রথা দেখা দিল। দেখা দিল ঔপনিবেশিকের সমাজের যুগ আর আধা-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির যুগ (? খ্রীঃ ১৮০০ থেকে খ্রীঃ ১৯৪৭)। বাঙালী মধ্যবিত্তের বা ভদ্রলোকের যুগও একে বলতে পারি। অন্তত একশত বৎসর (১৮১৭তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে) তারাই বাঙালীর সংস্কৃতিকে গঠন ও পরিচালনা করেছে। কিন্তু বহু বিলম্বিত সামাজিক বিপ্লব বা সাংস্কৃতিক বিকাশ তারা তখনো সম্ভব করতে পারেনি। কারণ, এ ভদ্রশ্রেণীর আর্থিক বুনিয়াদ ছিল আধা-সামন্ততন্ত্রী জমিদারী ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চাকুরী। সামাজিক-ক্ষেত্রে তারা ছিল বাঙালী লোক-জীবন থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন। তারা না নিয়েছে কৃষিতে, না নিয়েছে শিল্পে উৎপাদনের ভার। অথচ মানসিক জীবনে ইংরেজের মারফত পাওয়া বণিক্‌সভ্যতার নূতন বাণী—ব্যক্তি-স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের মন্ত্রে তারা

চমৎকৃত হয়ে উঠেছিল, তাও ঠিক। বাস্তবে ব্যাহত ও কল্পনায় মুক্তিকামী—এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বভাবতই বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী উত্তরোত্তর আশ্রয় করেছে উদ্যোগহীন, বাস্তব-বিমুখ, ভাববাদী পথ। উনবিংশ শতকের বাঙালীর নব সংস্কৃতির কীর্তিমালা আমাদের সুপরিচিত—তা নয়া দিল্লীতে যে ভাবে অবজ্ঞাত তাতে তার প্রচারও প্রয়োজন। সত্য সত্যই যে-কোন পরাধীন জাতি এরূপ প্রয়াসে আশ্বাস লাভ করতে পারে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্ হতে পারে। ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীনতার মন্ত্র প্রথম শুনিয়েছি, ভারতবর্ষে আমরা শিল্প-সাহিত্যের আলোক-শিখা প্রথম প্রজ্বালিত করেছি এবং এই দুর্ভাগ্যের দিনেও জানি শিল্প-সাহিত্যে ললিতকলার চর্চায়, বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের গবেষণায়, এমন কি, বিপ্লবী জীবন-স্বপ্নে, এখনো ভারতবর্বের মধ্যে আমরা পুরোধা। কিন্তু একথাও বিস্মৃত হবার নয়, সমাজবিপ্লব বাঙালী উনিশ শতকে সূচনা করে নি। বরং জীবনের বাস্তব সত্যে সে কুণ্ঠিত বলে বৈষয়িক উদ্যোগে-আয়োজনে তার সাহস ছিল না। এমন কি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মত দু'একজন মনস্বী ব্যতীত বিজ্ঞান-চর্চায় ও বৈজ্ঞানিক প্রয়াসেও তখন শিক্ষিত বাঙালী বিশেষ আগ্রহ বোধ করে নি। জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলেও সেই নবযুগের বাঙালী সংস্কৃতি হিন্দু জাতীয়তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। স্বাধীনতার বাণীতে প্রবুদ্ধ হলেও শিক্ষিত বাঙালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় নি। মানুষের অধিকারের নামে উদ্দীপ্ত হলেও সামন্ততন্ত্রের মূল বন্ধন ছেদন করে নি। তারা জাতিভেদ মেনে নিয়েছে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নি এবং জমিদারীর বিলোপ-সাধনে প্রস্তুত হয় নি। গণতন্ত্রের মহিমা যতই জানা থাক, গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে তাদের আস্থার বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ সবে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু

নেই; সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এ দশাই ঘটে পরাধীন দেশের ও পরাধীন সংস্কৃতির।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—জমিদারী ব্যবস্থায় ক্রমবর্দ্ধিত কৃষি-সংকটের ফলে আর এই বাঙালী শ্রেণীর মাটি থেকে রসগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি-নির্ভর মানুষ জীবিকার আশায় তখন শহরে ছুটল। চাকরির বাজারে শিক্ষিতের ভীড় দেখা দিল। সেখানেও তাই বেধে গেল খাওয়া-খাওয়ি,—প্রধানত তারই নাম 'সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব'। অপেক্ষা ছিল একটি ঝড়ের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এলো সেই ঝড় নিয়ে। এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর, একান্নর মহামারী, এলো কালোবাজারী রাজত্ব—বাঙলা দেশে মুনাফার মৃগয়া হয়ে উঠলো মানুষের মৃগয়া। বাঙালী সমাজের ভিত্তি ধসে যেতে লাগলো, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন উন্মূলিত হয়ে গেল। ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা, তার মূল্যবোধ, তার চরিত্রবল, শোভনতা-শালীনতা—সব ভেসে গেল। যা বাকী ছিল—১৯৭এ তা সম্পূর্ণ হলো, বাঙলা দেশ দু'রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেল,—আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তর্ঘাতী পীড়ার তা'ই হ'ল চরম দশা। আর তার ফলে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল বাঙালী জাতির জীবন-পথে আজ শুধু দেশ হারিযে বসে নি, পথ হারিয়ে ফেলে নি, আপনাদের ঠিকানাও ভুলে গিয়েছে। আজকের বাঙলা দেশের এই বিপর্যয়ের তথ্যগত রূপ ১৯৫১-এর আদমশুমারীর রিপোর্ট তুলে ধরেছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। বাস্তব জীবনের জমা-খরচের খাতায় বাঙালী সমাজ এসে যাচ্ছে খরচের দিকে, আর বাঙালী সংস্কৃতি যেন এই ফেল-পড়া ব্যাংকের অনাদায়ী হুণ্ডি।

পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সমস্যা

ঔপনিবেশিকতার এই অভিশাপ ঘাড়ে নিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিও অবশ্য আমাদেরই পিছন পিছন এসে ঠেকেছিল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘাটায়। আমাদের মত বিপন্ন না হলেও তারাও এখন এ সত্য আজ উপলব্ধি করছে—সমাজবিপ্লবকে বিলম্বিত করলে সমাজ-বিপর্যয়ই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পৃথিবীর একালের অন্য একটি স্বীকৃত সত্যও তারা ও আমরা সকলেই বুঝছি—শুধু ভাবলোকের আকাশ থেকে রৌদ্র-বায়ু সংগ্রহ করতে পারলেই সংস্কৃতি বাঁচে না; সমাজের উৎপাদন-শক্তিই জোগায় সংস্কৃতির প্রাণ-রস, তার মানসিক কুসুম, তার ফল-পাতার শাখার স্বচ্ছন্দ বিস্তার। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী আজ তাই অনুভূত হচ্ছে ১৯৪৭-এর সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তারই প্রাথমিক আয়োজন,—এই চক্ষে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে দেখলে সম্ভবত তাকে ছোট করে দেখা হবে না। বরং একটু বড় করেই দেখা হবে।

পরিকল্পনাকাররা বলেছিলেন এর ফলে আমরা কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে পারব; আমাদের সামাজিক আয় ও জীবনযাত্রা ১৯৩৯-এর স্তরে পুনরুন্নীত হবে। কথাটা শুনে পুলকিত হবার মত কারণ কোথায়? ইং ১৯৩৯ সনের জন্য কে হা-হুতাশ করছে—বাদে যুদ্ধের মুনাফাদাররা ও যুদ্ধবাজরা? হয়ত কথাটা এই—প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু এইটিই শেষ পরিকল্পনা নয়। ইং ১৯৭১ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় আয় দ্বিগুণিত হবে। শুধু তাই নয়, আমরা সমাজ বিপ্লব কেন, সমাজতান্ত্রিক বিন্যাসই সম্পূর্ণ করতে চাই;—পণ্ডিত জহরলাল ইং ১৯৫৪-তে চীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে এই কথা পুনর্ঘোষণা করেছেন। (পরে কংগ্রেস সরকার তা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে)। আমরা তা সম্ভব করব ক্রমিক পরিকল্পনায় ও ধারাবাহিক দ্রুত পরিবর্তনে। আমি অবশ্য অত বিরাট ও সুদূর লক্ষ্যের কথা বলছি না—আপাতত আমরা চাই ভারতীয় সমাজের ততখানি

মৌলিক পরিবর্তন যা না হলে ভারতবর্ষ আধুনিক জগতের জীবন্ত ও শিল্পোন্নত জাতির সারে দাঁড়াতে পারবে না। অর্থাৎ সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব দেরি সইতে পারে,—তা সইতেও হবে যখন শিল্প-বিপ্লবই হয়নি; প্রথম এখন আধা-সামন্ততন্ত্রী ঔপনিবেশিক সমাজেরই অবসান হোক। কারণ শিল্প-বিপ্লব এবং গণতান্ত্রিক নব-সমাজ সংগঠিত না করলে ভারতবর্ষের আর একদিনও চলবে না।—আমাদের আশু লক্ষ্য তাই 'নব্য গণতান্ত্রিক সমাজ' বল্‌লে হয়ত চীন-প্রত্যাবৃত্ত পণ্ডিতজীও আপত্তি করবেন না। তা হলে, কয়টি পরিকল্পনায় এই নব্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬) সেরূপ নব্যগণতান্ত্রিক সমাজের গোড়া-পত্তন না হোক, গোড়া-পত্তনের চেষ্টা হচ্ছে কিনা, তা' হলে তা-ই হবে বিচার্য। এবং সে উদ্দেশ্যে নব্যগণতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই বা কতটুকু গোড়াপত্তনের চেষ্টা হচ্ছে, তাও হবে লক্ষণীয়। (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রায় ৪ হাজার ৮ শত কোটি টাকার পরিকল্পনা। তাতে মুলশিল্পের ও ভাবীশিল্পের পত্তন ও প্রসার স্থিরীকৃত হয়েছে, এটি খুবই সুবুদ্ধির কথা। কিন্তু যেভাবে তার অর্থ-সংগ্রহ, তার ধনিক-তোষণ প্রভৃতি নীতি স্থির হচ্ছে, তাতে আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে।)

অস্বস্তিকর তর্ক ও তথ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত দেখলে অত্যন্ত সহজ ভাবেই কয়েকটি সহজ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে ঃ—প্রথমত, আমরা এখনো আমাদের অন্তত তিনশত বৎসরের বস্তাপচা সামন্ত-তন্ত্রের জের মেটাতে পারছি না; অথচ তা না মেটালে নব্য সমাজের আবির্ভাব সম্ভব হবে না। আমরা সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার অবসান কল্পে যে সব আইন-কানুন প্রণয়ন করেছি—তা সে পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর, যা প্রণয়ন করেছি তা এখনো দৃঢ়চিত্তে প্রবর্তন করতে আমরা উদ্‌গ্রীব নই। রাজ্যসরকারগুলি এদিকে পরিকল্পনা-

কারদের প্রস্তাবসমূহও বাতিল করে দিয়েছে। আমরা কৃষককে সত্যই জমির মালিকানা দিতে পারছি না। বরং মনে করি, প্রত্যেকটি শোষক শ্রেণী যে ক্ষতি করেছে তার জন্যই তাদের প্রাপ্য হয়েছে ক্ষতিপূরণ। আর সে ক্ষতিপূরণ যোগাবার দায়িত্ব পড়ছে কৃষক ভিন্ন আর কার উপরে? ভারতীয় সমাজে ধনোৎপাদক ও রাজস্বের মূল-উৎস এখন পর্যন্ত কৃষক ছাড়া আর কে?

দ্বিতীয়ত, আমরা অর্থনৈতিক স্বরাজ লাভ করতে চাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উপর হাত না দিয়ে। আমরা যখন বৈদেশিক পুঁজির, বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের প্রদত্ত ঋণ ও লগ্নির সহায়তায় আমাদের অর্থনৈতিক স্বরাজ লাভ করতে উদ্‌গ্রীব, তখন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে হাত তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ পুঁজি ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষের প্রধানতম উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি কবলিত করে বসেছে, এবং সেখানে এখন দেশীয় পুঁজির অনুপ্রবেশ দুঃসাধ্য,—হয়ত বা এ ভাবে অসাধ্য। শিল্পে বাণিজ্যে ব্রিটনের শোষণ-সাম্রাজ্য ১৯৪৭-এর পরে ভারতে আরও নিরাপদ হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবেও বৎসরে অন্তত ৪০ কোটি টাকা ব্রিটিশ পুঁজির মুনাফা বাবদ ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটনে এখনো চালান যাচ্ছে—অন্য হিসাবে হয়ত সংখ্যাটা দ্বিগুণ।—এটাও দেখা গিয়েছে ব্রিটিশ ধনিকস্বার্থ ভারতবর্ষে শোষণ-পথ উন্মুক্ত করলেও এদেশে শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করে নি, ব্রিটিশ উদ্যোগে যে শিল্প গঠিত হয়েছে প্রধানত তা আহরক শিল্প, extracting industries, ভারি শিল্প বা heavy industries নয়।

অবশ্য এই ব্রিটিশ শোষণের ছিটে-ফোঁটা ব্রিটিশ পুঁজি-পতিরা আজ দেশের দালাল-মালিক ও শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যেও বিতরণ করছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ মালিকরা এখন দেশী সাইনবোর্ড

ব্যবহার করছে। বলা বাহুল্য, সুপার-প্রোফিটসের এই ছিঁটে-ফোঁটা লাভে 'অর্থনৈতিক স্বরাজ' আরব্ধ হয় না; বরং তাতে সাম্রাজ্যবাদের দেশী দালালই সৃষ্টি করা হয়। আর আমরা বাঙালীরা অন্তত জানি, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দালাল এই দেশীয় শোষকেরা না করে দেশে সুস্থ শিল্পায়নের সূচনা, না করে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা। অতি-মুনাফার লোভে তারা বরং উৎপাদন কমিয়ে বাড়ায় কালোবাজার, ইতর রুচির বশে তারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চালায় দুর্নীতির দাপট আমরা বাঙালা দেশের বাঙালীরা মেদ-মজ্জায় চিনি এই সাম্রাজ্যবাদী ও তার সহযোগী দেশীয় শোষণের রূপ। পশ্চিম বাঙলা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রধানত ব্রিটিশ শোষণের মৃগয়া ক্ষেত্র; তাই দেশের জঘন্যতম ফাটকাবাজ পুঁজিরও লুণ্ঠনক্ষেত্র। তাইত আজ বাঙলার খাদ্যে, বস্ত্রে, ঔষধে, এমন কি, রুচিতেও ভেজালের রাজত্ব, ও ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে দুর্নীতির জয়-জয়কার। যে পরিকল্পনায় এরূপ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের সম্ভাবনা নেই এবং মানুষ-মারা দেশীয় পুঁজিরও মুনাফা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই—অন্তত বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে তা মোটেই নতুন দিনের ভূমিকা-রচনা বলে গ্রাহ্য নয়।

সামাজিক পরিকল্পনার মূলসূত্র

কারণ, সংক্ষেপে মূল কথাটা এই, আজ আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভারতবর্ষের বহু **বিলম্বিত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা**। এ কথাটার অর্থ ভারতীয় কৃষককে জমির মালিক করা ও কৃষির বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করা, বিদ্যুৎশক্তির যোগে নতুন পল্লীশিল্প স্থাপন করা, শিল্পায়নে মূল ও ভারি শিল্পের কারখানা পত্তন করা, শুধু দেশের মালিক শ্রেণীকে নয়, জনশক্তিকে উদ্যোগে-উৎপাদনে সার্থক করা;—এক কথায়, সমাজের চাপা-পড়া সৃষ্টিশক্তিকে মুক্ত করা।

এ কথা কিন্তু মিথ্যা নয়—সীমাবদ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নানা আয়োজনে এবং তার আনুষঙ্গিক নানা প্রয়াসে—যেমন, সেচ ও বিদ্যুতের নানা উদ্যোগ, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন উৎপাদনের কারখানা, সিন্দ্রির সারোৎপাদনের কারখানা, আলওয়ের দুর্লভ মৃত্তিকার কারখানা, বাঙ্গালোরের টেলিফোনযন্ত্রের কারখানা, অন্য দিকে দেশীয় ও বিদেশীয় পুঁজির নানা প্রচেষ্টা, জাহাজী-শিল্প, মোটর কারখানা, তৈল-শোধণ-শিল্প, লৌহ-ইস্পাতের কারখানার ব্যবস্থা ;—এসবে মিলে ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি শেষ না হলেও ভারতীয় অর্থনীতির স্থবিরত্ব ভাঙছে, সবশুদ্ধ সমাজেও তাতে কিছুটা পরির্তন আসছে। কিন্তু আমাদের এই আর্থিক-সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে আসলে দুটি স্ববিরোধী দিক আছে ঃ একদিকে আছে বিদেশী শোষণের স্বীকৃতি, অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বরাজেরও দ্বিধাগ্রস্ত সংকল্প। আর সেই স্ববিরোধী ধারা বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে, তাও লক্ষ্য করা যায়।

পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতির-সমস্যা

বাঙলার সংস্কৃতি জগতেও আমরা তাই এই মুহূর্তে দেখ্‌তে পাই দুই বিপরীত স্রোতের দ্বন্দ্ব। যেমন, আমরা সাম্রাজ্যবাদ-প্রবর্তিত পুরাতন শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি কোনোটাই এখনো পরিত্যাগ করি নি। এমন কি, যে বাঙলায় জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা প্রথম হয়েছিল সেখানে আমরা এখনো জানি না 'জাতীয় শিক্ষার' অর্থ কি। বাঙালীর শিক্ষার বাহন কি বাঙলা হবে, না অন্য ভাষা ? ইংরেজি ভাষার স্থলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করব, না হিন্দীকে ? হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার নামে ইংরেজিকে কি একেবারে বর্জন করব ? 'জাতীয় শিক্ষা' বলতে কি বোঝায় শুধু বুনিয়াদী শিক্ষা? বা শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই

প্রতিষ্ঠা? জাতীয়তা মানে কি বিজ্ঞানের বিরোধিতা, মানবীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় অনাস্থা? কূপমণ্ডূকতা? এখানে ওখানে সর্বভারতীয় ঐক্যের নামে হিন্দীর চুনকাম করলেই এখন তা 'জাতীয়' হয়। 'একাডেমি' গড়তে গিয়ে আমরা শিব গড়ছি না বাঁদর গড়ছি? অথচ সেই সঙ্গেই দেখছি নতুন শাসকদের সন্তান-গোষ্ঠী ফিরিঙ্গী স্কুলে ও সম্ভব হলে বিলাতেই, দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বর্জন করে 'ইংরেজি কৌলিন্য' অর্জন করছে। এবং আমাদের উন্নাসিক সংস্কৃতিবাদীদের মুখে ফুটছে ক্ষয়িষ্ণু ধনিক সভ্যতার মুখপাত্র এলিয়ট-এজরা পাউণ্ড-ফোক্‌নার সার্ত্রে প্রভৃতি আহেলি লেখকদের উচ্চ প্রশংসা—তাদের চক্ষে শেক্‌সপীয়র-ডিকেন্স-শেলি-কীট্‌স্‌ও 'সেকেলে।' তাই ফ্লেকারের কবিতা আমরা পাঠ্য করি স্কুল ফাইন্যালের বালকদের জন্য! যার যত পাণ্ডিত্য তা উজাড় করি স্কুল বা কলেজের ছাত্রের পাঠ্য নির্বাচনে ও প্রশ্ন প্রণয়নে।

অন্য দিকও অবশ্য আছে,—এবং তার ভিতরেও আছে আবার এই অন্তর্বিরোধিতার চিহ্ন। এত কাল পরে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোষক রূপে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি এগিয়ে এসেছে। সঙ্গীত নাট্য সাহিত্য চলচ্চিত্র ও বেতারের স্রষ্টাদের নিয়ে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সংগঠন গঠিত হচ্ছে, শিল্পীদের প্রতিযোগিতা ও পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থাও হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাধা জুটছে অন্যরূপেঃ—অনেক ক্ষেত্রে আপাতত গুণের পুরস্কার অপেক্ষা বেশি হবে দলানুগত্যের পুরস্কার। এবং সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ভার পড়ছে যোগ্য অপেক্ষা চতুর দলীয় দালালদের হাতে। বিশেষ করে, পশ্চিম বাঙলার অভিজ্ঞতা থেকে এই আশঙ্কাও মনে জাগে যে, এগুলি তাঁবেদারির পুরস্কার। দ্বিতীয়ত, হিন্দী প্রচারের যতটা চেষ্টা রেডিও, একাডেমি ও সরকারী প্রকাশনে দেখা যায় বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির ততটা সহায়তা হচ্ছে না। তথাপি ভোলা উচিত নয়, নীতি হিসাবে একটা প্রশংসনীয় নীতি

ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন, সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সরকারী নিশ্চলতা ভাঙছে। তবু লক্ষ্য করা উচিত যে, প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে ক্ষেত্রসমূহে এখন পর্যন্ত উদ্যোগ সর্বাপেক্ষা সামান্য, তার মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষা, অন্যটি পুনর্বাসন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা 'সভ্যতার সংকটের' নূতন নূতন বিকার-লক্ষণ দেখতে পাই। মার্কিন অর্থনৈতিক সহায়তার জুড়ি রূপেই এ ক্ষেত্রেও আসছে মার্কিন বস্তাপচা মাল ও বস্তাপচা মার্কিনী ওস্তাদ। কোথায় আজ সেই গণতন্ত্রের বাণী আমেরিকার? 'মানবাধিকারের' ঘোষণা যে করেছিল, লিনকন্ জেফারসনের সেই আমেরিকা গেল কোথায়? কোথায় গেল এমার্সন, মার্ক টোয়েনের সুস্থ উদার মানবীয় ঐতিহ্য? যৌন-উত্তেজনা, বর্বরসুলভ নির্মমতা, অমানুষিক নৃশংসতার গুণকীর্তন, খুনখারাবি রাহাজানির প্রশংসা, যুদ্ধবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, নৈবাশ্যবাদ ও শিল্পে উদেশ্য-হীনতার প্রচার, ছ্যাবলামি বা কমিক স্ক্রিপ্টের প্রসার, ম্যাজিক, বিজ্ঞান-বিরোধী রহস্যবাদ, ধর্ম ও ভাববাদের নামে মেকি অধ্যাত্মবাদের প্রচার—এসব এ কালের মার্কিন-বিকৃতির অবলম্বন। মানুষের জাগ্রত চেতনাকে আচ্ছন্ন করাই তার লক্ষ্য, এশিয়ার জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধানোই তার উদ্দেশ্য। হলিউডের হত্যা, গুণ্ডামী, যৌন-বিকৃতি-মূলক ফিল্ম, সে ধরনের সস্তা পকেট বই, 'লাইফ'-জাতীয় চিত্র-বহুল বিভ্রান্তিজীবী পত্রিকা,—এসব ত আছেই। তার সঙ্গে বাঙালী লেখক ও বাঙালী প্রকাশনের বেনামীতেও এ জাতীয় মার্কিনী মাল বাঙলা ভাষায় পরিবেশিত হচ্ছে। নামজাদা বাঙলা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রকাশকেরা কাঞ্চন-মূল্যে এসব মার্কিন-পুষ্ট প্রচার-যন্ত্রের লেখক ও বাহক। ক্ষমতাবান্ বাঙালী ছাপাখানার মালিকেরা মুদ্রণ-মুনাফার সূত্রে মার্কিন মুনিবদের তাঁবেদার। সরকার পরিপোষিত এসব ব্যবসায়ীও নেহরু-চৌ-এন-লাই মৈত্রীর বিরোধি-সমালোচক। দেশ-ভ্রমণ ও

বিদেশী বৃত্তির লোভে শুধু বার্তাজীবী নন, অধ্যাপক ও ছাত্ররা মার্কিন কর্তৃপক্ষের দুয়ারে ধরনা দেন। সাংবাদিকেরা, কেউ মালিক হিসাবে বিজ্ঞাপনের জন্য মার্কিন ধনিকদের কৃপাপ্রার্থী, কেউ চাকরে হিসাবে দক্ষিণার বশে মার্কিন তথ্যাদি সাজিয়ে-গুছিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে বাজারে ছাড়তে উৎসাহী। স্কুল-কলেজগুলি মার্কিন কাগজ-পত্রে ও 'শিক্ষা-ফিল্‌মে' ছেয়ে গিয়েছে, মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ' ও 'বক্তৃতাকারীদের' সুনজরে তারা প্রায় অস্থির। দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে নানা গোপন পদ্ধতিতে মার্কিন বক্তাদের জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। ক্যাথোলিক মিশনের শিক্ষালয়াদি মারফৎ, কমিউনিটি প্রোজেক্ট্‌ ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের 'সমাজ-সেবী'দের উদ্যোগে, আমেরিকা-ফেরত ভারতীয় সাংবাদিক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের মাধ্যমে, 'নৈতিক পুনরস্ত্রীকরণের' পাণ্ডাদের প্ররোচনায়, 'ফ্রীডম অব কালচারের' সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায়—অন্তত বাঙলা দেশে আমাদের জানতে বাকী নেই মার্কিন প্রভাব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কি আকার ধারণ করছে।

এ সব সত্ত্বেও আমরা জানি—বাঙলা দেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে মার্কিন অর্থবৃষ্টিতে যত ছত্রক গজাক্‌, সুস্থচিত্ত বাঙালী সংস্কৃতি-কর্মীরা আত্মবিক্রয়ে স্বীকৃত নয়—লিনকন্‌ এমার্সনের আমেরিকাকেও তারা ভুল্‌বে না। শত হতাশার মধ্যেও তারা ত্যাগ করে নি স্বাধীনতায় বিশ্বাস, মানব-চরিত্রে সুগভীর আস্থা, সামাজিক পরিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক পরিবর্ধনের সুদৃঢ় সংকল্প। সেখানে যুদ্ধবাদিতা স্থান পায় নি, বিশ্বশান্তির জন্য আগ্রহ কমে নি, এবং বিশ্বের শোষিত ও নির্যাতিত জাতি ও শ্রেণীসমূহের মুক্তির প্রতি বুকভরা সহানুভূতি বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় নি। সেই সঙ্গেই আরও দেখি রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী, সুকান্ত-জয়ন্তী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিজয়া ও সরস্বতী পূজার মত বাঙালীর জাতীয়

অনুষ্ঠান হতে আরম্ভ করেছে। পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ, ফিল্‌ম, নাটক, চিত্রকলা সঙ্গীতের জলসা—এসবের একটা সাধারণ বিশ্লেষণ করলেও দেখব কাব্যে সাহিত্যে আমরাই ভারতবর্ষে এখনো পুরোধা। যথা, ফিল্মে 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) পথপ্রদর্শক, অভিনয়ে 'রক্ত করবী' (১৯৫৪-৫৫) অদ্ভুত কীর্তি। চিত্রকলার প্রদর্শনী ও সঙ্গীতের জলসা কলকাতায় আর শেষ হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে দেখি বাঙালী সংস্কৃতিক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনা স্থায়ী হয়েছে। বিষয়-বস্তু লক্ষ্য করলে দেখব—সাধারণ মানুষের জীবন শিল্পে-সাহিত্যে ক্রমশ অধিকতর প্রকাশ-মর্য্যাদা লাভ করেছে। মমূর্ষু লোক-সংস্কৃতির মমতায় কলকাতার শহুরে মানুষ দিনের পর দিন ভিড় করে আসে সংস্কৃতি সম্মেলনে, ফিরে পেতে চায় লোক-চেতনার প্রাণ-স্রোত। সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যেও সামাজিক দায়িত্ববোধ গভীরতর হচ্ছে। সংস্কৃতির সমাদর আজ আর দু-চারজন গুণী ও জ্ঞানীর বৈঠকখানায় বা সাহিত্য-পত্রের আপিসে সীমাবদ্ধ নেই;—আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে—প্রত্যেকটি স্কুলে কলেজে, যুবপ্রতিষ্ঠানে, প্রত্যেকটি কেরাণী কর্মচারীর ক্লাবে ইউনিয়নে, গ্রন্থাগারে; এমন কি, বাঙলার শ্রমিক ইউনিয়নে, শ্রমিক বস্তিতে পর্যন্ত।

বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে এমন ব্যাপক প্রয়াস বোধ হয় আর কোনো দিন আসে নি। সত্যসত্যই যদি সামাজিক ক্ষেত্রে আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, দেশের ব্যাহত কর্মশক্তি আপনাকে বাস্তব উদ্যোগে সার্থক করতে পারে,—তা হলে এই সাংস্কৃতিক শুভ-প্রচেষ্টা যথার্থরূপে আপনার প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড়াতে পারবে। তাই, সামাজিক উন্নয়নের (দ্বিতীয়) পরিকল্পনা যেমন 'নব্য গণতন্ত্র' গঠনের অনুরূপ করে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন, তেমনি তারই অনুষঙ্গরূপে নব্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল-কার্যধারাও আমরা কিছুটা পরিমাণে এখনি পরিকল্পনা

করতে পারি—সচেতন ভাবে গ্রহণ করতে পারি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দায়িত্ব।

নব্য-সংস্কৃতি-পরিকল্পনার মুল সূত্র ঃ

সাংস্কৃতিক জীবনের সেরূপ সুস্থ সংগঠনের জন্য এ যুগে যা প্রারম্ভিক কাজ তা হচ্ছে—**দেশের পরিচয় গ্রহণ**। আজ পর্যন্ত আমরা বাঙলার প্রথম অর্থনীতিজ্ঞ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের মত বৈজ্ঞানিক বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে নিজের দেশকে দেখতে চাই নি, তার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি নি, সমাজকে বিচার করি নি, সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহও পরীক্ষা করি নি।—১৯৫১এর বাঙলার আদমশুমারিতে সেই চেষ্টা আবার দেখা দিয়েছে। আমরা আর্থিক পরিকল্পনায়ও যা করেছি সে হচ্ছে নকল—তা অচল মনেরই চিহ্ন। রাণাড়ে ও রমেশ দত্ত একই কালে ভারতে অর্থনীতি চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। পশ্চিম উপকূলে সেই ঐতিহ্য সেখানকার দেশীয় বণিক ও ধনিকশ্রেণীর তাগিদে বলবন্ত হয়ে আজ একটা 'বোম্বে স্কুল অব্ ইকনমিক্স্' গড়ে উঠেছে। নয়া দিল্লীতেও শাসক-তাগিদে নব প্রতিষ্ঠিত 'দিল্লী স্কুল অব্ ইকনমিকস্' সক্রিয়। আর জমিদার-প্রভাবিত বাঙলায় রমেশচন্দ্রের প্রেরণা বন্ধ্যা হয়ে রয়েছে, কৃষি-অর্থবিদ্যা পঠন-পাঠনও প্রয়োজন হয় না। কলিকাতার সাম্রাজ্যবাদী বণিকের দাবী মিটিয়েছে 'ক্যাপিটেল', কিন্তু জাতীয় ধনিক-গোষ্ঠীর অভাবে বাঙলার অর্থনৈতিক আলোচনা এখনো প্রায় জন্মে নি।

এই প্রস্তুতি শেষ করে আমাদের বোঝা প্রয়োজন নব্য সংস্কৃতির কী কী চাই। প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, সংস্কৃতি শুধু বিশিষ্ট কোন শ্রেণীর সম্পত্তি নয়। মানুষের ইতিহাসে এক কালে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে থাকৃত; সেকালে মুষ্টিমেয় লোকই সংস্কৃতির নেতৃত্বও করতে পারতেন।

কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, মুষ্টিমেয়ের সে সংস্কৃতি লোক-সমাজকে বঞ্চিত রেখে নিজেরই বিলুপ্তি ডেকে আনে। এ কালে তাই সংস্কৃতির পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হবেঃ **সংস্কৃতির সার্বজনীনতা সাধন** (Unviversalisation of Culture) সংস্কৃতিবান্‌রা নিশ্চয়ই লোকজীবনের সঙ্গে আন্তরিক ও ব্যবহারিক যোগ স্থাপন করবেন, কিন্তু তাতেই সংস্কৃতি সার্বজনীন হয় না। কৃষক, শ্রমিক, মুটে মজুর, এক কথায় লোক-সমাজকে সংস্কৃতির দায়ভাগে অধিকারী করতে হয় ; তবেই সংস্কৃতি সার্বজনীন হয়।

কার্যত এ বিরাট চেষ্টার সূচনা হয় **সার্বজনীন শিক্ষায়।** বলাবাহুল্য, এ শিক্ষা শুধু তথাকথিত 'বুনিয়াদী শিক্ষা' বুঝায় না। বরং আর্থিক উন্নয়নে ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে সমাজের যে নূতন বুনিয়াদ গড়ে উঠছে তদনুযায়ী শিক্ষাই বোঝানো উচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞান এই সার্বজনীন শিক্ষার প্রাণ, কর্মোদ্যম তার দেহ এবং তার আত্মা মানবতা-বোধ,—প্রত্যেকটি মানুষের মানবীয় অধিকারের চেতনা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই অনুভূতি। বলাই বাহুল্য, শিক্ষা বলতে এরূপ স্থলে বোঝায় দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, নৃত্যকলা ও নাট্যকলার অনুশীলন, এবং প্রাথমিক বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জ্ঞানও। আর, এ শিক্ষার প্রধান আশ্রয় বিদ্যালয় হলেও গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি কেন যে বিদ্যালয়ের সমতুল্য ফলদায়ক হতে পারে না, তা অন্তত বুদ্ধির অগোচর।

শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে যে শিল্পায়ন ও আর্থিক উদ্যোগ আমরা চাই তার জন্যও দরকার হবে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। বিশেষ করে তাই বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার দিকে আমাদের সমস্ত সংস্কৃতির মুখ ফেরানো প্রয়োজন। উনবিংশ শতকে আমরা যে পরিমাণে সাহিত্য ও দর্শন-মূলক ভাবনার বা Liberal Education-এর ভক্ত হয়েছিলাম, তার সিকিভাগ ভক্তিও আমাদের ছিল না

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় Scientific Education-এ, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে ও কারুবিদ্যায়। বিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার এই যে, জীবন বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতিতে গঠন না করলেই নয়। বিংশ শতাব্দীতে তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ সত্য উপলব্ধ হচ্ছে—সংস্কৃতির পরিচয় শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, নৃত্যকলায় নয়; **সংস্কৃতির প্রধান বাহন আজ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি**—যা সৃষ্টিশক্তিকে বাস্তব সার্থকতা দান করে। অন্য ভাষায় একে বলতে পারি—আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য **সংস্কৃতির সার্বাঙ্গীণতা-সাধন** (making culture all-embracing)। কারণ, সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টিশক্তির ব্যবহার বাস্তব ও মানসিক সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করা, মানুষের সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন, প্রকাশ ও প্রয়োগ।

বাঙালী সমাজের বিশেষ সংকটের কথা বিবেচনা করে আমরা যদি বলি—আগামী পঁচিশ বৎসরের মত বাঙালী জাতি সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নাট্যকলার অপেক্ষা যেন বিজ্ঞানের ও কারুবিদ্যার সাধনা অধিক করে, আশা করি তাহ'লে কেউ ভুল বুঝবেন না। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর 'কেরানির কালচার' এখন 'মিস্ত্রী-মজুরের কালচারে' পরিণত হোক্, এইমাত্র আমরা চাই না;—সে আশঙ্কাও আমরা করি না। কারণ, আমাদের মেদেমজ্জায় সাহিত্য ও সুকুমার কলার অনুরাগ—তা আমরা ছাড়ব কি করে? কিন্তু যে সাহিত্যবোধ, যে শিল্পানুরাগ, এমন কি, যে রসানুভূতি জীবনের বাস্তব উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত নয়,—বৈজ্ঞানিক চিন্তায় যার শোধন হয় না, বিশ্বকর্মার কারখানায় যার যাচাই হয় না,—সে সাহিত্যবোধ ও শিল্পানুরাগ বিশেষ অব্‌জেকটিব্‌ ও জীবনধর্মী নয়। বিস্রস্ত মানসলোকের সেই সৃষ্টি যে অগভীর ও ক্ষীণায়ু হয়, তা কি আমরা মর্মে মর্মে জানি না? তার চেয়ে 'বাবু কালচার' বা 'কেরানি

কালচার' না হয়ে আগামী দিনের বাঙলার সংস্কৃতি মিস্ত্রী-মজুরের কালচার হোক,—তাও বরং কাম্য। কারণ জীবনের সঙ্গে কেরানির অপেক্ষা মিস্ত্রী-মজুরের যোগ গভীরতর।

হয়ত কথাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—বিংশ শতকের বাঙালী সমাজের ও সংস্কৃতির যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মৌলিক পরিবর্তন। এতদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতি ছিল বহুলাংশে পরাহত জাতির জীবন-কুণ্ঠা, তার মূলনীতিটা ছিল তথাকথিত ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদ। আত্মকেন্দ্রিকতায় ও কল্পনা-বিস্তারে—শিল্পে, সাহিত্যে আমরা অভিনব সাফল্য অর্জন করেছি। কিন্তু সুস্থ, বীর্যবান্ জীবন-নিষ্ঠা ছাড়া কোনো সমাজ বাঁচে না, কোনো সংস্কৃতি যথার্থ বিকশিত হয় না। ইতিহাসের সেই ঘাটতি আমাদের সংস্কৃতিতে পূরণ করবার দিন আগেই এসেছে। তাই আজ আমাদের সংস্কৃতির **মূল মন্ত্র হোক,—জীবন-নিষ্ঠা, অর্থাৎ বাস্তব-বোধ ও বাস্তব জীবন-দর্শন।**

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে এই দাবীই করব, আমাদের চাপা-পড়া সৃষ্টিশক্তি এবার যেন মুক্তির পথ পায়।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,
হে ভগবান্। *

* নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের (১লা জানুয়ারী, ১৯৫৫) সমাজ ও সংস্কৃতিশাখার সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ।

মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্র

আমেরিকা ফেরৎ একজন অধ্যাপক-সুহৃৎ মার্কিন জীবনের গল্প বল্‌তে বল্‌তে বলছিলেন: "দৈনিক কাগজগুলি ১২ থেকে ২৪ পৃষ্ঠা, কখনো বা তা ৬৪ পৃষ্ঠার কাগজ। তারও আবার দিনে ৪টা করে সংস্করণ। কেনে লক্ষ লক্ষ লোক; কারণ কেনাই দস্তুর। কিন্তু পড়বে কখন অত লেখা? বাসে ট্রেনে দেখবেন সবাই রেখে দিয়ে যাচ্ছে সেই কেনা কাগজ—স্তূপাকৃতি। সে কাগজ পথে ঘাটে উড়ে বেড়ায়—নোংরা জঞ্জাল। জিজ্ঞাসা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বলেন, 'খবরের কাগজ পড়ে কে? সপ্তাহে একদিন 'টাইম্' বা 'নিউজ' প্রভৃতি কোনো কাগজ দেখে নিলেই যথেষ্ট।"

গণতন্ত্র বনাম মুদ্রাযন্ত্র

গণতন্ত্রের প্রথম বাহন ছিল মুদ্রাযন্ত্র। অনেকের মতে, আধুনিক কালের প্রথম সূচনাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনে। তার পরে সংবাদপত্র যখন দেখা দিল তখন গণতন্ত্র অনিবার্য হয়ে গেল। ফরাসী বিপ্লবের যুগে সংবাদপত্রের নাম হয়েছিল "চতুর্থ প্রতিষ্ঠান"—অর্থাৎ পার্লামেণ্টের মতই জনশক্তির আর একটি ঘাঁটি। আজ অবশ্য রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিও তার জুড়ীদার—পশ্চিম জগতে রেডিও ঘরে ঘরে, টেলিভিশনও এখন বাড়িতে বাড়িতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নও শেষ হয়ে গিয়েছে। যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একদিন জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের একটা প্রধান কথা ছিল, আজও তা মৌলিক অধিকার বলেই গণ্য হয়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের উপর জনসাধারণের আর অধিকার নেই। মুদ্রাযন্ত্রের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে অসীম, কিন্তু সেই ক্ষমতার মূল সেই অনুপাতেই শুকিয়ে গিয়েছে। তাই, মার্কিন কাগজের কাট্‌তি লাখে লাখে। কিন্তু তা আর কেউ তেমন-ভাবে পড়ে না।

সাধারণ মানুষের তা পড়বার সময় নেই, শিক্ষিত মানুষের তা পড়বার প্রয়োজন নেই ; তবু তা কাটছে লাখে লাখে। ব্রিটেনের প্রধান দৈনিকগুলির কাটতিও কম নয়, ২৫ লাখ ছাড়িয়ে ৩০ লাখ উঠতে যাচ্ছে 'ডেলি এক্সপ্রেস,' 'ডেলি মেল', 'ডেলি মিরর' প্রভৃতি ইংরেজি দৈনিকের কাট্‌তি। অবশ্য শিক্ষিত ইংরেজের এসব দৈনিকের প্রতি অত ঘৃণা নেই ; কিন্তু তবু তার প্রতি শ্রদ্ধাও নেই। নিজ নিজ রুচিমত ইংরেজ তবু দৈনিকপত্র কেনে, পড়ে এবং আপনার জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তার আওতায় নিজের রুচিও গঠন করে। একেবারে 'খবরের কাগজ কে পড়ে ?' এমন কথা তারা বলে না।

এইসব মার্কিন ও ব্রিটিশ কাগজের কাটতির অঙ্ক দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই। জাপানেও ঐরূপ। ব্রিটেনের ৫ কোটি মানুষ প্রায় সকলেই লিখতে পড়তে জানে,—জাপানেও তাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ১৫½ কোটি বাসিন্দার মধ্যে সামান্য দু-দশ লক্ষ হয়ত নিরক্ষর থাকতে পারে, কিন্তু ১৪।১৫ কোটি নিশ্চয়ই মার্কিণ রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি লিখতে পড়তে জানে। তা ছাড়া, কোনো মানুষই সে সব দেশে এত গরীব নয় যে, দৈনিক কাগজ কিনতে পারে না। কেনার অভ্যাসও তাদের আছে ; কারণ কাগজ কেনাই নিয়ম। ইউ-এন পরিসংখ্যন থেকে দেখি—১৯৫০এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে হাজারে ৩৫৭ জন সংবাদপত্র পড়ত ; ব্রিটেনে পড়ত গড়ে ৫৯৯ (প্রায় ৬০০) জন। ভারতবর্ষের কথাও এই প্রসঙ্গে বল্‌তে পারি—গড়ে হাজারে আমাদের সংবাদপত্র পড়ত মাত্র ৬ জন (চীনে পড়ত ১০ জন)।

মহাকায়ের স্বরূপ

এই সব সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা দেখে চমকিত হবার কারণ নেই। কারণ, কি জাতীয় সংবাদপত্র পড়ে আমেরিকার বা ইংলণ্ডের

মানুষ? ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ কাগজের দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়—সকল বিষয়েই কত কথা! সত্যইত, কত জ্ঞাতব্যই না আছে তাতে—ঘটনা, খেলা, নাচ-গান-থিয়েটার। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কাগজের দিকে তাকলে বিভ্রান্ত হতে হয়—আশ্চর্য! খেলা নাচ গান ছাড়া ব্যবসাপত্র এবং কী যে আছে কী যে নেই, তাই বুঝা যায় না। এত জ্ঞাতব্য দিয়ে কি হবে মানুষের! কিন্তু ওসব 'শ্রেষ্ঠ' কাগজ যে বেশী লোকে পড়ে তা নয়। বরং বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষ যা পড়ে আমাদের সংবাদপত্র পাঠকেরা এখনো তা সংবাদপত্রে আশা-করে না (সে বিষয়ে আমাদের প্রেস কমিশনের রিপোর্ট যে তুলনা ও মন্তব্য করেছেন, তা যথার্থ ও দ্রষ্টব্য)। খেলা, নাচ-গান থিয়েটারও হয়ত আছে, কিন্তু ওদেশে প্রাধান্য যে খবরের তা হচ্ছে 'ক্রাইম', 'সেনসেশন', খুন, ডাকাতি রাহাজানী, যত বীভৎস, ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর কাণ্ডের আব যৌন বিকৃতির ও অপরাধের ফাঁপানো ফোলানো খবর। আমাদের দেশের মত রাজনীতির খবরের প্রাধান্য তাদের সাধারণ কাগজে নেই। অবশ্য যে সব কাগজ রাজনীতিক পাঠকের জন্য, তার মানদণ্ড অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু সাধারণ মানুষ ওসব দেশে রাজনীতিক খবরকে তত লোভনীয় মনে করে না।

এ কথার থেকে যেন মনে না করি—ওসব দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের থেকে বেশী অপরাধ প্রবণ, বা রাজনীতিতে কাঁচা। সব দেশের সাধারণ মানুষ মোটামুটি এক ধরণের—খেয়ে পরে বাঁচতে চায়—এবং একটু ফুর্তি চায়।

এই খেয়ে-পরে-বাঁচার দাবিটা তার মনে ঠিক মত জাগবার সুযোগ পাবে, এবং 'ফুর্তিটাতে' তার মনের সানন্দ স্ফূর্তি সম্ভব হবে, আদি যুগে 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার' এইটাই ছিল উদ্দেশ্য। লক্ষ্য করবার জিনিস এই যে, এসব 'সভ্যতম'

দেশগুলিতে গণতন্ত্রের সেই আশা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। কারণ সংবাদপত্র ব্যবসায়ে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধান চেষ্টা হয়েছে যে করে হোক মুনাফা বাড়াতে হবে, এবং সে উদ্দেশ্যে যে করে হোক তার ক্রেতা বড়ানো চাই। এই মুনাফা বাড়াবার নিয়মে একদিকে সংবাদপত্র হয়ে উঠেছে ব্যবসায়ি-চক্রের বিজ্ঞাপন-বাধ্য মুখপত্র, বিজ্ঞাপন-বশ। অন্যদিকে সংবাদপত্র পাঠককে তুষ্ট করার প্রয়োজনে নিয়েছে দুষ্ট পথ—সংবাদপত্রের কাজ আজ সংবাদ যোগান নয়, সংবাদের নামে সেনসেশন যোগান। ফুর্তির নামে তা করছে বিকৃতি বৃদ্ধি। তার লক্ষ্য শুধু সাধারণ লাভ লোকসান নয়, তার লক্ষ্য মুনাফার পাহাড় তৈরী করা এবং সংবাদ-পত্রের মারফৎ সমস্ত সমাজ-যন্ত্রের উপর 'বৃহৎ ব্যবসায়ের' আধিপত্য বিস্তার, সামাজিক সৃষ্টিশক্তিকে চাপা দেবার জন্য থট্ কন্‌ট্রোল।

মালিকানার বেড়াজাল

এই মহাকায় সংবাদপত্রের মালিকানা আজ যাদের হাতে তারা আর তাই সাধারণ ব্যবসায়ী নয়, তারা 'মহা-ধনিক গোষ্ঠী'—ইংলণ্ডে হার্মাস্‌ওয়ার্থ গ্রুপ, প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হার্ষ্ট, স্ক্রিপস্-হাওয়ার্ড ম্যাককোরমিক-প্যাটারসন্ প্রভৃতি। শুধু তাই নয়—আমেরিকায় এরাই 'নিউজপ্রিন্ট' বা ছাপার কাগজ কোম্পানি-গুলিরও মালিক। আর তাদের মর্জি না হলে অন্য কোন সংবাদপত্র পয়সা দিলেও ছাপার কাগজ পাবে না। আমাদের দেশও অবশ্য নিউজ প্রিন্টের জন্য তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অন্যদিকে এই সব মহামালিকেরই আবার সম্পত্তি হল সংবাদ-সরবরাহ সংস্থা রয়টার কোম্পানি (গত ১৯৫২তে তার একশ বৎসর পূর্ণ হল), যার সঙ্গে আমাদের ভারতের সংবাদপত্রের বড় বড় মালিকেরা সন্ধি করে ১৯৪৬এ 'রয়টার-পি' টি, আই' গঠিত

করেছেন—বিলাতী মহামালিকের সঙ্গে এদেশের নয়া মালিকদের মিতালিতে ভারতীয় সংবাদপত্রের ছোটদের স্থান হয়নি। মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি আছে বিশ্বগ্রাসী দানব, "এ, পি," "ইউ-পি," ও "আই-এন-এস্" (তার শতবার্ষিকী হচ্ছে ১৯৫৬তে); মার্কিন নরমপন্থী মজুর প্রতিষ্ঠানরা গড়েছিল "এফ, পি," অন্যদের তুলনায় তা নগণ্য। 'এ পি ই' হচ্ছে মহাসুর, 'ইউ-পি' এখন তার জুড়ী। এই সব বৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠানদের ছাঁটাই-কলে ঘটনা ছাঁটকাট হয়, দরকার মত একেবারে বর্জিত হয়, আবার দরকার মত রচিতও হয়।

শুধু তাই নয়, এরাই আবার ২৩৫টি 'নিউজ ফিচার' বা সংবাদ পত্রের প্রবন্ধ বিলির সিণ্ডিকেটের বা সংঘের মালিক—তারা প্রবন্ধ বিক্রীর ব্যবসা চালায় পৃথিবী জুড়ে (ভারতবর্ষেও)। অর্থাৎ এক প্রবন্ধই জোগায় রাশি রাশি কাগজে। তাই সংবাদ পত্রের প্রবন্ধেও আর বৈশিষ্ট্যের নামগন্ধ নেই, স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতার প্রশ্ন নেই।

তা ছাড়া, এই সব প্রতিষ্ঠানের মতই সংবাদ-সাম্রাজ্যের কবলেই আমেরিকার বইএর ব্যবসা, এবং রেডিও-কোম্পানী সমূহও আবার সন্ধিসূত্রে তাদের সহযোগী। সংবাদ-সম্রাটরা সংস্কৃতিরও তাই কর্ণধার।

কিন্তু এই সংবাদ-সাম্রাজ্য কাদের হাতে ?—বিজ্ঞাপন দাতাদের অর্থাৎ বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর। আমরা এখানে 'লাইফ, টাইম্', 'স্যাটারডে-ইভিনিং পোষ্ট' প্রভৃতি বিজ্ঞাপন-চর্চিত কাগজ দেখি। হয়ত জানিনা, এসব কাগজের এক এক কপির যা মোট খরচ, দাম তার থেকে কম ; কিন্তু মূনাফা তবু আকাশচুম্বী, কারণ বিজ্ঞাপনের আয় মহাকাশ-স্পর্শী। এভাবে ব্যবসায়ি-চক্রের হাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ক্রমশ পরিণত হয়েছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রে এবং কার্যত সংস্কৃতির রাহুগ্রাসে।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের "মালিক-যুগ"

বিদেশের কথা এত বেশী করে বল্‌লাম এজন্য যে, আমরা দৈনিক আমাদের যে কাগজ পড়ি, তার স্বরূপ এখন বোঝা দরকার, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ, আমাদের বাঙলা দেশের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এতদিন পর্যন্ত দৈনিক, এবং কতকাংশে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের উপর নির্ভর করত। ফিলম্‌, রেডিও প্রভৃতি আমাদের তত সহায়ক নয়।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের একদিন প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় ভাবধারায় জনমত গঠন। এই কারণেই সাংবাদিক হয়েছিলেন রামমোহন রায় থেকে গন্ধীজী পর্যন্ত সকলেই। বিশেষ করে বাঙালী সংবাদপত্র সেবীর সে একটা অমর ঐতিহ্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফা-লুণ্ঠনের দিনে) সেই যুগ অতীত হয়ে গিয়েছে। পুরাতন যুগের নাম-মাত্র সাক্ষী হল 'হিন্দু', (মাদ্রাজের), 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'— যারা নূতন যুগের কৌশল গ্রহণে দেরী করেনি। নতুন যুগের প্রতিনিধিই হল বিড়লা, ডালমিয়া, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি মালিকেরা যারা গত ১৯৩০-৩৫এর কালে এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। দেশী ও বিলাতী মালিকের দু'দলে একটা বোঝাপড়া হয়ে এখন 'ষ্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি ইংরেজ মালিককে নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের মালিক-মণ্ডলী তৈরী হয়েছে। তারা এর নাম দিয়েছে—নিউজ পেপারস এডিটাসর কন্‌ফারেন্‌স। হাসবার কারণ নেই— বকলমী মালিকই সম্পাদক।

অবশ্য মার্কিন বা বৃটিশ সংবাদপত্রের তুলনায় আমাদের দেশের সংবাদপত্রের মালিক-যুগের এখনো মোটে শৈশবকাল। কিন্তু তাই বলে আমাদের সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ কি আর অন্যরূপ হতে পারে না?

"ডলারের ছত্রচ্ছায়া"

এদেশের সংবাদপত্র আপন ধারণায় প্রসার লাভ করবার সুযোগ পেলে কি হত, তা বলা হয়ত অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের সংবাদপত্রের ভাগ্যে সে সুযোগ জুটবে কিনা তা সন্দেহ। ইতিমধ্যেই আমরা জানি আমাদের মালিক-চক্রের অধিকৃত প্রধান-প্রধান সংবাদপত্রসমূহ ১৯৪৭এর পর থেকে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই মার্কিন সংবাদ-সাম্র্যজ্যের আওতায় গিয়ে পড়েছে। প্ল্যানের ঋণ, কমিউনিটি প্রেজেক্ট্ প্রভৃতি বহুসূত্রে মার্কিন প্রভাব যে ভাবে ভারতীয় জীবনে শিকড় গাড়তে চাইছে, সংবাদপত্র ও সাহিত্য মারফৎ আমাদের মানসক্ষেত্রেও তার জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছে।

ভারতে মার্কিন সাবাদ-সম্রাটদের দু'টি প্রধান কৌশল আছে। একটা সরাসরি মার্কিন সংবাদ-সাম্রাজ্যের ঘাঁটি এদেশে বাঁধা। লাইফ্, টাইম, রিডার্স ডিজেষ্ট প্রভৃতি চটক্দার কাগজ যে আমাদের মনের উপরে কেমন করে রাজ্য বিস্তার করছে তা আমরা জানি না। কিন্তু তাদের এই কূটনৈতিক চাল যে শুধু কাগজের কাটতিতে তা নয়, ঘাঁটি বাঁধার কৌশলেও তা লক্ষণীয়। দেশীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের অফিসেই তাদের ঘাঁটি বাঁধা হয়েছে। প্রত্যেক পত্রিকার স্তম্ভ খুঁজলে দেখা যাবে তার প্রমাণ। যেমন, কোন সিণ্ডিকেড্ ফিচার ছাপা হয়, কি তার বক্তব্য। হয়ত গোপন অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, মালিকেরা ছাড়াও কোন্ কোন্ সংবাদপত্রের বাঙালী সাংবাদিক ব্যক্তিগত ভাবে মার্কিন পরিচালিত কাগজের বা প্রচার অপিসের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত, প্রকাশকদের মধ্যে কে কে হঠাৎ বেনামীতে কেন মার্কিন-প্রচারক গোষ্ঠীর সাহিত্য ছাপছেন, অনুবাদ ছাপছেন, কেন তাতে ভূমিকা লেখবার জন্য কেউ কেউ উদ্যোগী হচ্ছেন।

ডলারের এই কেরামতী একটু সতর্ক হলেই সাধারণ মানুষের চোখেও পড়ে। আর, বাংলা মাসিকপত্রগুলির মধ্যেও তার অনুপ্রবেশ অস্পষ্ট নয়।

ভারতের ভিতরে ঘাঁটি বাঁধবার অন্য মার্কিন কৌশল হল বেনামী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। যেমন, 'এশিয়ার বন্ধুগোষ্ঠী' তাদের মার্কিন ফিফ্‌থ কলাম দেশী সংবাদপত্রের মধ্যেই তৈরী করছে। কাজটা অবশ্য এখন অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে—কোরিয়ার যুদ্ধাবসানের পর থেকে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি মোড় ঘুরছে। অন্য দিকে মার্কিন রাষ্ট্রনীতি পাকিস্তানকে তার ঘাঁটি করে ভারত সরকারকে বিরূপ করে তুলেছে। তাই বলে সাংবাদিক মহলের গোপন মার্কিন যোগাযোগ বিনষ্ট হয়নি এবং মার্কিন লাইফ্, টাইম্ প্রভৃতির কাট্‌তি, বা ফিল্‌ম্ ও বিকৃত রুচির বই প্রভৃতির ব্যবসা অব্যাহত আছে। 'সাংস্কৃতিক' প্রচারের পরোক্ষ প্রভাব বরং শিক্ষক, সাংবাদিক, অধ্যাপক মহলে আরও প্রসারিত হয়েছে।

দুঃখের কথা, বাঙলা সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন হতে না হতেই তার গোড়া-কাটা সুরু হল। শুনেছি ফরাসী সংবাদপত্রও এমনি করেই ফ্রান্সের পরাজয়ের অনেক পূর্বেই হিটলারের করতলগত হয়ে গিয়েছিল। অবস্থাটা নিশ্চয়ই এ দেশে তদনুরূপ ভয়াবহ নয়।

"তাঁবেদারী প্রেস"

আমাদের মুদ্রাযন্ত্রের প্রধান বিপদ এখনো বাইরের বিপদ নয়। আমাদের প্রধান বিপদ ঘরের ভেতরেই। সংবাদপত্রের ব্যবসায়ের দিকটা প্রচণ্ডরূপে ফেঁপে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটিশ সরকার তখন সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে তিনগুণ-চারগুণ মুনাফার সুযোগ করে দিয়ে মালিকদের নিজেদের যুদ্ধায়োজনের সহকারী করে নেন। তাই সংবাদপত্রের আকার অর্ধেক হয়, দাম দ্বিগুণ হয় (পাঠকের উপর ট্যাক্‌স্‌ও দ্বিগুণ হয়); বিজ্ঞাপনের

দামও দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়। তাতে মালিকদের যে সৌভাগ্য লাভ হল পরে আর সংবাদপত্র-মালিকদের পক্ষে সে লোভ সামলানো সম্ভব হ'ল না। বিশেষ করে, অতি-মুনাফাদারী মালিকেরা এর পরে রাজনৈতিক পরিবর্তনে স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক মহলেও প্রবেশ করলেন। ১৯৪৭এর পরে শাসক-শোষক মণ্ডলীর কাছে তাঁদের আত্মবিক্রয় করতে বাধা রইল না—বিশেষ করে যখন শাসক-যন্ত্র আসলে দেশীয় ধনিকমণ্ডলীরই করায়ত্ত হল। অর্থাৎ সরকারী আত্মপ্রচার মূলত মালিকী-প্রাধান্যেরই প্রসার; তাই সে প্রচারে সংবাদপত্রের মালিক শ্রেণীরই স্বার্থসিদ্ধি হয়—একথা সকল ধনিকতন্ত্রী দেশ সম্বন্ধেই অল্পাধিক সত্য। তথাপি যেখানে ধনিকতন্ত্রের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চেতনা আছে, এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য একেবারে বিনষ্ট হয় নি,—যেমন, ব্রিটেনে,—সেখানে এই মূল সত্য মেনেও সংবাদপত্র (নিজের সম্মান ও কাটতির স্বার্থেও) কতকটা সরকারের সমালোচক ও জনমতের বাহক হয়। আমাদের দেশেও সংবাদ-পত্রের সেই সুস্থ ঐতিহ্য সৃষ্টি হতে পারত—রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত তার বাহক হয়েছিলেন। কিন্তু, প্রথমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফার তলায় তা চাপা পড়ল, তারপর ১৯৪৭এ বর্তমান কংগ্রেস সরকারের আত্মপ্রচারের নির্বোধ আতিশয্যে তা আর মাথা তুলবে এমন সম্ভাবনা রইল না। তাই প্রেস কমিশনও আমাদের সংবাদপত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করে বিরূপ মন্তব্য না করে পারেন নি।

কিন্তু সংবাদপত্রের সম্মান ও প্রভাবও যে দিনে দিনে কিভাবে এই মালিক-পক্ষের অন্তর্ঘাতী নীতিতে নিঃশেষিত হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল—পশ্চিম বাঙলার ১৯৫৬ সনে বিহার-বঙ্গ সংস্কৃতি প্রস্তাবের আন্দোলনের কালে। দেখা গেল সংবাদপত্র নিতান্তই আজ সরকারের 'রক্ষিত' প্রচারপত্র মাত্র। আরও দেখা

গেল—সংবাদপত্রের বাধায় জনমত অনেক সময়ে ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু জনমত প্রবল ও সুদৃঢ় হলে সংবাদপত্রের বাধা সত্বেও আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সংবাদপত্রের সাধুতায়, মতামতে, উদ্দেশ্যে লোকের শ্রদ্ধা তাই আজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। কারণ, সংবাদপত্র শুধু মালিক-পত্র হয়নি, মুদ্রাযন্ত্র হয়ে উঠছে জন-জীবনের যন্ত্রণাস্বরূপ।

কথাটা এই যে, সংবাদপত্রের পাতায় সত্য পাওয়া সম্প্রতি সহজ হয় না, দেশীয় ও বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের এই ষড়যন্ত্রে ক্রমেই কি তা অসম্ভব হবে? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কি এদেশেও একটা 'ভারতীয় সংস্করণ' মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রেই পরিণত হবে? সংবাদপত্র যদি শুধুমাত্র ব্যবসা বা মুনাফার যন্ত্র হয় তাহলে হয়ত এরূপই তার বিধিলিপি।

গণতন্ত্রের আত্মরক্ষা

অবশ্য অন্য একটা কথাও আমাদের গণতন্ত্রী জনকর্মীদের বোঝা দরকার। নিশ্চয়ই শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষরের দেশে জনতাকে গঠন করার শ্রেষ্ঠ পথ সংবাদপত্র পরিচালনা নয়,—সে পথে ছবি, গান, কথকতা, মুক্তক্ষেত্রে অভিনয়ই বেশি সফল। তার অর্থ এ নয় যে, মুদ্রাযন্ত্র বর্জনীয়, মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্র উপেক্ষণীয়, কিম্বা মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা অবাঞ্ছনীয়। কারণ মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্র আসলে হচ্ছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মালিকতন্ত্রের চক্রান্ত এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শাসক-গোষ্ঠীর অভিযান।

তা ছাড়া বর্তমান মালিকতন্ত্রী সমাজের মধ্যেও সাধারণের সত্য ঘটনা জানবার ও যথার্থ মতামত জানাবার কিছু কিছু উপায় হতে পারে। যেমন, প্রথম পথ—পাঠক সাধারণের সমবায় মূলক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা,—বিলাতের ডেলি ওয়ার্কার এভাবেই পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের

(টি, ইউ, সি) বা সেরূপ জন-সংগঠনের (পার্টিদের) নিজের আওতায় নিজ নিজ সংবাদপত্র গঠন করা। তৃতীয়তঃ, জেলায় জেলায় জন-সমাজের সংবাদপত্র গড়া। চতুর্থত, এই নিরক্ষর দেশের জসনাধারণের জন্য পথে ঘাটে হাটে-বাজারে ফিল্‌ম্‌ রেডিও ও প্রাচীর-পত্র পরিচালনা করা। অবশ্য প্রধান কথা—সংবাদপত্রের মালিকদের মুনাফা-নিয়ন্ত্রণ। এবং সমাজতন্ত্রই হোক বা লোকায়ত্ত রাষ্ট্রই হোক্‌, কিম্বা হোক ওয়েলফেয়ার ষ্টেট, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করা। কারণ, মতের স্বাধীনতা ও মনের স্বাধীন জিজ্ঞাসা ব্যাহত হলে মালিকতন্ত্রের মতই সমাজতন্ত্রেও কোনো সৃষ্টি সম্ভব হবে না, কোন সংস্কৃতিই বাঁচবে না।



এই আলোচনা মুদ্রণকালে (১৯৫৬) পণ্ডিত জওহরলাল প্রকাশ্যেই দিল্লী ও পাঞ্জাবের সংবাদপত্র সমূহের সম্বন্ধে বৈদেশিক যোগাযোগের অভিযোগ করেছেন। বলা বাহুল্য, অন্য প্রদেশেও অনুরূপ যোগাযোগ নেই, এমন নয়।

স্বাধীনতার সাহিত্য

১৯৫০এর একটি সাহিত্য সভায় আলোচনা উঠেছিল—স্বাধীনতা লাভের পরে বাঙলা সাহিত্য কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গাঙ্গুলী পরিচ্ছন্ন আলোচনায় বলেছিলেন, 'চার-পাঁচ বৎসর পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যে একটা চাঞ্চল্য ও গতিময়তা দেখেছিলাম। আজ তা, নেই।'

সাহিত্য এভাবে বিচার করা একটু বিপজ্জনক—অত স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক পরির্তনের ফল সাহিত্য লাভ করে উঠ্‌তে পারে না। তাছাড়া, সকল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা কে অনুসন্ধান করেছে? সকল সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থের খোঁজ কে রাখে? বিশেষত, সকল যুগেই যা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় সে সব লেখার শতকরা ৯৫টি ব্যর্থ, হয়ত জন্ম-মৃত। আর যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তারও শতকরা ৭৫টি আসলে ব্যর্থ ও বাঁচবার অযোগ্য। পুষ্টির অভাবে মৃত্যু ঘটে হয়ত এরূপ শতকরা ৫টি পুস্তকের। কাজেই ১৯৪৭এর পরবর্তী সাহিত্যের বিচার করতে বসে এই অজাত-মৃতদের সংখ্যা দেখে আঁৎকে উঠবার কারণ নেই। সর্বকালে সর্বদেশেই সাময়িক সাহিত্য এবং সমসাময়িক সাহিত্যের সম্বন্ধে এ কথা সত্য। এমন কি, সর্বকালেই প্রেমের কবিতাও শতকরা ৯৫টি অপাঠ্য; অথচ সর্বাপেক্ষা বেশি লেখা হয় প্রেমের কবিতা। যা যত বেশি জন্মে তা তত বেশি ছাঁটাই হয়। তবে সাধারণের রুচি ও প্রবৃত্তির সাময়িক সুযোগ নিয়ে দু' একদিনের মতও কোনো অযোগ্য লেখা আসর জমাতে পারে না, তা নয়। সর্বদাই তা জমায়। তার থেকে আমরা পাঠক সমাজের মন ও মতের একটা দিক বুঝতে পারি। কারণ, পাঠক-সমাজ আসলে বিরাট জনসমাজেরই এক প্রত্যক্ষ প্রতিভূ। তাই পাঠকের মন ও মত সামাজিক মন ও মতের প্রতিলিপি; আর সমাজের মন ও মত

আবার প্রধানত সমাজের আর্থিক-রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার একটি যোগ-বিয়োগের ফল। এই 'প্রধানত' অর্থ 'একমাত্র' নয়, তাও স্মরণীয়। এ পদ্ধতিতেই আমরা এ সময়কার সাহিত্যকে দেখব—এটা স্থায়ী কলাকীর্তির বিচার নয়, সাময়িক লক্ষণের হিসাব।

বিশেষ একজন লেখকের বিশেষ একটি লেখা ও এই সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে সর্বাংশে সঠিক বিচার করে ওঠা কঠিন ; কিন্তু প্রধান একজন লেখকের সকল লেখা নিয়ে এ দৃষ্টিতে তাঁর প্রধান লক্ষণটা মোটামুটি পরিমাপ করা সম্ভব। তার অপেক্ষাও অধিক সম্ভব এই সমাজিক মাপকাঠিতে এক-একটা ছোট বা বড় পর্বের সাহিত্যের বা শিল্পের পরিমাপ—যদি মনে রাখি সাহিত্যে সমাজের ছায়া প্রায়ই সরাসরি পড়ে না, তা পড়ে সূক্ষ্ম-স্থূল নানা বিচিত্র পথে ; এবং যে সাহিত্য যত সার্থক তাতে এই ছাপ তত প্রচ্ছন্ন। দ্বিতীয়ত, শুধু সামাজিক ছায়া-বা-প্রতিচ্ছায়া দিয়েও সাহিত্য সাহিত্য হয় না, তাকে সাহিত্যের নিয়মে সাহিত্য হতে হয় সর্বাগ্রে। প্রতিচ্ছায়া সরাসরি পড়লেই যদি সাহিত্য হত তা হলে সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয় ও নেতাদের ভাষণই হত সাহিত্য। সামাজিক সত্যের যান্ত্রিক প্রতিলিপি যদি সাহিত্যে কেউ প্রত্যাশা করেন, তা হলে সরকারী বে-সরকারী ইস্তাহার ও 'রিপোর্টই' যেন তিনি পাঠ করেন—অবশ্য তাতে প্রসাদগুণ থাকলে তাও সাহিত্য হিসাবে অপাঠ্য হবে না।

এখন প্রশ্ন হবে—বর্তমানে বাঙালী সমাজের কি তফাৎ ঘটেছে যে, বর্তমান বাঙলা সাহিত্য তখনকার তুলনায় এখন অন্যরূপ হয়ে পড়ল ?

রূপান্তর ও বিরূপতা

১৯৪৭এর 'পনেরই আগষ্ট' ভারত স্বাধীন হয়েছে। ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র ভারত' স্থাপিত হয়েছে।

রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটছে, কিন্তু অর্থনীতিতে স্বরাজ এখনো অনায়ত্ত। তা ছাড়া, আমি জন্মেছিলাম পূর্ব-বাঙলায়, মানুষ হয়েছি পশ্চিমবাঙলায়। কাজেই, আমার পক্ষে আর বিস্মৃত হবার পথ কোথায় যে, বাঙালী সমাজে বিপর্যয় ঘটেছে ;—যখন জানি শিয়ালদহ ষ্টেশনের কথা, উদ্বাস্তু কোলোনির ব্যাপার।

তবে বাঙলী সমাজের এ সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়ও একেবারে আকস্মিক নয়। কারণ, মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের পটভূমি লক্ষ্য করলেও আমরা দেখি—আমাদের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তারপর উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান পশ্চাতে পড়ে থেকে নিজেও পিছনে পড়েছে, জাতিরও অগ্রগতিকে উপেক্ষিত করেছে। তখনও বাঙলার ও ভারতের রাজনৈতিক জীবন অখণ্ড সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। শেষে, অন্ততঃ গত ত্রিশ বৎসর ধরে, ভারতের ও বাঙলার সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই আত্মঘাতের পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। প্রথম-মহাযুদ্ধের শেষেই মধ্যবিত্ত অগ্রগামিতার দিন ফুরায় ; আর গত মহাযুদ্ধের কালে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের শেষ বনিয়াদ ধ্বসে যায়। তথাপি মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধের ঠিকদারী ও কালো-বাজারী লাভকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষে জন্মে এক বিকৃত পুঁজিবাদী গোষ্ঠী—এরা ফেঁপে উঠল দেশে কল-কারখানা বাড়িয়ে নয়, শিল্পোন্নয়ন করে নয়, এমন কি দেশের উৎপাদন বাড়িয়েও নয়। কারণ, তা যুদ্ধকালে প্রায় বাড়েই নি, যুদ্ধের পরে ১৯৫২ পর্যন্ত আরও কমেছে। তারপর উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি হয় নি। এরা ফেঁপে উঠল সাম্রাজ্যবাদীদের বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির মত যুদ্ধের মুনাফাদারীর সুযোগ নিয়ে, বিশেষ করে কালোবাজারী কৌশল গ্রহণ করে।

পনেরই আগষ্টের ভারত বিভাগ, বঙ্গ-বিভাগ, ক্ষমতাবানদের মুখপাত্র হিসাবে কংগ্রেসের 'রাজ্য লাভ', লীগেরও পাকিস্থান

লাভ—এই পরিবর্তনে ব্রিটিশ শোষক স্বার্থ পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়েছে এবং ভারতের কালোবাজারী পুঁজিদার গোষ্ঠীও যথার্থ অভীষ্ট লাভ করেছে। কারণ, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রে ও প্রদেশে যে ভাবে কালোবাজারী স্বার্থে এ কয় বৎসর দেশ শাসন করেছে, তাতে অবশ্য পরিচালকদের আত্মীয়, জ্ঞাতি কুটুম্বরা কোটিপতি হতে পেরেছে, কিন্তু জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতায় সাধারণ মানুষ যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে তাদের মুখে শুধু একটি কথা শোনা যায়—'এর চেয়ে ইংরেজই ভালো ছিল।' সম্পূর্ণ রূপান্তরের অভাবে রূপান্তর সম্বন্ধেও দেশে এই বিরূপতা জেগেছে।

এই নিরাশাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে বাঙলার বাঙালী জীবনের হারিকিরি। দুই বাঙলার সেই আর্তনাদ ও সিংহনাদে বাঁচবার মত শুভবুদ্ধি বিশেষ দেখা যায় না; তাতে দেখছি মরণবুদ্ধিরই আরও ভয়ঙ্কর পরিচয়।

আপাতত বাঙলা সাহিত্য হচ্ছে তাই ব্যাহত বিপ্লবের সাহিত্য, আপাৎকালীন বাঙালীর সাহিত্য;—নতুন নির্মাণের সংকল্প এখনো তাকে স্পর্শ করেনি।

গত কালের দান

অবশ্য যুদ্ধকালের বাঙলা সাহিত্যে যেটুকু শুভচিহ্ন আমরা দেখেছিলাম তা এখনও একেবারে লুপ্ত হয়নি। কারণ, সাহিত্য কালের সেরূপ সরাসরি প্রতিচ্ছায়া বহন করে না; তার মধ্যে বিশেষ করে ঐতিহ্য সঞ্চিত হয়, যতটুকু তার টিকবার টিঁকে থাকে অনেক রূপে। কিন্তু বর্তমানের বিপর্যয় এত বিষম যে, সেই শুভচিহ্নগুলিতেও আর তেমন শক্তির চিহ্ন নেই, তাও ম্রিয়মান; তার সঙ্গেও জড়িয়ে যাচ্ছে হয়ত নানা ফাঁকি, মিথ্যাচার, ক্ষয়িষ্ণুতা। চার-পাঁচ বৎসর পূর্বেকার তেমন দু'একটি শুভচিহ্নের উল্লেখমাত্র করলেই আমরা তা বুঝতে পারি।

প্রথমত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বাঙলা সাহিত্যে একটা রাজনৈতিক বোধ দেখা দেয়। তা শুধু কমিউনিষ্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

দ্বিতীয় শুভচিহ্ন যা তখন দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে—বাঙলা সাহিত্যের দৃষ্টি মধ্যবিত্তদের গণ্ডী ছাড়িয়ে দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও কৃষক মজুরদের জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অবশ্য এ লক্ষণ পূর্বেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল—যখন রবীন্দ্রনাথ জানালেন তিনিও অপেক্ষায় আছেন সে কবির জন্য যিনি কৃষকের শ্রমিকের জীবনের সরিক। এবার বোঝা যায়—সাহিত্য আর ড্রয়িং রুমে বা বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা নিশ্চয়।

সেদিনের সাহিত্যে তৃতীয় একটা সুলক্ষণ ছিল—তাতে তখন "আঞ্চলিক" সত্য-নিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল; আর লেখকের দৃষ্টি শুধু কলকাতায় আবদ্ধ থাকেনি। আজও তা থাকে না। তবে তার ভাবগত লক্ষ্য একটু পরিবর্তিত হয়েছে।

সাহিত্যের এই ভাব-বস্তুতে দু' একটি পরিবর্তন আজ বিশেষ লক্ষণীয়! যেমন, এক, সেদিনের লেখক যে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে নূতনভাবে সচেতন হয়েছিলেন আজ কালোবাজারী-যুগে তাঁর সে দায়িত্বপালনে তেমন অকুণ্ঠ আগ্রহ নেই। দুর্নীতির বিরোধিতা আজ যেন স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরোধিতা! দুই, সেদিনে একটা বুদ্ধি ও যুগ-জিজ্ঞাসা প্রখর হয়েছিল; বলা বাহুল্য আজ তা' আর প্রশ্রয় না দিয়ে বুদ্ধি-বিরোধিতা ও সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা-বিলাসই (শোভিনিজম্) প্রসারিত করা হচ্ছে।

সেই বাঙলা সাহিত্যের প্রস্তুত-করা পূর্ব পথ একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি, হবে না, তা তথাপি সত্য।

এই কয় বৎসরে বাঙলা সাহিত্যে আমরা প্রধানত কি নূতন লক্ষণ দেখছি? সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি—যদিও সংক্ষেপে উল্লেখ করলে তর্কের ও ভুল বুঝবার অবকাশ থাকে।

মৌতাতের ঝোঁক

বর্তমান বাঙালী পাঠক সর্বাপেক্ষা কোন ধরণের সাহিত্য বেশি পাঠ করেন? "এর চেয়ে ইংরেজই ছিল ভালো" যে সময়ের সামাজিক মনোভাব, সে সময়ে পাঠকমনের বৃহত্তর অংশ স্বভাবতই চায় মৌতাত।

এ নেশার একটা উপকরণ—'মোহন-সিরিজ' বা অমনিতর আরও কোনও সিরিজ। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্র রায় প্রভৃতিরও যথেষ্ট পাঠক ছিল; কিন্তু এমন নির্বোধ পাঠক-শ্রেণী তাঁরাও কামনা করতে পারতেন না। সর্বদেশেই এ জাতীয় উপন্যাস একটা সামাজিক-ব্যাধির খোরাক (ঔষধ নয়, বোঝা উচিত)। কিন্তু এদেশে এ খোরাক যেমন হাস্যকর তেমনই অখাদ্য,—এইমাত্র দুঃখ।

আধুনিক বাঙালীর দ্বিতীয় নেশা—'রম্য-রচনা'। 'দৃষ্টিপাত' থেকে তার সূচনা, কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর সাংবাদিক-নিপুণতায় তার বিস্তার। একটু বুঝিয়ে কথাটা বলছি। 'দৃষ্টিপাত' যুদ্ধের শেষ পর্বে প্রকাশিত হয়, ঠিক এ পর্বে নয়। তা একখানি সুখপাঠ্য বই, সুলিখিতও। অবশ্য তা 'বেল লেতর্স' নয়,—বাংলায় বহু 'বেল লেতর্স' পূর্বেও ছিল। ওটা লেখকের এক নম্বরের চাল। দুই নম্বরের চাল—লেখকের মৃত্যু ঘোষণা করে পূর্বাহ্নেই পাঠকের মনকে আর্দ্র করা। লেখকের তৃতীয় নম্বরের চাল হচ্ছে প্রত্ন-তত্ত্বের বা পানীয়-তত্ত্বের বই টুকে পাঠককে চমৎকৃত করার চেষ্টা। কিন্তু সব চেয়ে বড় চাল হচ্ছে নোকরশাহীর মুরুব্বিগোষ্ঠীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার চেষ্টা—একটু আঁচড়ালেই লেখকের 'টক-আঙুরী' মনোভাব পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। এই হল 'দৃষ্টিপাতের' মূল চরিত্র—তা 'আদিখ্যেতের' সাহিত্য, Snobberyর সাহিত্য। 'দৃষ্টিপাত' সুপাঠ্য, সুলিখিত,—কিন্তু, 'সোণারূপা নহে বাপা, এ বাংগা পিতল।'

কিন্তু পাঠক-সাধারণকে তা এত তৃপ্ত করল কেন?—প্রথমত, তা দিল্লীর নোকরশাহীকে ব্যঙ্গ করায় 'এর চেয়ে ইংরেজই

ছিল ভালো' এ ভাবনায় উত্যক্ত পাঠক পরিতৃপ্ত। দ্বিতীয়ত, লেখকের মতই বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পাঠকও ওই স্নব-চক্রকে উপহাস করলেও স্নব-চক্রেরই ঘনিষ্ঠতা-প্রার্থী ;—তা পেলে খুশী, কৃতার্থ, না পেলে ব্যঙ্গ-মুখর। একটা সুস্থ মর্যাদাবোধ অপেক্ষা স্নবারির বর্ণচোরা-লোভই হল এ গ্রন্থের আদরের একটা প্রধান কারণ। তৃতীয় কারণ,—সেই 'শেষের কবিতার' দিন থেকে বাঙালী পাঠক চটুল কথার সাহিত্যে আসক্ত হয়ে উঠ্‌ছেন—'কাল্‌ট' হন 'অমিট্রায়ে'।—'দৃষ্টিপাত' তবু সাহিত্য, সরস সাহিত্য--বড় কিছু নয়, সুস্থায়ী কিছু নয়, চটুল কথা-সর্বস্ব লেখা। কিন্তু বর্তমান-যুগে সমাজে যে আশাভঙ্গ দেখা দিল—তাতে 'দৃষ্টিপাত'ও আর বই নেই, পরিণত হয়েছে একটা 'সিরিজে'। আদিখ্যেতেপণা ও snobbery সম্বল করে তার অক্ষম অনুকরণও বেরিয়েছে বাজারে। 'রঞ্জন' ইংরেজি-মার্কিন বুক্‌নি ও নীরদ চৌধুরীর বিদ্যার স্নবারিকে বাঙলায় ঢেলে সেজে পরিতৃপ্ত। আর, সৈয়দ মুজতবা আলী বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য ও হাল্‌কা ঢঙের মারফৎ ইয়ার্কিকেই প্রায় কাল্‌ট্‌ করে তুলেছেন একালে।

এই রম্য-রচনারই এক পার্শ্বে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' নিয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর উপন্যাসের মতই তা উপাদেয়, এবং যুগ-বর্ণনা অপেক্ষা কথা-সাহিত্য হিসাবেই তা সমাদৃত হওয়া উচিত। কিন্তু আদৃত হয়েছে বিশেষ করে কথার জন্য, 'রম্য রচনা' বলে। বক্তব্যের সত্যাসত্যের প্রশ্ন আর কেউ দেখে না।

এই কথার কারুকর্ম নিয়ে তারপর অচিন্ত্যকুমার বাঙালী মনের একটি দুর্বলতর ক্ষেত্রে তাঁর আসন পাতছেন। সেটি ভক্তি বিহ্বলতার ক্ষেত্র। 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' একই কালে রম্য-রচনা, উপন্যাস ও ঠাকুরের লীলা-কাহিনী। কিন্তু সব শুদ্ধ তাতে পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমান শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অদীক্ষিত

মনোভাবের, চিন্তা ও চারিত্রিক দেউলেপনার। অবশ্য বৃন্দাবন দাসের আমল থেকেই বাংলা দেশে গ্রামে গ্রামে অবতার জন্মায়। কিন্তু রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের পরে, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মত হিন্দুত্ববাদীদের বলিষ্ঠ ধর্মজিজ্ঞাসা ছেড়ে যে এভাবে বাঙালী শিক্ষিতরা যে কোনো গুরুঠাকুর বা মাতাজীর নামে লুটিতে পড়তে পারলেন, এটা শ্রেণীগত অধঃপতনের প্রমাণ ও সমস্ত সমাজের আশাভঙ্গ ও বিমূঢ়তারও প্রমাণ।

এ কালের এই বিমূঢ়তার অন্যতম লক্ষণ আত্মকাহিনীর প্রাবল্য। এ কথা ঠিক, বিপ্লবী রাজনীতির কোনো কোনো কোনো পাতা লোক-সমাজে এখন প্রকাশ করতে বাধা নেই। সে হিসাবে বিপ্লবীদের বা রাজনীতিক কর্মীদের আত্মকাহিনী লেখার মূল্য আছে—যদি তা যথার্থ হয়। কিন্তু সাহিত্যিকদের সেরূপ বাধা পূর্বেও ছিল না। তথাপি এ সময়ে তাঁরা অনেকেই নিজ আত্মকথা রোমন্থনে ব্যস্ত হলেন কেন? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শিবনাথ শাস্ত্রীর মত সকলের জীবন বাঙলার সামাজিক-আধ্যাত্মিক বিকাশের একটা প্রতিলিপি বলেও গ্রাহ্য হতে পারে না। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন অবশ্য unique, কিন্তু নিজের সেই অপূর্ব রহস্যকে আত্মকথায় প্রকাশ কত্বা সুসাধ্য কর্ম নয়, এ কথা সাহিত্যিকরা অন্তত জানেন। এই 'আত্মচরিত সাহিত্যের' কাজে যে অনেকে অগ্রসর হলেন তার কারণ হয়ত, প্রথমত, সাহিত্যে তাঁদের আত্মপরিচয় দান সম্পন্ন হয়নি, এই বিজ্ঞাপনের যুগে তাই আত্ম-বিজ্ঞাপনে তাঁরা নামলেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকরা অনেকেই নিজের অতীত রোমন্থনে তৃপ্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গ্রহণ করতে তত উদ্যোগী নন। অথচ স্বাধীনতা লাভের পরে অতীত অপেক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হওয়া উচিত মহত্তর প্রেরণা।

এ কথাও বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে, এ সবেরই প্রতিক্রিয়ায় সুস্থ সামাজিক আদর্শকে ক্ষত-বিক্ষত করে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের

নামে একটা 'মার-মার সাহিত্য' বা 'কাট্-কাট্ সাহিত্য' যা দেখা দিয়েছিল তাও সাহিত্য নয়। তাও সামাজিক অসুস্থতারই একটা চোরাগোপ্তা আক্রমণ। সে কিন্তু সাহিত্যের বিষয়বস্তু বাড়িয়েছে, তবু চেঁচামেচিই তার প্রধান গুণ। যা সাহিত্য নয় শত চেঁচামেচি করলেও তা সাহিত্য হয় না।

এ সময়কার সাহিত্যে কি তা হলে সৃষ্টি-ধর্মের কোনও লক্ষণ নেই? স্নবারি, সফিস্টিকেশন, সেক্স্ ও 'ধর্ম্ম'—এই কি সব?

নূতন বাণী

এমন কথা বললে নিশ্চয়ই পাপ হবে। একথা বলতে হবে যে নতুন বাণী এখনো পথ আবিষ্কার করে স্থির হয়নি। তার গুণ ও পরিমাণ দু-ই এখনও স্বল্প; কিন্তু সম্ভাবনা তারই বেশী। আগেকার যুগের তারাশঙ্কর, বনফুল, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি 'পঞ্চাশোর্দ্ধ' সাহিত্যিকরা কেউ 'বানপ্রস্থ' অবলম্বন করেন নি,—করলে ক্ষতি হত, পাঠকের না হোক, লেখকের ও দর্শকের। কারণ, বাঙলা সাহিত্যিকের হলিউড যুগ এসেছে—বোম্বাইর ফিল্মের তাগিদে জন্ম হতেই সাহিত্যেও এখন বোম্বেটে গুণ জন্মাচ্ছে। তাই বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকরা লেখনী ত্যাগ করতে পারবেন না। তবে তাঁদের কাছে আর নূতন সৃষ্টির স্বাক্ষর এ সময়ে দাবী করা বৃথা। 'বনফুলের' উদ্ভাবনী শক্তি অবশ্য নিস্তেজ হয় নি, কিন্তু কারও অভিজ্ঞতার পুঁজি অফুরন্ত নয়। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ স্থাবর। তাঁদের অনুজদের মধ্যে নারায়ণ গাঙ্গুলী এখনও সজীব, সৃষ্টিশীল; তাঁর পক্ষে প্রয়োজন গভীরতর সমাহিতির (integration)—ঠিক নূতন পথে পুরোনো মহারথী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও যা আয়ত্ত করেও করতে পারছেন না। নূতনদের মধ্যেও সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক সেই সাহিত্য ও জীবনের সুসঙ্গত সংহতি খুঁজছেন; তাই

তাঁদের নিকটে নূতন কিছু প্রত্যাশা করা যায়। দুই একজন নবাগত লেখকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—'উত্তরঙ্গের' লেখক সমরেশ বসু, 'রঙরুটের' লেখক বরেন বসু, 'লখীন্দর দিগরের' লেখক গুণময় মান্না। এখনো এদের আঙ্গিক ও প্রকাশকলায় ত্রুটির অভাব নেই; তবু তাঁরা বাঙলা-সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করছেন। আর সত্যই তা সাহিত্য।

এমনি নূতন সৃষ্টির আভাস নিশ্চয়ই আরও আছে; এখনও তা হয়ত মাসিক পত্রের পাতায় রয়েছে গুপ্ত—হয়ত অসাবধানতায় আমাদের এ মুহূর্তে চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। হয়ত বা আগামী কাল তা অঙ্কুরিত হবে। (অনুমান সত্য, বিমল মিত্র, জরাসন্ধ, শঙ্কর, অবধূত প্রভৃতি লেখকেরা ১৯৫০-এ উদিত হন নি; উদিত হলেও ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। ১৯৫৬তে এখন তাঁরা সুপরিচিত)। সার্থক কবিতা ও সৃষ্টিশীল কবিও নিশ্চয় আছেন। সুধীন্দ্রনাথ মৌনব্রত নিলেও বুদ্ধদেব বসু কবি হিসাবে অকৃপণ; নরেশ গুহ তাঁর পশ্চাতে অক্লান্ত। জীবনানন্দ দাশ স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে সমরূপে কাব্যধর্ম-নিষ্ঠ। বিষ্ণু দে স্বকীয় সাধনায় অনলস—যদিও তিনি কখনও সাধারণ পাঠকের নিকট সহজ-বোধ্য হবেন না; 'অন্বিষ্ট'ও তা হয়নি। তা ছাড়া হঠাৎ যখন একটি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে দেখি প্রায়-অপরিচিত কবি বলেন,

রাত্রি এল মৃত্যুর মতো গাঢ় পা ফেলে ফেলে,—

কিংবা হাতে এসে পড়ে প্রায়-অপরিচিত রাম বসুর প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'তোমাকে'—পড়ি তাঁর 'ভাষণ'—

রবীন্দ্রনাথ! আমরা তীব্র ঘৃণায় পবিত্র হয়েছি—
আমরা তীক্ষ্ণ হিংসায় আগ্নেয়গিরি—
আমাদের ভালবাসায় উজ্জ্বল পৃথিবী,

পড়ি 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে'—, এবং পড়ি বারে বারে তাঁর মুখ্য-কবিতা 'তোমাকে'—

কামনার রাত কবে পাব ?
কথার রূপালি এ হ্রদে ছোট ছোট ঢেউ তুলে তুলে
তোমাকে ভাসিয়ে দেবো,
আবার বাহুতে নেবো,
তোমার শরীরে নামে অরণ্যের উদ্ভিদের গন্ধমোহ গান
হারিয়ে যাওয়া সুর,
আমি যেন রোমাঞ্চ আকাশ
সাড়া পাব ফসলের সজীব আঁধারে
নদীর চঞ্চল স্রোত শান্ত হবে সমুদ্রের বুকে,
শুধু সেই রাত পাব কবে ?
শুধু সেই রাত পাব বলে
বিদ্যুতের কশাতে ক্রুদ্ধ মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে—
সংকুচিত কামনার মোহনার নীল সাড়া এনে
ভিখারী ছেলের চোখের কোনে দেখা আশা মেলে
সাম্‌নে এগিয়ে যাব রহস্যের বাঁধ ভেঙে ভেঙে
হৃদয়ে শরীরে শান্তি, গোলায় গোয়ালে শান্তি
শান্তি এনে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে—
কামনার রাত পাব তবে।

আমরাও তখন জানি—শত দুর্দিনেও এই নূতন দৃষ্টির কবিদের মধ্যেও সৃষ্টির আভাস আছে,—বিষ্ণু দে, বিমল ঘোষ, সুকান্ত, সুভাষ, মঙ্গলাচরণ, মণীন্দ্র রায়েই তা শেষ হয় নি ;—আছে ব্যক্তিপ্রেমকে বৃহত্তর কর্মচেতনার মধ্যে সম্পূর্ণ ও সংহত করবার মত প্রয়াস। কবিতা মরেনি। ছোট গল্প উন্নতির দিকে।

কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে—এখনও নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিত আছে। তেমনি 'রম্য-বচনা' সত্ত্বেও প্রবন্ধ-সাহিত্যে চিন্তার প্রসার দেখা যায়। অতি-প্রশংসিত হলেও 'বাঙালী জাতির ইতিহাস' নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। রাজশেখর বসু, অতুল গুপ্ত, কাজী আবদুল ওদুদ,

নির্মল কুমার বসু, অন্নদা শঙ্কর রায় প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকেরা ছাড়াও বিনয় ঘোষ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 'প্রাবন্ধিক'রা এখন সাহিত্যে সম্মানিত হন। 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ' বা 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' যে বুদ্ধিশুভ্র সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাও ভুলবার নয়।

সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক ও সার্বজনীন ব্যপ্তি, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ—এই হল বাঙালী সংস্কৃতির এখন প্রথম প্রয়োজন। আসলে কালোবাজারী কালচার বড় কথা নয়, বড় কথা এই নাতিপরিচিত, নাতিপ্রশংসিত সৃষ্টি-প্রয়াস ; এবং রস-সাহিত্য অপেক্ষাও এই জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসারী সাহিত্য-রচনার চেষ্টা। তা'ই আগামীকালের প্রতিশ্রুতি।

হয়ত শুধু কান্তা-সম্মত সাহিত্যের অপেক্ষাও এই রাষ্ট্র-গঠন, সমাজ-গঠন ও জীবন-গঠনের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল প্রবন্ধ-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। সাহিত্যের বহুমুখী সাধনা ছেড়ে বাঙলা সাহিত্য এতকাল বড় বেশী কৃত্রিমভাবে কান্তা-সম্মত সাহিত্যের চর্চা করেছে। এবার আসুক বুদ্ধি-প্রদীপ্ত সাহিত্যের পর্ব।



বাঙলা লোক-সাহিত্যের সম্ভাব্যতা

মধ্যযুগের শিক্ষিতদের সাহিত্য ও এ যুগের ইংরাজী শিক্ষিতদের সাহিত্যই একমাত্র বাঙলা সাহিত্য নয়। বাঙলার লোক-সাধারণের নিজেদের যে সাহিত্য আছে তাও অপুর্ব সম্পদ। এমন কি, তাতেই বাঙালী মনের সহজতর রূপ অবিকৃত রয়েছে, এমনও বলা যায়। অনেকে তাই মনে করেন বাঙলার জাতীয় সংস্কৃতির অর্থ এই লোক-সংস্কৃতি, আর জাতীয় সাহিত্যের অর্থ এই লোক-সাহিত্য। আগামী দিনে কি তা'ই হবে আমাদের সৃষ্টি-চেতনার আশ্রয়?

প্রাচীন বাঙলায় সাহিত্য বলতেই কাব্য, গদ্যের সন্ধান বড় নেই। কিন্তু লোক-কাব্য ছাড়াও লোক-সাহিত্য আছে। সেরূপ লোক-সাহিত্য ব্রতকথা রূপকথা উপকথা উপাখ্যান ইত্যাদি। তার কাল ও ভাষা অনির্দিষ্ট। কারণ, তা মুখে-মুখে চলত। কথাকারের গুণে হয়ত তা কখনো কখনো সাহিত্য হয়ে উঠতে পারত, না হলে হয়ে থাকত শুধু আনুষ্ঠানিক বা প্রচলিত কথা মাত্র। লোক-কাব্যও সব দেশেই মুখে মুখে চলে, এদেশেও তা লেখা হয় নি। কিন্তু ছন্দে বাঁধা কবিতার রূপ কতকটা স্থির থাকে। মুখে চলা গদ্যের রূপে সে স্থিরতা আসে না।

একটা কথা, ইংরেজী উনবিংশ শতকের পূর্বে লিখিত বাঙলা কবিতাও পড়ার জিনিস ছিল না, ছিল শোনার জিনিস। (বেতারের প্রসাদে সেই দিন নতুন ভাবে আসবে কি?)। প্রাচীন ও মধ্য যুগের পুঁথিও সুর করে করে পড়া হত (chanted), আর অনেক সময়ে পদ হলে তা একেবারে তালে-মানে গাইবারও নির্দেশ থাকত। সুর করে কবিতা পড়ার দিন আমাদের দেশে শেষ করে দেন মাইকেল অমিত্রাক্ষর লিখে। লোক-কাব্যের বেলায়

তা ঘটেনি। কাজেই লোক-কাব্যের প্রধান এক অংশ লোক-গীতি। অনেক পদকে কবিতা না বলে গীতও বলা যায়।

কিন্তু কবিতা যখন সুর করে পড়া হত তখনো কবিতার প্রায়ই একজন হতেন প্রণেতা। তিনি লিখতেন, নিজে বা অন্য কেউ হতেন কথক বা গায়ক, আর বহু লোক হতেন শ্রোতা। লিখিত সাহিত্য লোক-বিশেষের লেখা। কিন্তু লোক-কাব্য কি সেরূপ লোক-বিশেষের রচনা ? না। একা-একা যে কেউ সুর করে কবিতা না পড়তেন তা নয়, একা-একা হয়ত গানও গাইতেন এবং বিশিষ্ট একজনে গীতও রচনা করতেন। কিন্তু যে-ই রচনা করুক, দশজনকে নিয়েই কাব্য-সঙ্গীত উপভোগ করা ছিল পূর্বকালের নিয়ম।

কবিতা ও ব্যক্তিসত্তা

দশ জনকে ছেড়ে কবিতা পড়া ও কবিতা লেখার দিন আসে সভ্যতা যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে পৌঁছায়, তখন। আধুনিক যুগ তাই কাব্যে গানে প্রধানত হয়ে উঠেছে খণ্ড কবিতার যুগ, ব্যক্তি-বাসনা-প্রকাশের যুগ। এপর্বে এসে কাব্য সাহিত্য ক্রমশই ব্যক্তি-সত্তার কথা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে কি দশজনের সঙ্গে কাব্য তখনো তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে পারে ? তা নয়। আসলে আধুনিক যুগের কবিসত্তাও সেই আধুনিক কালের দশ জনের অভিজ্ঞতা-চেতনারই প্রতিনিধি-স্থানীয়। এ কালের কবি বা সাহিত্যিকও সেই সমাজ-মনেরই অন্তর্দ্রষ্টা আর অন্তর্বাণীর বাহক। এ সত্য না মান্‌লে আধুনিক ব্যক্তি-চেতনা ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। মোট কথাটা তাই এই—সাহিত্য বা কাব্য সমাজেরই সৃষ্টিশক্তির একটা বিশেষ উদ্বোধন। ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের যুগে না পৌঁছা পর্যন্ত কাব্যের সঙ্গে সমাজের এই নাড়ীর যোগটা যথেষ্ট প্রত্যক্ষ থাকে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যুগে পৌঁছলে সে যোগটা প্রচ্ছন্ন হয়। তা বলে সে যোগ ছিন্ন করা

চলে না ; তা ছিন্ন হলে সাহিত্যেরই মরণ হয়। বরং ব্যক্তিসত্তা সমাজ-সত্তার সঙ্গে আপনার যোগ-বিয়োগের এই অচ্ছেদ্য বন্ধন যত উপলব্ধি করে ততই আপনার সত্তার বৈশিষ্ট্য ও সমগ্রতার সন্ধান লাভ করে। এই সচেতনতা ও সমাহিতিতেই সত্তার মহত্তর বিকাশ হয়, আর তাতেই সাহিত্যও আবার নূতন করে সামাজিক জন্মাধিকার লাভ করে, সমাজের দশ-জনের সৃষ্টি-সম্পদ হয়ে ওঠে। সভ্যতার এই নূতন স্তরটা আসবে পরে socialist দেশে, যেখানে সাহিত্যিক তাঁর Socialist Personality-তে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারবে। তার নাম 'সোবিয়েত' দিই, 'জনায়ত্ত গণতন্ত্র' দিই, কিম্বা 'সোশ্যালিষ্টিক পাটার্ণ' দিই তাতে যায় আসে না। সে আর্থিক গণতন্ত্রে তা হলে সাহিত্য আর ব্যক্তির একান্ত ভাষণ থাকবে না ; সাহিত্য আবার নূতন করে হবে দশ জনার জিনিস—জনসাধারণের জিনিস, অথচ সচেতন ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি।

ভাবী সাহিত্য ও ভাবী সমাজ

প্রশ্ন হবে,—জনসাধারণের জিনিস হলেই কি তা 'লোক-সাহিত্য' হবে? যে সাহিত্য জনগণের জন্য লেখা আর যা জনগণের জীবন-কথা, তা'ই কি লোক-সাহিত্য?—নিশ্চয়ই ভাবী সাহিত্য হবে **জনগণের কথা, কিন্তু** personalityর **প্রকাশ**। যাঁরা কারখানা থেকে, ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসবে কারখানার গান, ক্ষেতের গান মুখে নিয়ে, তাঁরাই আজকের নবজাত সাহিত্যকে তার আকাঙ্ক্ষিত এই পরিণতি দান করবেন। কিন্তু সেখানেই কি শেষ হবে তার বিকাশ? তাও নয়। কারণ, ততক্ষণে কারখানার আর ক্ষেতের মানুষ প্রত্যেকে শিল্পচেতনায় অনেক গুণ এগিয়ে যাবে। তখন দেখ্‌ব—তারা যেমন কল চালায় তেমনি চালায় কলম; আবার যেমন চালায় কলম তেমনি চালায় কল—এ পরিণতিও সম্ভব হতে পারে। এক কথায়, সভ্যতার সেই নতুন স্তরে শ্রম-বিভাগের

সেই বিভেদ অনেকটা আবার মুছে যাবে। 'কবি', 'মিস্ত্রী', 'সৈনিক', 'কৃষক' বলতে আর এমন স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বৃত্তির গ্রন্থিতে বাঁধা বিভিন্ন ধরণের মানুষ বোঝাবে না। অনেক ডাক্তার যদি আজ কবিতা লেখেন অনেক মিস্ত্রীও ভবিষ্যতে লিখ্‌বেন কবিতা; আর অনেক 'কবিও' হবেন তখন 'মিস্ত্রী।' অবশ্য এ হল ভবিষ্যতের কথা,—হয়ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন; সে যুগটা এখনো অনেক দূরে। কিন্তু কথা হল—সে যুগে সাহিত্য আবার পুরোপুরি 'লোক-সাহিত্য' হবে কিনা। তাই বোঝা দরকার আমরা লোক-সাহিত্য বলতে বুঝি কি? 'শিষ্ট সাহিত্যে'র সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়?

লোক-সাহিত্য ও শাসক-সাহিত্য

'লোক সাহিত্য' বলতে আমরা বুঝি folk literature, অর্থাৎ **যা লোকসাধারণের জন্য রচিত, আর মূলত যার জন্ম-উৎস লৌকিক জীবন—কার্যত যা অলিখিত এবং প্রায়ই যা নিরক্ষর মানুষের সৃষ্টি।** *

শাসক সাহিত্যের কথা বুঝ্‌তে হলে কয়েকটা মৌলিক কথাও বোঝা প্রয়োজন।—সেই আদিম সমাজ ভেঙে শ্রম-বিভাগ প্রচলিত হবার পর থেকে সমাজ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পথেই এগিয়ে চলেছে! তখন থেকে সমাজ শাসিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় শাসকদের দ্বারা, লোকসাধারণ এই সেদিন পর্যন্তও প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবজ্ঞাত ছিল। আর সে সাহিত্যই এ বিরাটকাল জুড়ে 'সাহিত্য' আখ্যা পেয়েছে যে-সাহিত্য শাসক-শ্রেণীর মনোরঞ্জন করেছে। তা হলে এই শাসকশ্রেণীর সাহিত্যকে অন্তত 'লোক-সাহিত্য' বলা চলে না। তাকে 'শিষ্ট সাহিত্য' বলতে পারি।

এ কথাও কিন্তু সত্য, শাসকশ্রেণী মোটের ওপর সমাজ-বিকাশের পুরোধা রূপেই শাসকশ্রেণী হয়ে ওঠে; এবং সমাজ-

* এ আলোচনার পরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে।

বিকাশের পরিপন্থী হয়ে গেলে কোনো শাসকশ্রেণী বেশি দিন টিঁক্‌তে পারে না। সামন্ত শাসকেরা তাই হেরে গেলেন ধনিক শাসকদের কাছে। ধনিকদের দিন ফুরিয়ে শ্রমিক-কৃষকরাজের দিন এখন আস্‌ছে। কিন্তু উচ্চদের এই অবক্ষয়ের ও যুগ-সন্ধির সময়কার শাসক-সাহিত্যকে বাদ দিলে দেখব—সমাজের সুস্থ অবস্থায় সাহিত্য শাসক-আয়ত্ত হলেও সৃষ্টির সাহিত্য, যেমন আধুনিক অবক্ষয়ের সাহিত্য হচ্ছে অপসৃষ্টির সাহিত্য। সাধারণভাবে যখনকার যা সৃষ্টি-প্রেরণা, সাধারণত তা সে যুগের শিল্পসৃষ্টিতে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়; সর্বযুগেই সৃষ্টির মূলশক্তি হল সমাজের জনশক্তি—যদিও প্রকাশ্যে সৃষ্টির উদ্বোধক ও পরিচালক বিভিন্ন যুগের শাসক-শ্রেণী। অতএব, সাধারণভাবে উৎকৃষ্ট শাসকসাহিত্যেও এই সমাজ-সত্যের ছাপ থাকবে;—হয়ত তা থাকবে পরোক্ষ, নানাভাবে লোকজীবনের সঙ্গে 'শিষ্ট সাহিত্যের' এই সম্পর্ক স্বীকৃত থাকে। সেকালের অনেক সাহিত্যই লেখা হত লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে; তা বলে লোক-স্বার্থে নয়, বরং শাসক স্বার্থে। তাই সেই লোক-শিক্ষাও ছিল শাসকানুমোদিত লোক-শিক্ষা। তথাপি, যুগের উৎকৃষ্ট বাণী বলে লোক-সমাজ তার সে সাহিত্যের বাণী গ্রহণও করত—যেমন, তারা করেছে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির কথা। অতএব এই রামায়ণ মহাভারতের মত Epic বা মহাকাব্যগুলো, জাতক ও হিতোপদেশের আখ্যানসমূহ শুধু শাসকসাহিত্য নয়, অনেকাংশে সমাজ-সাহিত্যও। অন্তত সেই-সেই যুগের তা সভ্যতার পাথেয়—'যুগসাহিত্য'।

আরও একটা কথা আছে। আসলে এই রামায়ণ, মহাভারতের শত শত গল্প আখ্যায়িকা গ্রন্থকাররা গ্রথিত করবার পূর্ব পর্যন্ত লোক-সমাজের জিনিস ছিল। লোকসাধারণ তা রচনা না করুক, তার সৃষ্টিতে একটা বৃহৎ অংশ গ্রহণ করেছে। অবশ্য তখনো সে সব লোক-কাহিনী অলিখিত ছিল। লোকের মুখে মুখে সহজেই

তা ভেঙে ভেঙে বরাবর গড়ে উঠেছে। যখন লিখিত বা গ্রথিত হল তখন সেই লোক-রচনা মার্জিতও হয়েছে। এবং একবার লেখা হয়ে গেলে তার ভাঙা-গড়ারও আর অবাধ উপায় থাকে নি। এ কথা ঠিক, এই সব কাব্যের বিষয় বাহ্যত লোক-জীবন নয়,—রাজা-রাজড়া, রথী-মহারথীর কথা, শাসক-সমাজের তা উৎকৃষ্ট সাহিত্য। কিন্তু এরূপ লোক-কথার উপরই অনেক প্রাচীন 'শিষ্ট' সাহিত্য গড়া। শ্রেষ্ঠ শাসক-সাহিত্যের অতলেও লোক-মানসের একটা পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে; আর আছে সমগ্রভাবে সমাজের সমসাময়িক সৃষ্টিশক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শাসক-সাহিত্য এই কারণেই 'সাহিত্য' নামের অধিকারী। সাধারণত লোক-সাহিত্যের তুলনায় শাসক-সাহিত্যের উৎকর্ষ তাই স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, শাসক-সাহিত্য শুধু শিল্পগত রূপ-কলায় উন্নত নয়, তা সমাজের উন্নত রুচির ও উন্নত চিন্তার সাক্ষী; এবং উৎকৃষ্ট শাসক-সাহিত্য তার শ্রেণীগত ত্রুটিসত্বেও সমসাময়িক সামাজিক সৃষ্টিশক্তির প্রধান প্রকাশ। তাই তাকে বলি 'শিষ্ট সাহিত্য'।

এ সব সমুদায় কথা সাধারণত লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে বলা চলবে না। তবে উৎকৃষ্ট লোক-সাহিত্য তার শত ত্রুটিসত্বেও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য, তাও সত্য কথা। কিন্তু অনেক সময়েই জানি শতকরা ৯৫টি লোক-কবিতা বা লোক-গীতি সাহিত্য হিসাবে আসলে শুধু 'গ্রাম্যই' নয়, অচল। অবশ্য শতকরা ৯৫টি বর্তমান মাসিক পত্রের লেখাই কি (শাসক-সাহিত্য) খুব 'সচল'? প্রকৃতির নিয়মই এই—অনেক সে ছেঁটে ফেলে, গুটি কয়েক পায় তার ছাড়পত্র। তা সত্বেও সাধরণভাবে লোক-সাহিত্য সমাজের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্তরে প্রায়ই কম পৌঁছে। এবং অন্য দিকে দেখেছি, যা উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাকে সংকীর্ণ অর্থে শ্রেণীগত সাহিত্য বলাও যথার্থ নয়। তা আমাদের এ কালের সমাজ-আদর্শের তুলনায় হয়ত প্রতিক্রিয়াশীল; কিন্তু সমসাময়িক সমাজ

ব্যবস্থার তুলনায় হয়ত তা'ই ছিল অগ্রগামী; অন্তত তার ফলে সমাজ তখন এগিয়ে গিয়েছে। যে শাসক-সাহিত্য তা নয়, তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যও নয়, সৃষ্টিও নয়; শুধুই সাহিত্যের সাময়িক নিদর্শন এবং অনেকাংশে অপসৃষ্টি।

কিন্তু 'শিষ্ট সাহিত্যে' আর 'লোক-সাহিত্যে' পার্থক্যটা কি দুস্তর? এ প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয় নি, কিন্তু দেওয়া দরকার। সে উত্তর এই ঃ—পার্থক্যটা মৌলিক। কারণ সমাজে শাসক ও শাসিতের পার্থক্য মৌলিক—যদিও শাসক তার অভ্যুত্থানের যুগে আসলে শাসিতেরই শক্তির ধারক ও পরিচালক। তার অভ্যুত্থানের যুগের সাহিত্যও তাই বহুলাংশে লোক-জীবনের প্রতিলিপি, তার পরিপোষক; কিন্তু তা বলে তাও লোক-সাহিত্য নয়। কারণ, লোক-সাহিত্যের মত তা স্বাভাবিক বা 'অচেতন' সৃষ্টি নয়, তা ব্যক্তির সচেতন রচনা। অবশ্য সচেতন অর্থ কৃত্রিম নয়।

আরও একটা কথা আছে ঃ—সমাজ সম্পর্ক অত কাটা-ছাঁটা নয়; তা প্রায়ই জটিল। যেমন, ব্রিটেনও সামন্ত শাসক-গোষ্ঠীর ব্যাপার ও অনেক কিছুকে ধনিকতন্ত্রের আড়ালে জীয়েই রেখেছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সমাজে নানা আপোষ-রফার মধ্য দিয়েই এতকাল পর্যন্ত জটিলতর ও দুর্নিরীক্ষ্য পথে চলেছে। সেই আপোষ-রফারই ফলে মনসা, বনচণ্ডী প্রভৃতি অন্ত্যজ দেবতা উচ্চবর্ণের পূজিতা দেবী হয়েছেন, আর বেহুলা-লখিন্দর, কিংবা ব্যাধবীর কালকেতু (যাকে একালের ভাষায় বলা যায় সেকালের People's hero), কিম্বা লাউসেন (Peoples ideal prince), আর শ্রীবৎস-চিন্তা প্রভৃতি লোক-কথার মানুষেরা ক্রমশ মঙ্গল-কাব্যের নায়ক হয়েছেন। অন্য দিকে বাঙালী রামায়ণে, বাঙলা কৃষ্ণযাত্রায়, কৃষ্ণ-কথার (Krishna cult-এর) রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে বাঙলার লোক-জীবনের কথা ও ধারণা। এসব কাব্যে, বিশেষ করে মঙ্গল-

কাব্যে, বাঙলা লোক-সাহিত্যের লক্ষণ দেখা যেতে পারে—তা সমাজের আপামরসাধারণ শুনত, গাইত, কবিও যেন সব সময়ে 'সচেতন স্রষ্টা' নন। সে কাহিনী মূলত (যদিও কিছুটা সংশোধিত) লোক-কাহিনী। লেখকেরাও কেহ কেহ খুব গুণী মানী নয়। এমন কি, নানা অজ্ঞাত লোকের রচনা অজানাভাবে এসে তার মধ্যে মিশে গিয়েছে—যেমনটি ঘটে লোক-সাহিত্যে। লোক-সাধারণ এ সব কাব্যকে নিজের বলে জানত বলেই তাকে পরিবর্তন করতেও দ্বিধা করে নি। বিশেষ একজনের লেখা হলেও তা দশজনেরই কথা—যদিও সচেতন লেখা।

'লৌকিক' প্রকৃতি

কিন্তু মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে লোক-কাব্যের এসব লক্ষণ থাক্‌লেও মঙ্গলকাব্যকে ঠিক লোক-কাব্য বলা চলবে না। কারণ, কথাটা বোঝা দরকার। লোক-কাব্যের প্রধান একটা লক্ষণ এই যে, তা লৌকিক জীবন ও কামনা-কল্পনা নিয়ে রচিত হয়, তা অধ্যাত্ম-সাধনার বা ধর্ম প্রচারের কাব্য নয়। অবশ্য পুরনো দিনে লৌকিক কথাতে দেব-দেবী, রাক্ষস, পরী প্রভৃতি থাকত। কিন্তু লোক-কল্পনা তাদের উপর লৌকিক স্বভাবই আরোপ করত—দেবদেবীর অলৌকিক রূপের মধ্য থেকে ফুটে বেরুত লৌকিক চরিত্র। এই **লৌকিক বা ঐহিক গুণ লোক-কাব্যের একটা প্রধান লক্ষণ;** secularity কমিয়ে তাতে যত religon-এর রঙ্ চড়ানো হয় ততই লোক-কাব্য আর লোক-কাব্য থাকে না। আমাদের মঙ্গল-কাব্যে ধর্মের দোহাই বড় বেশি।

মঙ্গল-কাব্যে খানিকটা লোক-কাব্যের লৌকিক গুণ তথাপি টিঁকে আছে। তার বিশেষ কারণ বোঝা যায়। তা এই :—ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য প্রধানত ছিল পল্লী-সভ্যতার সাহিত্য, পল্লীতে তার জন্ম। প্রাচীন ভারতে

বারাণসী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি পৌর সভ্যতার কেন্দ্রও ছিল, কিন্তু আমাদের সমাজের গঠনটা ছিল প্রধানত পল্লী সমাজের (village community) গঠন। সেই আত্মনির্ভর পল্লী-সমাজের জীবন-যাত্রায় আমাদের শাসকশ্রেণী ও শাসিত শ্রেণী অনেকটা বাধ্য হয়েই পরস্পরের কাছাকাছি থাক্‌ত। পশ্চিম অঞ্চলের মত অন্তত বাঙলায় কোনো দরবারী বা আমীর ওম্‌রাহের সভ্যতা, এমন কি, বড় 'শহুরে সভ্যতাও' গড়ে উঠতে পারে নি। পাল ও সেনদের রাজসভায় ও অষ্টাদশ শতকে নবাবী আমলে তার কিছু কিছু ছায়াপাত হয়েছিল মাত্র। বাঙলা কাব্যের পক্ষে সে শতাব্দী একটা সন্ধিক্ষণ। তার পূর্বে গৌড়ের রাজসভায় যে বাঙলা সাহিত্য রচিত হয়েছে—সে বাঙলা সাহিত্য অতি সামান্য। তা বাদ দিলে অধিকাংশ বাঙলা সাহিত্যই পল্লী সমাজে রচিত, তার পরিমার্জনা দরবারী নয়, সংস্কৃত ঐতিহ্যের। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সেই পল্লীসমাজেরই অঙ্গ। তাদের সঙ্গে লোক-সমাজের পরিচয়টা শুধু স্বার্থের সংঘাতের নয়, 'আপস-রফার'। এই বোধের যে, তারা একই পরিবারের মানুষ, কেউ ছোট কেউ বড়। এই যে শ্রেণী-বৈষম্য ও **বিপ্লবহীন স্বার্থ-মীমাংসা** এটা যেমন আমাদের সমাজের একটা বড় লক্ষণ, তেমনি এই **গ্রাম্য লক্ষণাক্রান্ত শিষ্ট-সাহিত্যও** তার একটা বড় লক্ষণ। তাই এ সাহিত্যে সত্যকারের শ্রেণী সংঘর্ষ অনেক খুঁজে খুঁজে পেতে হয়, আবার এ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যেও লোক-কাব্যের কোনো কোনো গুণ না খুঁজেই সহজে পাওয়া যায়। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে কবিকঙ্কণই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তার চণ্ডী-কাব্য মোটেই লোক-কাব্য নয়। তা কাব্য-সচেতন কবির সচেতন লেখা; লোক-কাব্যের মত 'অচেতন' (ও অনেক ক্ষেত্রেই অনামা) কবির স্বাভাবিক ও অলিখিত রচনা নয়। এরূপ কারণেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের কবি, যাত্রা, কীর্তনমাত্রকে আর যথার্থ লোক-কাব্য বলা

চল্‌বে না—কারণ, অষ্টাদশ শতক থেকে তা,বাঙলা সমাজের ভদ্র শ্রেণীরই চাহিদায় প্রধানত সচেতন ভাবে রচিত হতে লাগল।

লোক-সাহিত্যের জন্মনক্ষত্র

লোক-সাহিত্য বল্‌তে আমরা তা হলে প্রধানত বুঝি সেই সাহিত্য যা লোক-সমাজের কথা—তার লৌকিক জীবনের, ঐহিক্ সুখ দুঃখের, কামনা-বাসনার, কথা; এবং লোক-সমাজের জন্যই রচিত; আর একজনারই রচিত হোক্ বা দশজনারই রচিত হোক, যা লোক-সমাজের মুখে মুখেই ভেঙে-গড়ে প্রচলিত—মূলত যা লিখিত হয় নি। এ হচ্ছে তেমন রচনা যাতে রচয়িতা সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন নয়, নিজের ব্যক্তি-কীর্তির কথা ভেবেও রচনা করে নি। অতএব, বুঝতে পারি এরূপ সাহিত্য প্রধানত রচিত হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগের পূর্বে, অর্থাৎ মধ্যযুগে ও প্রাচীন যুগে। এবং রচিত হয় **সমষ্টি-বদ্ধ সমাজে**; বিশেষ করে পল্লী-সমাজের পরিবেশে যেখানে ব্যষ্টিজীবন তত বিশিষ্ট হয় নি। এরূপ পরিবেশে, বিশেষ করে মধ্যযুগে, অবশ্য নিছক ঐহিকতা কম পাওয়া যায়। কথায় গীতে লৌকিক ও অলৌকিক, ঐহিক ও পারত্রিক মিশ্রিত হয়ে থাকে। অলৌকিকতার আড়ালেও প্রচ্ছন্ন থাকে সহজ সুস্থ লোক-জীবনের কামনা-বাসনার ছাপ। অতএব্ যেখানে তা আধ্যাত্মিকতায় বা পারত্রিক ভাবনায় আছন্ন নয়,—সমাজের সামগ্রিক বোধের সৃষ্টি, তেমন লোক-সমাজের কথাকে, বাউলদের সে রূপ গান-গীতিকেও আমরা গৌণভাবে লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে ধরতে পারি। তার রূপটি সেখানে শাস্ত্রগত নয়, লৌকিক না হয়েও লোক-চিত্তের তা আপনার।

বাঙলা লোক-সাহিত্যের নিদর্শন প্রবাদ-প্রবচনের মত বাক্য-মাত্রও হতে পারে, উপকথা রূপকথা পুরাণকাহিনীর মত আখ্যান-ধর্মী গদ্য কথাও হতে পারে, 'গীতিকা' বা ব্যালাড-এর

মত পদ্য-কাহিনীও হতে পারে, আবার গীতিকা ছাড়াও ছড়া, ধাঁধাঁর মত পদ্যও হতে পারে। তা ছাড়া, 'গীতি' বা গান যে লোক-সাহিত্যের একটা প্রধান অংশ তা তো জানা কথা। বাঙলা-লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ এখন পর্যন্ত সামান্যই হয়েছে। তার অজস্রতা ও অকৃত্রিমতা সর্বগ্রাহ্য, তার কাব্য-গুণ অবিসংবাদিত।

লোক-সাহিত্যের মূল্য

লোক-সাহিত্যের এসব নিদর্শনেরও মূল্য প্রধানত দু' কারণে। প্রথমত, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বা Cultural Anthropology'র দিক থেকে তা মূল্যবান্। দ্বিতীয়ত, জাতীয় রস-চেতনার বিশিষ্ট রূপ ও ভঙ্গীর, স্বাভাবিক প্রকাশ-পদ্ধতির পরিচায়ক বলে তার দাবি। আমরা অবশ্য এই শেষ দাবির কথা মনে রেখেই লোক-সাহিত্যের আলোচনা করছি। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোক-সাহিত্যের বিচারও কম ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে না। যেমন, ধরা যাক্ এই ছড়াটি—

আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ঢাল মিরগেল ঘাগব বাজে॥ ইত্যাদি

আমরা সবাই জানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম এটিকে ডোম জাতীয় যোদ্ধাদের রণসজ্জার বর্ণনা বলে ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের একটি অনালোকিত পর্ব ও বিস্মৃত কাহিনী উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এরূপই ঘুম-পাড়ানি ছড়া-গানের 'বর্গী এল দেশে'ও দু'শ বৎসর আগেকার একটা বিভীষিকার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু ছড়াতে সাধারণত অর্থ-সঙ্গতি থাকে না, সুর ও চিত্রই প্রধান ; এবং তার মূল্য বিশেষ করে ছড়ার ছন্দের জন্যও। নৃবিজ্ঞানের চোখে তাই ব্রতের ছড়ার, সাপের ছড়ার মূল্য আরও বেশি। আবার, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' এই ছড়ার দ্বিতীয় চরণে 'শিবঠাকুরের' উল্লেখে 'শিবু' বা

শিবা বা শেয়ালের বিয়ের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়ে নৃবৈজ্ঞানিক পুলকিত হন। কারণ, বাঙলার লোক-মানসে শেয়াল শুধু পণ্ডিত নয়, 'শেয়ালের বিয়েও' একটা বহুসিদ্ধ বিষয়; এবং তার মূল হয়ত সাঁওতাল কল্পনায়। 'তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই'—এ ছড়ার মধ্যেও নৃবৈজ্ঞানিক প্রাচীন বাঙালী জীবনে মাতৃ-প্রাধান্য দেখবেন। 'মামাবাড়ি' এ জন্যই সমস্ত বাঙালী চিত্তে এখনো পরম স্বচ্ছন্দ স্থান,—এবং ঠিক এই কারণে 'মামী আসে ঠেঙ্গা নিয়ে।' অবশ্য, নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত গীতি, যেমন, গাজন, ভাঁজো, ভাদু, টুসু গান, কিম্বা বিশেষ এক-একটি জাতি বা মণ্ডলীর বিশেষ গান, যেমন, পটুয়া গান, মুণ্ডাজাতীয়দের ঝুমুর, করম্ প্রভৃতি গান ও উৎসব, এবং বাঙালার মেয়েদের ব্রতকথার, ছড়া, কথা, গান; ও প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, ধাঁধার ও 'প্রস্তাবের' মূল খুঁজতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা দেখছেন—পশ্চিম বাঙলার এসব জিনিস মূলত সাঁওতাল ওরাওঁদের সম্পত্তি, আর পূর্ব বাংলার এসব জিনিসে আছে বড়ো, কোচ, হাজং গারো প্রভৃতি মঙ্গোল বংশীয়দের দান। অর্থাৎ বাঙালীর লোক-জীবন ও লোক-মানস সংস্কৃত-ঐতিহ্যে বা 'আর্য-সদাচারে' ধোয়া নয়। তা মূলত অন্‌-আর্যদের কল্পনায় ও কথায় পরিপুষ্ট। বাঙালী সংস্কৃতির নৃবিজ্ঞান-স্বীকৃত এই মূলরূপ বিস্মৃত হ'লে বাঙালা সাহিত্যেরও চলে না!

কিন্তু সাহিত্য-মূল্যের দিক থেকে লোক-কাব্যের আরও একটু বিচার করতে হয়। যা এককালে স্বাভাবিক ভাবে চলেছে তা অবস্থার পরিবর্তনে—বিশেষ করে মধ্যযুগের শেষে ব্যক্তি-চেতনার উদ্বোধনে—আর কি করে স্বাভাবিক থাকবে? অনেক ছড়া, কথা, গীতের উদ্ভাবনা হয়েছে এমন সব অবস্থায় যা চিরদিন থাকবে না। অবশ্য কতকগুলো এমন জিনিস আছে যা চিরদিন থাক্‌বে। যেমন, 'ছেলে ভুলানো ছড়া'—রবীন্দ্রনাথ যার কথা অত বলেছেন। 'আয় চাঁদ আয়', কিম্বা 'ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি', 'পুঁটু আমার কেঁদেছে

কত মুক্তো পড়েছে,' ইত্যাদি। কিম্বা প্রেম গীতি। যেমন, ভাটিয়ালী গান, কিম্বা 'ভাওয়াইয়ার' (উত্তর বঙ্গের) বিরহ-গীতি,—

'পর্থম যৌবন কালে না হৈল মোর বিয়া,
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হয়া,
হে বিধি নিদয়া॥' ইত্যাদি।

অথবা, 'মৈমনসিংহ গীতিকার' সেই প্রশ্নোত্তরে রচিত গীতি—

'কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি॥'

কিম্বা রাধাকৃষ্ণের নাম বা ইঙ্গিতে জড়ানো অজস্র মানবীয় প্রেম-সঙ্গীত। কিম্বা প্রকৃতিবিষয়ক গীতি। এমন কি ধর্মবিষয়ক গীতিও জারি গান, বাউল গান প্রভৃতিও জীবন্ত জিনিস। কর্মপ্রধান গীতিরও একভাবে না একভাবে টিকতে পারে। সাধারণত অধিকাংশ লোক-সাহিত্যই ব্রত, পার্বণ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। অনেকখানে সে সব ব্রত আজ লুপ্ত হতে বসেছে। অনেকখানে সে সব ব্রতের অত্যন্ত বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ অর্থহীন। যেমন,

'অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আল্‌তা পরি।'

অন্ততঃ যতই পতিপুত্র ধনজন কামনা করুন, অনেক মেয়ের নিকট হিন্দু অ্যাক্‌টের পরে এসব অর্থহীন হবে। যাদের কাছে তুষ-তুষলি, ভাদু বা ওরূপ মাঘমণ্ডল প্রভৃতি ব্রতের মূল্য নেই, তারা এসব আর ধরে রাখবেন কেন? তেমনি অনেক জিনিস আছে যা একান্ত 'আঞ্চলিক',—তখন গ্রাম্য-জীবন অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং অঞ্চল নিয়েই সমাজ গঠিত হত। কিন্তু সেই 'আঞ্চলিক' চরিত্র আর নেই। আঞ্চলিক গীতিরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে—যেমন মালদহের গম্ভীরা, মানভূমের তুষু 'আধুনিক' হচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তনে সে রসাবেদন টিক্‌তে চায় না। 'মৈমনসিংহ গীতিকার' কথা তুলে লাভ নেই, তেমন সাহিত্য

যে কোনো কালের সাহিত্যের গৌরব। এরূপই রূপকথা উপকথার রাজ্যও ব্রতের রাজ্যের মত। কিন্তু সেখানে কল্পনাকে আমরা মেনে নিই, তা রোমান্সের দেশ। রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাক্ষস, দৈত্য কিম্বা ব্রাহ্মণ বা চাষা, চতুর চোর থেকে পশুপক্ষী, বিশেষ করে শেয়াল, বাঘ, টুনটুনি—এ সবের মধ্য দিয়ে লোকমন তার কামনা পূরণ করছে, বীরকে জয়ী করছে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, মন্দভাগ্যকে পুরস্কৃত করেছে, সুবুদ্ধিকে কৃতিত্ব দিয়েছে, ক্ষুদ্র টুনটুনিকে দর্পিত রাজার উপর জয়ী করেছে, ঘুটেকুড়োনির ছেলেকে করেছে ভাগ্যবান। এ হল অসম্ভবের রাজ্য, অবাস্তবের রাজ্য; কিন্তু তাতে কৃত্রিম কিছু নেই, সব সবল স্বাভাবিক—আমাদের 'শিষ্ট-সাহিত্যের' মত সচেতন প্রয়াস তা নয়। আর রস সেই স্বাভাবিকতার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে জমে আছে যে, বোঝাই যায় না—লোক-সাহিত্যের আসল মাধুর্য কোথায়? সে কি রসের জন্য, না, অকৃত্রিমতার জন্য?

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের অসঙ্গতি

বাঙলা দেশের ইংরেজ আমলের 'শিষ্টসাহিত্যের' দিকে তাকালে দেখব লোক-সাহিত্যের তুলনায় তা বড় কৃত্রিম। তার মূল দেশের মাটির মধ্যে ভালো করে প্রোথিত হয় নি; এবং মাটির মানুষের কথাও সে সাহিত্যে স্পষ্ট হয় নি। অবশ্য তার একটা কারণ, সে সাহিত্য সেই বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের সৃষ্টি যাদের বলা যায় 'কলোনির কেরানি'; জমিদারী প্রথার মধ্যস্বত্ব-ভোগী, কিম্বা সরকারী চাকুরে, বা কেরানিরই সগোত্র উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার প্রভৃতি বৃত্তিজীবী।

'অধুনিক বাঙলা সাহিত্যের' প্রস্তুতি ইং ১৮০০এর থেকে আরম্ভ হয়, ইং ১৮৫৯-৬০এ তার উদ্বোধন, আর রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার

পরিণতি দেখি। 'আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতি' উনবিংশ শতকে সাহিত্যে শিক্ষাদীক্ষায়, ঐতিহাসিক গবেষণায়, বিংশ শতকের নব্য-চিত্রকলায়, নৃত্য-নাট্য ও সঙ্গীত কলায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গবেষণায়, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট চেতনায়, জন-সেবায় ও মুক্তি-সাধনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্কৃতিও সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরই সৃষ্টি এবং মোটের উপর তা জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহন। সে হিসাবে এর জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বলে পরিচিত হবার দাবি মিথ্যা নয়। তা সত্ত্বেও যা আমাদের ভুলবার উপায় নেই তা এই যে, এ ভদ্রলোক-শ্রেণী আসলে 'কলোনির কেরানি।' তাঁরা যতটা স্বাধীনতা চাইলেন ততটা ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করলেন না। যতটা রাজনৈতিক অধিকার চাইলেন ততটা গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার করলেন না। যতটা কাব্যে দর্শনে রসানভূতির ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধির চর্চা করলেন ততটা বিজ্ঞানে বা বাস্তব কর্মে সমাজ-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন না। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তাই সাধারণ মানুষ বরাবর নেপথ্যে থেকে গিয়েছে—জাতীয় সাহিত্য হলেও তা গণতান্ত্রিক জীবনের সাহিত্য হয় নি।

এর একটা কারণ—আধুনিক সভ্যতার দ্বারা ভদ্রলোকেরা উদ্বুদ্ধ হলেন প্রধানত ইংরেজি শিক্ষার মারফতে ; কিন্তু তাঁরা সে শিক্ষার ফল অশিক্ষিত জনগণকে বিতরণ করতে পারেন নি। অশিক্ষিতরাও তাই জীবন-যাত্রায় ও জীবন-দৃষ্টিতে পুরনো মরণোন্মুখ আধা-সামন্ত জগতেই আবদ্ধ রইল। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দু'টো যেন স্বতন্ত্র জাতি হয়ে পড়ল। দোষটা এ নয় যে, শিক্ষিতরা শিক্ষা পেল এবং নূতন জীবনাদর্শের বলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনা করতে গেল। দোষটা এই যে, অশিক্ষিতরা শিক্ষা পেল না, আধুনিক জীবন-দর্শনের সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হল না, এবং আধুনিক বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজের

এই বৃহত্তম অংশকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে যেতে চাইল। ফলে, মাটির সঙ্গে এ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যোগটা ক্ষীণ হয়ে আছে। না পেরেছে ইংরেজি-অভ্যাসের বশে বাঙলার মধ্যযুগের শিষ্ট সাহিত্যের ঐতিহ্যকে নবায়িত করতে, না পেরেছে বাঙলার লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে সম্ভব মত আপনার প্রেরণা গ্রহণ করতে। আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য তা করতে পারলে আরও প্রাণবান্ ও আরও দৃঢ়মূল হতে পারত। অন্তত, যদি 'কলোনির কেরানি'-দৌর্বল্য কাটিয়ে তা গণতান্ত্রিক চেতনাকে পরিপুষ্ট করতে পারত তা হলে সেই সূত্রেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্য এগিয়ে যেত অশিক্ষিতের কাছে, হিন্দু মুসলমান চাষী ও দরিদ্র জনতার নিকটে। তা হলে ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য দেখা দিত না। এবং বিংশ শতকে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও মুসলমান মধ্যবিত্তের বিরোধ, বাবুর ও মিঞার চাকরির কাড়াকাড়ি, জাতীয় হারিকিরিতে পরিণত হবার বিপক্ষে আর একটি বাধা জুটত—বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য।

গণ-সাহিত্যের পথ

এখন প্রশ্ন হবে—বাঙলা সাহিত্য সেই হারানো সুযোগ ফিরে না পাক, কি করে তার ভবিষ্যৎকে সেই ক্ষতিপূরণের কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক জীবনের সাহিত্য গড়া যেতে পারে। তার দুয়েকটি প্রধান দিক নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্রথমত, বাঙলার নিজ ঐতিহ্যকে আরও গভীরভাবে চিনে তা নবায়িত করা প্রয়োজন। তার অর্থ মধ্যযুগের পদ ও পাঁচালীর পুনরাবৃত্তি নয়, কিম্বা উনিশ শতকের নবার্জিত ঐতিহ্যের অস্বীকৃতিও নয়। এ ঐতিহ্য হচ্ছে বাঙলার লোক-মনের সৃষ্টি, অর্থাৎ লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার। কিন্তু লোক-সাহিত্যের বাহ্য-

রূপ বা কথার খোলস নিয়ে টানাটানি করলেই তা ভাবী সাহিত্যের-উপাদান হয়ে উঠবে, এমন নয়। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, লোক-সাহিত্যও সেই বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি যাতে ব্যক্তি-সত্তার বিশিষ্ট স্বাক্ষর অনাবশ্যক; লোক-সাহিত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ববর্তী যুগের সমাজ-মনের ভাষণ; তা গড়ে গড়ে ভেঙে ভেঙে ওঠে, আর প্রায়ই তা মুখে থেকে মুখে বদলে বদলে চলে আসে। এ 'প্রোসেস্' অনেকাংশেই অচেতন ও সমষ্টিবদ্ধ সৃষ্টির প্রোসেস্। এ প্রোসেস্ ও এ পরিবেশ অর্থাৎ মধ্যযুগ বা প্রাচীন যুগ ফিরে আস্বে না—এবং আসা আমরা চাই-ও না। সে হিসাবে লোক-সাহিত্যের কাল গিয়েছে—যেমন শিষ্ট সাহিত্যেও গিয়েছে মহাকাব্যের যুগ, পদ ও পাঁচালীর যুগ। তবু যেমন শিষ্ট কাব্যে এসেছে পদের স্থলে খণ্ড-কবিতা, পাঁচালীর স্থলে গদ্যে পদ্যে কথা-কাব্য, তেমনি লোক-সাহিত্যের সেই রূপকথা, উপকথা, উপাখ্যান, কিম্বা ছড়া, কলিকা, গীতিকাব্যও নতুন আকারে বেঁচে উঠতে পারে—রোমান্সে, ফ্যাণ্টাসিতে, কবিতায়, ছড়ায়। নতুন ছড়া আমরা এখনো লিখি। কঙ্কাবতী, 'সাত ভাই চম্পা,' 'কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল,' আর চিরদিনের 'মন পবনের নাও' প্রভৃতি বস্তু এ কালের পরিশীলিত কবিদের কাছেও রসলোকের চাবিকাঠি জোগায়। কিন্তু বোঝা উচিত—এদিকে লোক-সঙ্গীত ও লোক-শিল্প যতটা সহজে নতুন কালের বাহন হতে পারে লোক-সাহিত্য তা হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কি ভাবে কাব্যের কোন্ দুয়ার খুলতে লোক-কাব্যের কোন্ চাবিটি প্রয়োগ করা যাবে—তা নিতান্তই কবি-প্রতিভার ব্যাপার, অন্যের তা সাধ্য নয়। লোক-সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি না করে পুনঃসৃষ্টিও দুঃসাধ্য তপস্যা, 'বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে' তা বৎসরের পর বৎসর বুঝতে পারি।

তৃতীয়ত, ভুললে চলবে না—বাঙলা সাহিত্যের কাজটা শুধু ঐতিহ্য উদ্ধার নয়, নতুন জীবন-দর্শনকে নিজস্ব পদ্ধতিতে রূপায়ণ।

তাই আধুনিক সকল সাহিত্যের উপাদানই সম্ভব মত গ্রহণ করতে বাধা নেই। শেক্সপীয়র গ্যয়টে থেকে গ্রীক-পুরাণ ও ভারতীয় পুরাণ কোনো কিছুই অপাংক্তেয় করা চলে না। তবে আমাদের মাটিতে কোন্‌টি কি ভাবে কি মাত্রায় আসবে তা প্রতিভাবান্ স্রষ্টাই জানেন,—এবং তা নির্ভর করবে অনেকাংশে জনচিত্তের গ্রহণ শক্তির উপরে আর আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের স্থিতিস্থাপকতার উপরে। কিন্তু আসল কাজ এরূপ দেশীয় উর্বশী বা গ্রীক আর্টেমিসের প্রদর্শনী স্থাপন নয়। আসল কাজ জীবনের কথাকে বাণীরূপ দান, মানুষের মূর্তিকে গড়ে তোলা, জীবন-রসকে ভাষার পাত্রে ধরা। আসল কাজ সৃষ্টি।

শেষ কথা, দেখা যাচ্ছে যে জন্য আধুনিক যুগের বাঙলা সাহিত্য দৃঢ়মূল নয় তার কারণ যেমন ইংরেজির ভাষা-প্রাচীর, তেমনি বাঙলার (বা যে-কোনো ভাষার) মধ্য দিয়ে আমাদের জন-সমাজকে আধুনিক জীবন-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করাবার অক্ষমতা। অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্য বুর্জোয়া যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শে রচিত হতে লাগল, অথচ বাঙালী জন-সমাজ আধা-সামন্ত যুগের সমাজে ও ভাবনা-গণ্ডীতে আবদ্ধ রয়েছে। এ যুগের বাঙলা সাহিত্যের সুস্থ বিকাশের জন্য তাই প্রয়োজন জন-সমাজকে এই নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়া। তার অর্থ—একদিকে প্রয়োজন সার্বজনীন আধুনিক শিক্ষা, অন্যদিকে কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব, গণতান্ত্রিক সমাজ-গঠন। নতুন জীবনবোধ তখন স্বাভাবিক হবে, সাহিত্যেও নতুন সৃষ্টি দেখা দিবে।

